শিমুল মাহমুদ সম্পাদিত

কারুজ

শিল্প সাহিত্য দর্শন ও নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক সমালোচনা কাগজ

দশম বর্ষ পঞ্চম খণ্ড

১৯৯৯

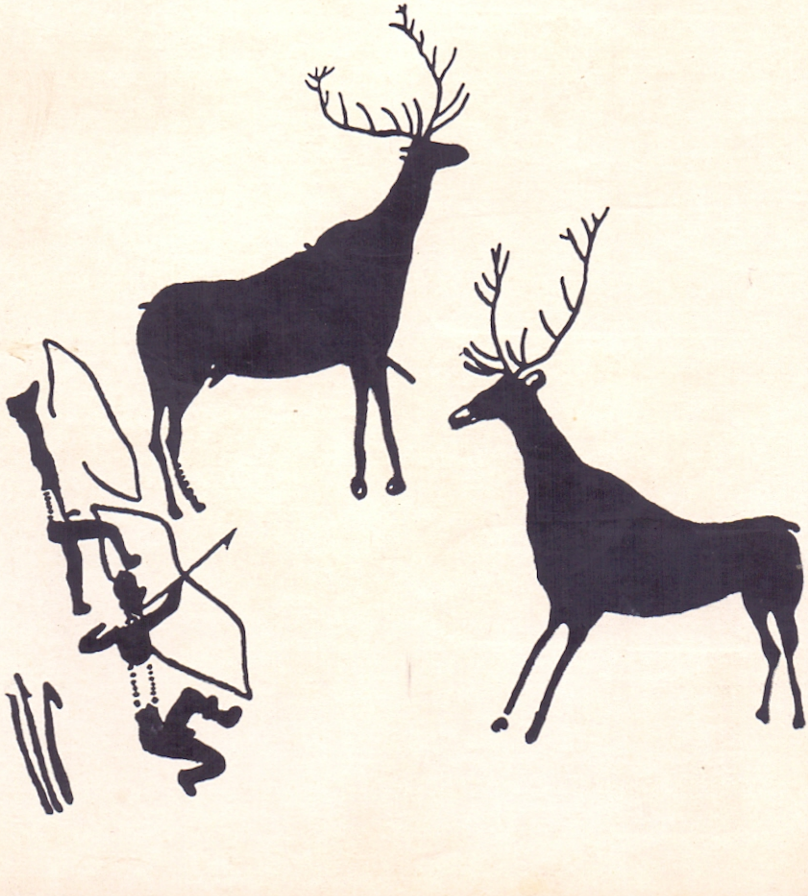

কারুজ

শিল্প সাহিত্য দর্শন ও নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক সমালোচনা কাগজ

দশম বর্ষ—পঞ্চম খণ্ড-১৯৯৯

সম্পাদক

শিমুল মাহমুদ

আমির ভিলা—ডিগ্রী কলেজ রোড

রাধানগর—পাবনা—৬৬০০

ফোন : ৪২০৬

প্রচ্ছদ

প্রাচীন গুহা চিত্র অবলম্বনে

বাহার রহমান

শেষ প্রচ্ছদ

উদাস আব্দুল্লাহ

নামলিপি

কফিল আহমেদ

পরিবেশক

নিত্য উপহার—১৬ আজিজ সুপার মার্কেট (৩য় তলা)

শাহবাগ—ঢাকা—১০০০

মুদ্রণ

জনতা প্রিন্টার্স ২৯ এল এম বি মার্কেট—পাবনা

মুদ্রাক্ষরিক—মোঃ আব্দুল আওয়াল

মেশিনম্যান—একরাম আলী

শুভেচ্ছা মূল্য

বাংলাদেশে পঁচিশ টাকা ও ভারতে বিশ রুপী—অন্যত্র দুই ডলার

উৎসর্গ পর্ব

এক ☐ ঈশ্বরকে অস্বীকার করা ; অন্যথায় 'মানুষ স্বয়ং নিজের প্রভু'—এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা হয়।

দুই ☐ আত্মাকে নিত্য হিসাবে স্বীকার না করা।

তিন ☐ কোন গ্রন্থকে স্বতঃপ্রমাণ হিসাবে স্বীকার না করা ; অন্যথায় বুদ্ধিবৃত্তি এবং অভিজ্ঞতা মূল্যহীন হয়ে পড়ে।

চার ☐ জীবন প্রবাহকে এই শরীরের মধ্যেই সীমিত মনে করা; অন্যথায় জীবন এবং তাঁর নানা বৈচিত্র্য কার্য-কারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপন্ন না হয়ে, স্রেফ এক আকস্মিক ঘটনা রূপে প্রতিভাত হবে।

—এই মূল চার সিদ্ধান্তের প্রবক্তা গৌতম বুদ্ধ-এর উদ্দেশ্যে বর্তমান সংকলনটি উৎসর্গ করা হলো।

চলতি সংখ্যার আলোচিত লেখক

টি. এস. এলিঅট ☐ আবুল হাসান ☐ ওমর আলী
সৈয়দ হায়দার ☐ শিমুল মাহমুদ
শাহানা আকতার মহুয়া ☐ আশিক আকবর ☐ আশরাফ রোকন
মাসুম মোকাররম ☐ হাদিউল ইসলাম ☐ মামুন মাহবুব
শামীম পারভেজ ☐ মশিউর রহমান খান ☐ শতাব্দী কাদের
মামুন মোয়াজ্জেম ☐ অনিন্দ্য জসীম ☐ স্বাধীন চৌধুরী
মুজিব মেহদী ☐ শিমুল আজাদ
শরীফ শাহরিয়ার ☐ শোয়েব শাদাব
বাউল কবি কালু শাহ ☐ কৃষ্ণ সাধক শ্রী চৈতন্যদেব
দেবাশীষ ভট্টাচার্য ☐ চন্দন কুমার ভট্টাচার্য ☐ সিতাংশু গোস্বামী

আলোচিত গ্রন্থ সমুহ

ধ্রুপদ সন্ন্যাসে
মস্তিষ্কে দিনরাত্রি
চন্দ্রাবতীর কয়েকজন সন্তান
সাদা ঘোড়ার স্রোত
আলোর ক্লীণ
দুঃস্বপ্নের ছায়াশব্দ
অশেষ প্রস্তর যুগ
জলের দহন
অরণ্যে চন্দনের ঘ্রাণ
আগদুয়ারী
ঠাকুর গোপাল ওঠ

বর্তমান সংখ্যার লেখক সূচী

শিমুল আজাদ
কামাল হোসেন
শাহ আলম
শিমুল মাহমুদ
আশিক আকবর
আশরাফ রোকন
মুজিব মেহদী
অনিন্দ্য জসীম
হাদিউল ইসলাম
মাসুম মোকাররম
মাসুদুল হক
শরীফ শাহরিয়ার
শোয়েব শাদাব
তারেক মাহমুদ
ফিরোজ আহমেদ
দেবাশীষ ভট্টাচার্য
আলাউদ্দিন মোল্লা
শাফিক আনাম
শ্রী প্রণয় কৃষ্ণ গোস্বামী
মোস্তাক আহমাদ দীন
পারভেজ চৌধুরী
নিষাদ রাকীব
দ্রাবিড় তারিক
মোহাম্মদ [illegible]
লুৎফর

বিস্তারিত সূচী

৩৩১—৩৩৮
আলোচনা—সময়ের একটি নান্দনিক নির্মাণ : ধ্রুপদ সন্ন্যাসে
শিমুল আজাদ

৩৩৯—৩৫৩
পর্যালোচনা—মস্তিষ্কে দিনরাত্রি : নস্টালজিক আনন্দ ও বেদনার উদ্ভাসন
কামাল হোসেন

৩৫৪—৩৬১
জ্ঞানবিদ্যা—অধিবিদ্যা ও দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি—শাহ আলম

৩৬২—৩৭৪
গ্রন্থপাঠ—চন্দ্রাবতীর কয়েকজন সন্তান—শিমুল মাহমুদ

৩৭৫—৩৯০
পরিশিষ্ট—চন্দ্রাবতীর সন্তানগণের সাম্প্রতিক কালের কবিতা
আশিক আকবর—আশরাফ রোকন—মুজিব মেহদী—অনিন্দ্য জসীম
হাদিউল ইসলাম—মাসুম মোকাররম

৩৯১—৪০০
সমালোচনা—শুদ্ধতা ও অভিজ্ঞতার গান : সাদা ঘোড়ার স্রোত
শিমুল আজাদ

৪০১—৪০৭
পরিশিষ্ট—শিমুল মাহমুদ-এর সাম্প্রতিক কবিতা—নিঃসঙ্গ পদাবলী

৪০৮—৪২২
টি, এস, এলিঅট ও আবুল হাসান : একটি তুলনামূলক আলোচনা
মাসুদুল হক

৪২৩—৪২৬
আলোর স্ক্রীণ : শব্দময় নৈঃশব্দ—আশরাফ রোকন

৪২৬—৪৩০
পরিশিষ্ট—শিমুল আজাদ-এর এই সময়ের কবিতা

৪৩১—৪৫০
শরীফ শাহরিয়ার-এর দুঃস্বপ্নের ছায়াশব্দ এবং
শোয়েব শাদাব-এর অশেষ প্রস্তর যুগ :
একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ
শিমুল মাহমুদ

৪৫০—৪৫২
পরিশিষ্ট—শরীফ শাহরিয়ার-এর এই সময়ের কবিতা

৪৫২—৪৫৭
পুণমুদ্রণ—অশেষ প্রস্তর যুগ—শোয়েব শাদাব

৪৫৮—৪৬২
Folklore—বাউল কবি কালু শাহ ঃ একটি প্রাথমিক আলোচনা
তারেক মাহমুদ

৪৬৩—৪৭৩
দেবাশীষ ভট্টাচার্য-এর জলের দহন এবং চন্দন কুমার ভট্টাচার্য-এর
অরণ্যে চন্দনের ঘ্রাণ ঃ একটি নেতিবাচক আলোচনা
ফিরোজ আহমেদ

৪৭৪—৪৭৯
সৈয়দ হায়দার-এর নোতুন কাব্যগ্রন্থ—আগদুয়ারী
একটি প্রাথমিক বিবেচনা—আলাউদ্দিন মোল্লা

৪৮০—৪৮৫
সিতাংশু গোস্বামী-এর কাব্যগ্রন্থ—ঠাকুর গোপাল ওঠ
শাফিক আনাম

৪৮৬—৪৮৯
চৈতন্যচরিতামৃত এবং গৌড়ীয় দর্শন—শ্রী প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী

৪৯০—৫০৫
সাক্ষাৎকার - কবি ওমর আলী ঃ স্মৃতিকথা
অবজ্ঞা আর দ্রোহের পাঁচালী—শিমুল মাহমুদ

৫০৬—৫২৩
নির্বাচিত ছয় তরুণ-এর কবিতা এবং ছোটগল্প
কবিতা
মোস্তাক আহমাদ দীন—পারভেজ চৌধুরী
নিষাদ রাকীব—দ্রাবিড় তান্বিক
মোহাম্মদ আমজাদ আলী
ছোট গল্প
কলেরা—লুৎফর

৫২৪—৫২৮
সম্পাদকের বক্তব্য

পৃষ্ঠা নম্বর	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৩২	মহাগতীর	মহাগতির
৩৩৩	আবিস্কার	আবিষ্কার
৩৩৬	অর্বাচিন	অর্বাচীন
৩৩৭	অপরীসীম	অপরিসীম
৩৩৮	অন্তর্য্যবয়বে	অন্তর অবয়বে
৩৩৮	পরিশ্রমি	পরিশ্রমী
৩৩৮	সার্বজনিন	সার্বজনীন
৩৪৫	ছিদামেব	ছিদামের
৩৪৯	সত্ত্বা	সত্তা
৩৫৭	মাও সতেুও	মাও সেতুঙ
৩৫৮	পর্ষার	পর্যায়
৩৫৯	সৃষ্ঠি	সৃষ্টি
৩৬১	প্রয়শই	প্রায়শই
৩৬৩	তীক্ষ্ণা	তীক্ষ্ণ
৩৬৬	অনুসঙ্গের/গল্প	অনুষঙ্গের/গল্প
৩৬৮	খোঁয়ারী	খোয়ারী
৩৭৩	শ্বাসত	শাশ্বত
৩৭৪	শেষ অনুচ্ছেদের প্রথম লাইনটির পাঠ—আলোচ্য বারোজন চন্দ্রাবতীর সন্তানদের কাব্য পাঠে প্রায়শ ঃ	
৩৭৮	ক্রীড়নক	ক্রীড়ানক
৩৮২	কান্তির	ক্লান্তির
৩৮৪	ধানখেত	ধানক্ষেত
৩৮৭	শুধু	শুধু
৩৯১	মহাগতীর	মহাগতির
৩৯৩	স্বাদশীকতার	স্বদেশীকতার
৩৯৫	পলায়ণপর	পলায়নপর
৩৯৯	অভীপ্রায়/মহাগতীর	অভিপ্রায়/মহাগতির
৪০২	হাসদল/হাস	হাঁসদল/হাঁস
৪২২	শামসুর রহমান/⊥.	শামসুর রাহমান/T.
৪২৬	বাজারি	বাজারী
৪৩১	অশেষস্তর প্রযুগ	অশেষ প্রস্তর যুগ

পৃষ্ঠা নম্বর	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৩৮	শিল্পের	শিল্পের
৪৪৬	জাতিয়	জাতীয়
৪৪৭	গল্প	গল্প
৪৫৫	সমুদ-তীরে	সমুদ্র-তীরে
৪৫৮	গাঁয়ের	গায়ের
৪৫৯	যন/যানে/সাক্ষ	জন/জানে/সাক্ষ্য
৪৬১	কয়া/বিশ্ববিশ্রুত	করা/বিশ্বশ্রুত
৪৬২	নবির/নবিজির	নবীর/নবীজির
৪৬৩	শিল্পমনা	শিল্পমনা
৪৭১	'দূরবীণ'	'দূরবিন'
৪৭৩	কারুজ/৬৭৩	কারুজ/৪৭৩
৪৭৭	উদ্ভাসন	উদ্ভাসন
৪৭৯	পশথ	শপথ
৪৮৫	রথযা	রথযাত্রা
৪৮৯	শ্লাষা	শ্লাঘা
৪৯১	(১২তম লাইন) পরিবারে	পরিবারের
৪৯৮	প্রতি অনুচ্ছেদের শুরুরে টি স্থলে □ হবে	
৫১০	অন্ধকার/আআরা	অন্ধকারে/আত্মা
৫১৫	বাঢ়ি	বাড়ি
৫১৬	তর/কুঢ়ি	তার/কুড়ি
৫২৪	জনা	জন্য

৫২৪ ২০তম লাইনে—সুতরাং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত-এর স্থলে পাঠ করতে হবে—সুতরাং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত তুল্য শিল্প মাধ্যম

'কবিতা ও জীবন একই জিনিসেরই দুই রকম উৎসারণ'—জীবনানন্দ দাশের এই উক্তি আজ প্রবাদতুল্য। কবি শাহানা আকতার মহুয়াতেও তারই স্বাক্ষর প্রোজ্জ্বল ও প্রকীর্ণ। মহুয়ার আত্ম-বিরোধ ও দ্বন্দ্বের সাথে মিশে আছে জীবনসত্তা, সমকালীন জীবন বুভূক্ষা। আর যে কারণে চলমান জীবন জিজ্ঞাসায় তাঁকে ন্যুব্জ হতে দেখি এবং পরক্ষণেই স্বয়ম্ভু স্থিতির পাহাড়ে অবিচল থাকতে দেখি। 'ধ্রুপদ সন্ন্যাসে' কবি শাহানা আকতার মহুয়ার প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যগ্রন্থে মোট চল্লিশটি কবিতা স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটির প্রকাশ-কাল ঃ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮। গ্রন্থে কবিতার রচনার কাল উল্লেখ নেই। প্রচ্ছদ এঁকেছেন—মনিরুল ইসলাম। তিন ফর্মার চমৎকার ঝকঝকে ছাপা গ্রন্থটিতে মুদ্রণ প্রমাদ নেই বললেই চলে (হৃদ-কমলের পদাবলী ছাড়া)। দাম চল্লিশ টাকা।

সময়ের একটি নান্দনিক নির্মাণ ঃ ধ্রুপদ সন্ন্যাসে

কাব্যগ্রন্থের নামকরণের ভিতর জীবন থেকে সাংসারিক বদ্ধতা থেকে মুক্তির এক আস্ফালন বা স্পর্ধা সচকিত হতে দেখি। এই মুক্তির স্বাদ বা আস্ফালন একজন আধুনিক মননের জন্য খুব ঐকান্তিক। নিঃসঙ্গতার নিটোল অবস্থানে বৈশ্বিক বা আন্তর্জাতিক হবার সরব আবহাওয়া প্রতিটি আধু-নিক নান্দনিক প্রাণের স্বভাব। মহুয়া পলায়নপর কবি। উপায়হীন কবি। আকাঙ্ক্ষার শ্রাবণ শিখায় তাঁর দীর্ঘশ্বাসগুলো বেড়ে উঠলে, কাতর অভিলাষে নুয়ে পড়লে তিনি স্বপ্নের ভেতর ধ্রুপদ সন্ন্যাসের ইমারত গড়তে চান। তাঁর আকাঙ্ক্ষার এই উপায়হীন যাত্রা সাংসারিক বেশ বিন্যাসে উপায়হীন মানুষের চিরন্তন আর্তনাদকে ঝংকৃত করে তোলে। তবে কি মহুয়া স্বাপ্নিক নগরে, বন্দরে সন্ন্যাসীর মতো নির্লীপ্ত, উদাসীন হতে চান? দার্শনিক অভীপ্সায় বেজে উঠতে চান?

আলোচক
শিমুল আজাদ

অন্তর্জগতের সাথে বাস্তবজগতের অহর্নিশ দ্বন্দ্ব। ব্যক্তিক অবস্থান। আকাঙ্ক্ষার ক্ষয়। প্রত্যাশার পরাজয় প্রতিমুহূর্ত কবিকে সচেতন করে তোলে। কবি বেদনা বিক্ষুব্ধ পথে পথ চলেন। কখনো সাবধানী পা থমকে যায়। কখনো হোঁচট খায়। নান্দনিক বিভাজনে নিজের বোধ, মেধা ও শ্রমকে সুকৌশলে কবি ছড়িয়ে দেন কবিতার মায়াবী মোড়কে। এভাবে মহুয়া পথ চলেন। নিজেকে দ্বিধাহীন প্রকাশে এতটুকু কার্পণ্য নেই। রহস্যময়তা নেই। সহজ সরল বিন্যাস ও বিভাজন তাঁর কবিতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য।
দার্শনিক জ্ঞান জিজ্ঞাসায় আলোড়িত শিল্পী সত্তা দার্শনিক দৃষ্টি কোণকে সচকিত করে তোলে কখনো কখনো—

ভাসমান দ্বীপে হয় শ্রমের কর্ষণ
থামেনা জীবনের বিচিত্রায়ণ
....

গীতল বিলাপে সিক্ত গীতজীবীর
নেই কোন অন্তর্ধান।

(—অন্তর্ধান নেই)

জীবনের বিশেষ মুহূর্তে ক্ষয়ে ক্ষয়ে পথ চলায় ক্লান্তি আসে। জীবন থমকে যায়। জীবনকে নিরর্থক মনে হয়। মহাগতীর ভিতর নিজের অবস্থান—

ক্ষীণকায়া স্রোতের মুখে
এ জীবন জমে থাকে শ্যাওলার মতো।

(—এইভাবে যাপিত জীবন)

শিল্প শিল্পীকে আত্ম উন্মোচন করে। শিল্পীর মৌল আকাঙ্ক্ষা, জিজ্ঞাসা, অবস্থানকে চিহ্নিত করে কখনো সুক্ষ্ম ইশারায়। কখনো কম্পনে! কখনো দ্বিধায়! কখনো আলো, কখনো বা অন্ধকারে!! মহুয়ার প্রতিটি কবিতাই তার অন্তরস্পৃহার মৌল ফসল। আর তা উন্মোচনের সাথে সাথে মহুয়ার সন্ন্যাসী দৃষ্টিসীমা, শূন্যতা, পুড়ে যাওয়া, ক্ষয়ে যাওয়ার পাশাপাশি অবিচল ঋজু সত্তার অবস্থানকে ইঙ্গিত করে। —যা কবি মহুয়ার শিল্পীসত্তাকে এক স্বয়ম্ভু অবস্থানে টেনে নিয়ে যায়। তাঁর ব্যক্তিত্বকে ঈর্ষান্বিত করে তোলে।

মহুয়া বিদ্রোহী এবং তাঁর বিদ্রোহী সত্তায় আকুতি আছে। আছে নিবেদনমুখী হৃদয়ের ঝড়—

যদি নিষেধের প্রাচীর তোল
ওপথে যাবই যাব আমি
খাব যত নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল

(—করোটিতে শ্বেত হেমলক)

মানুষের মানচিত্রে বড় ধূসরতা, নির্লিপ্ততার চোরাস্রোত। প্রাণের প্রাচুর্যরা দিনকে দিন হারিয়ে যাচ্ছে। তাইতো জীবন খুঁজতে হয়, সবুজ জীবন। কবির হৃদয়ে সবুজের গাঢ় সংবেদ। সেখানে ধূসরতা আক্রমণ চালায়। হিংস্রতার নখরে আঘাতে রক্তাক্ত জীবন স্বপ্নের ভিতর নার্সিসাস দেখতে পায়—

আত্মমুগ্ধ নার্সিসাস।
নিরুদ্বিগ্ন নার্সিসাস
নিজের ভেতর।

(—নার্সিসাস)

শিল্পী মাত্র শ্রমিক। যাবতীয় ক্লেদ, পংকিলতার ভিতর, হতাশার ভিতর, নিঃসঙ্গতার ভিতর সে স্থিরতার পোশাকে তাঁর চেতনার অগ্নিময়তাকে নিরন্তর লেপন করে চলে। মহুয়ার স্বভাবে এই চিরন্তন শিল্পীর মর্যাদা ও শ্রমকে শাণিত হতে দেখা যায়—

বিক্ষত জীবন নিয়ে একজন মানুষ,
উষ্ণ সৌরভ নিয়ে একজন মানুষ
নিরেট সীমানার দেয়ালে
নিরন্তর হাতুড়ি ঠুকে যায়।

(—অলৌকিক এক মানুষের মুখ)

নিজের ভেতর নিজেকে খুব একান্তে তার সংরাগ, সুর, ধ্বনি, ঝংকার, অলঙ্কারকে কবি টেনে আনেন। স্তব্ধতার ভিতর চলমানতা, নিরন্তর পুড়ে যাওয়ার পাশাপাশি ক্রমশ সবুজ হয়ে ওঠা—এগুলো কবি মহুয়া আত্ম আবিষ্কারের মতো ক্রমান্বয়ে আবিষ্কার করে চলেন এবং দেখেন তিনি ঐতিহ্য বর্জিত নন। প্রকৃতির স্বয়ম্ভরতা, ঐতিহাসিক উল্লেখ চরিত্রের মতো নিপুণ আভাস তাঁর অবয়বে দুলে যায়। কবি নিজেকে আবিষ্কার করেন শাণিত, তীক্ষ্ণ মর্যাদাশীল রূপে।

বাস্তবতার সংঘাত ও তাঁর নীল দংশন কবি মহুয়াকে ক্ষতবিক্ষত করেছে প্রতিনিয়ত। কবি তাঁর এই দংশনের স্কেচ কখনো অংকন করেননি। প্রকাশ্যলোকে তার ঝংকারকে বেজে উঠতে দেননি। কিন্তু তার সংযমী শিল্প কুশলতায় এই সুর, খুব গোপনে ঝংকৃত হয়ে ওঠে। তাইতো কবি স্বপ্নের ভিতর আশার, আকাঙ্ক্ষার বীজকে রোপন করেন। তার পরিচর্যা করেন। তাকে বাড়তে দেন। আর এখানে আধুনিক মানুষের এক ভীষণ সংকট চিত্রায়িত হয়ে ওঠে। আর এই সংকট আমাদেরকে ক্রমশ সবুজ থেকে ধূসর, গতি থেকে স্তব্ধতায় নিয়ে যায়।

মহুয়া স্বপ্নের ভিতর শান্তি চান। চান নির্ভেজাল আনন্দ উৎসব। তাই স্বপ্নকে ছোট হতে দেখে, তার আকাঙ্ক্ষার ঢেউকে তীব্র হতে দেখে; বাস্তবতায় জর্জরিত হতে দেখে; স্বপ্নকে বাড়তে দেখে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করেন --

এতো ছোটো স্বপ্ন কেন তুমি বুকে নিলে?
কেন তুমি পা ডোবালে বেলাভূমির হরবোলা বালিতে?

(—গঙ্গা আসেনা কেন অন্তর্বৃত্ত ভেঙ্গে)

প্রতিটি সংবেদনশীল মানুষই আজ একা! এই নিঃসঙ্গতা একাকিত্ব-বোধ থেকে আসে হতাশার বোধ আর নির্বেদ, এবং হতাশা ও নির্বেদের হাত ধরে ক্রমেই পৌঁছে দেয় এক আত্মিক আতংকের দিকে, এক নিদারুণ দুঃখজনক মর্মান্তিক শূন্যতাবোধের দিকে। সমস্ত আধুনিক শিল্পের মর্মে মর্মে প্রোথিত থাকে তীব্র যন্ত্রণাময় নেতিবোধ। আধুনিকতার প্রতিটি পর্যায়ে এই পৌনঃপুনিক **'Pattern of anniety'**-র অস্তিত্ব আমরা অনুভব করি। কবি মহুয়ার বোধও তার বাইরে নয়। যখন কবি জীবননান্দ বোধ করেছিলেন—'হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়'—তাঁর এই বোধ একাকিত্বের, হতাশার, নির্বেদের, শূন্যতার—

সব কাজ তুচ্ছ হয়—পণ্ড মনে হয়,
সব চিন্তা · প্রার্থনার সফল সময়
শূন্য মনে হয়,
শূন্য মনে হয়।

শূন্যতা এক অহংকার। শূন্যতায় ঝুলে, ডুবে যেতে, ভেসে যেতে আধুনিক মনন ও প্রাণ আস্বাদনে ভিজে ওঠে। মহুয়া আত্মকথনে বেজে উঠে বলে ওঠেন—

শূন্য হতে বড়ো ভালো লাগে
বৃক্ষের দীর্ঘশ্বাসের মতো শূন্য!

(—জলবহ্নির কথকতা)

কবি মহুয়ার ভিতর আছে ক্লান্তি, হতাশা! আছে মৃত্যু চেতনা। হতাশার মোহন গলিতে নেমে যেতে তাকে আমরা দ্বীধাহীন দেখি—

ক. যতই সমুদ্র মন্থন করা হোক
এখন আর পারিজাত উৎপন্ন হবে না।

(—দ্রৌপদীর আঁচল)

খ. মায়াবী সবুজ আলোয় পুড়ে
তমোঘ্ন তটে তার মৃত্যু হোক
ঘাসের মতো মোহন মৃত্যু!

(—কালান্তর)

অস্তিত্বের তীব্র সংকট, বারবার পুড়ে যাওয়া, ছাই হওয়া, ভেসে যাওয়া অস্তিত্বের গান মহুয়ার প্রতিটি কবিতা। যন্ত্রণার এই নীল উদ্ভাসন খুবই স্বাভাবিক। জীবনের নিরর্থক কাকলি, মুখরতার কি প্রয়োজন! দিনের কোলাহল মুখরতায় মুখ বুজে, রাতের নৈঃশব্দে ঘুমুতে চেয়ে তীব্রতর হয়ে ওঠে অসুখ। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, গুঞ্জন, স্তব্ধতা, ঝড়ো হাওয়ার মতো আতংকের নীল আচ্ছাদনে শিউরে ওঠে রাতের শরীর। অন্ধকারের কফিন খুলে উঠে আসে ড্রাকুলার মতো হিংস্র নীল শিহরণ। তখন কবির মনে হয়—

কতকাল, কতকাল ঘুমায়নি সে
আলোভেজা আকাশের বুকে মাথা রেখে।

(—রাতের নাম বীরাঙ্গনা)

যান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশের পাশাপাশি মানুষের জীবন যাত্রায় নানা রকম জটিলতা, হতাশা, ব্যর্থতা, মূল্যবোধের অবক্ষয়, অস্থিরতা, বিমর্ষতা, দ্বন্দ্ব বাসা বেঁধে আছে। বৃত্তের ভিতরে ক্লান্তির ছায়া। বিস্ময়ের জাগরণ নেই কোন—

মধ্যমার এই বৃত্ত আর ভালো লাগেনা
একই মাটিতে বার বার কর্কশ নখের আঁচড় ভালো লাগেনা
……

মধ্যসত্তার শব আঁকড়ে
চাণক্য আকাশ দেখতে ভালো লাগেনা।
……

এই ক্ষয়াটে সুকুমারী বিলাস আর ভালো লাগেনা!
রঙচঙে পতিতার মতো কৃত্রিম ইশারার ছায়াপাত
ভালো লাগেনা!

(—বিবমিষা এবং অন্যান্য)

অতীতের মোহগ্রস্থ জীবনের রহস্যময় হাতছানি বর্তমান জীবন যাত্রায় কৌতুহলী ও উৎসুক করে তোলে। মহুয়ার বিদগ্ধ মন, অতীত জীবনের কৌতুহলে, রহস্যময়তায় ডুবে যেতে চান! আশ্রয় চান!—

হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর মৃত জনপদ যেন
জেগে ওঠে শোরগোল করে
চড়াই-উৎরাইয়ে বিক্ষত মানুষের ইতিহাস
গুহামানবের পদচ্ছাপে ভরে যায়।
সদ্য তরুণ হ'য়ে ওঠা অর্বাচিন রোদ
শস্যের ঠোঁটে ঠোঁট রেখে
হাসিতে ঝলসে ওঠে।

(—আত্মার টেরাকোটা)

অস্তিত্বের তীব্র সংকটে থাকা না থাকার দ্বন্দ্বে, মুখরতায়, হতাশার ক্লান্তিতে কবি কখনো কখনো জীবনের জয়গান শুনতে পান। বেঁচে থাকার আনন্দ পান। ফসলের সোনালী উদ্ভাসনে আশান্বিত হয়ে ওঠেন। পুনর্বার বেঁচে ওঠেন—

রগওঠা হাতে ওঠে আবার গাঁইতির রুদ্র ঝলক
রূপচাঁদা মাছের মতো খলবল করে
সপ্রাণ ফসলী ঘ্রাণ।
অমরত্বের একঘেয়েমি নেই

ধ্যানী বক জীবনের ক্লান্তি নেই কিছু,
অনন্ত আশ্বাসে কেঁপে ওঠে ঠিক সফেন সমুদ্র।

(—অনন্তের জন্য পিপাসা)

কবি মাত্রই ধ্যানি, কল্পনা বিলাসী। বস্তু অবস্তুগত ক্ষয়, দ্বন্দ্ব-মুখরতায় নিমগ্ন। আর তারই মাঝে থাকে, আত্ম আবিষ্কারের উন্মিল বিলাস—

বুকের ভেতরে রক্তময় ক্ষত আর
রক্তনীলা স্বপ্ন ছাড়া কিছু নেই
এতো রুঢ়তায় পুড়ে
এ ছাড়া আর কিছু থাকেনা।

(—জীবন্মৃতের স্বরসপ্তক)

কবি দ্রষ্টা। ভবিষ্যৎ প্রবক্তা। অতীত ও বর্তমানের চিত্রপট খুঁজে ভবিষ্যৎ-এর চিত্ররূপ ফুটিয়ে তোলাও কবির কাজ---

দারিদ্রের সাথে সাথে
অবিশ্বাসের আণবিক বেড়েছে শুধু
একদিন ওরাই দখলিসত্ত্ব নেবে সাজানো
জনপদের।

(—অন্বেষণে)

কালজ্ঞান ও ইতিহাস চেতনা প্রকাশগত সংযম ও সুমিতি, ঐতিহ্যের স্বীকৃতি, যুক্তি পরম্পরাগত বিন্যাস, চরণের ভারসাম্য-এ সব ধ্রুপদী লক্ষণ শাহানার কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। মহুয়ার কাব্যকুশলতা এক কথায় বলা যায় চমৎকার। শব্দের নিপুণ ব্যবহার, ছন্দনির্মাণ, উপমা, অলংকারের ব্যবহারে তাঁর নৈপুণ্যতা অপরীসীম। শব্দ ব্যবহারে এবং শব্দ নির্মাণে তাঁর নতুনত্ব লক্ষ্যনীয়। মহুয়ার বাক্যবিন্যাস পদ্ধতি তাঁকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে সক্ষম। একটি শব্দের সাথে আর একটি শব্দের মিলন ঘটিয়ে নতুন এক সুসংহত ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে তিনি বিশেষ পারদর্শিতা দেখাতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি প্রচলিত শব্দ রাশির ভিতর কিছু অপ্রচলিত ব্যঞ্জনাধর্মী শব্দের সমাবেশ ঘটিয়েছেন—যা তার কবিতার আঙ্গিক ও কাঠামোর স্থিতিশীলতায় বিশেষ ভুমিকা রেখেছে। মহুয়ার কবিতার রোমান্টিকতা, মিষ্টিকতা, গীতিধর্মীতা দুর্লক্ষ্যনীয়। পাশাপাশি প্রতীকবাদও

তার কবিতার শরীরে আশ্রয় নিয়েছে দৃঢ়তর রূপে। বিষয়কে ঘোলাটে না করে তুলে স্পষ্টতর করার দৃঢ় মানস তাঁর অন্তর্য়বয়বে উপস্থাপিত। তাঁর কবিতার মূল সুর আত্ম-আবিষ্কার। আত্ম-তন্ময়তার ঝংকৃত প্রাণের সুর মূর্চ্ছনা তিনি পাঠককূলকে ভীষণ আন্তরিক ভাবে শুনাতে চেয়েছেন। এই আত্মতন্ময়তার শিল্পীত, প্রাণময় আরতি কোনক্রমে ব্যর্থ হয়নি। প্রকাশভঙ্গির স্থিরগতি, দৃঢ়ময় অবস্থান কবির ব্যক্তিত্বকে খুব সহজেই নিবিড় করে তোলে। পাঠককে তিনি তাঁর চিন্তন মানসে, ধ্যান মানসে, শূন্যতার, যন্ত্রণার, আকাঙ্ক্ষার অনলে পোড়াতে, ডোবাতে সক্ষম হয়ে ওঠেন।

কাব্যালোচনার পরিশেষে বলা যায়, মহুয়া পরিশ্রমি। আত্মনির্ণয়ের জমাট বৃত্তে ঘূর্ণায়মান। এই বৃত্তের অবস্থানকে আরো সার্বজনিন ও বৈশ্বিক করার প্রয়োজন। নান্দনিক বিভাজনে; স্বপ্ন, মৃত্যু, আশা, আকাঙ্ক্ষার গান আমরা প্রতিটি মুহূর্তেই শুনছি। এর বাইরের জীবনের ক্লান্তির মাঝে, হরষের অগ্নিবীণার স্পর্শ, বিষাদের বলয়কে ভেঙে নিয়ে যাবে। জীবনের আশার সঞ্চারকে উদ্ভাসিত করবে নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বলতর। এমনতর সজীব নিঃশ্বাসের বাতাস আমাদের পরিমণ্ডলে বয়ে আনবে শ্রম, মেধা, নিপুণতা, যা মহুয়ার আছে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ধ্রুপদ সন্ন্যাসে' তিনি তাঁর প্রমাণ রাখতে সচেষ্ট হয়েছেন। বাংলা কাব্য আন্দোলনে মহুয়া নতুন-মাত্রা সংযোজনে তৎপর। তাঁর প্রচেষ্টা আরো গতিমান সফল হোক।

মস্তিষ্কে দিনরাত্রি ঃ নষ্টালজিক আনন্দ ও বেদনার উদ্ভাসন

আলোচক
কামাল হোসেন

প্রায় বছর চারেক আগে শিমুল মাহমুদ-এর 'মস্তিষ্কে দিনরাত্রি' কাব্যটি আমি প্রথম পড়ি। এটা আমি এখনও পড়ি সময় পেলেই। আমি নিজের ফেলে আসা বেদনাময় স্মৃতি, অনুভূতি এই বইটির মধ্যে আপন করে খুঁজে পাই। শিমুলের লেখা-লেখির প্রথম দিকের লেখা এটা। তথাকথিত পণ্ডিতগণ কঠিন কাব্য বিচারে একে হয়তো খাটো করে দেখবেন। কিন্তু এত তরুণ বয়সে এতটা আন্তরিকতা, হৃদয়ের উত্তাপ দিয়ে এমন যাপিত জীবনের কথা এত মমতা দিয়ে কেউ কি লিখেছেন ইতিপূর্বে? আমার মনে হয় না কেউ লিখেছেন। ফোক-আর্ট আমাকে বরাবরই আলোড়িত করে। আত্মা বিপুলভাবে সাড়া দেয়। শিমুলের কাব্যটি পড়ে মাঝে মাঝে চমকে উঠেছি। আমার অস্তিত্বে, হৃদয়ে যেন টান পড়েছে। স্মৃতিতে অবগাহন করেছি। হ্যাঁ শিমুল প্রকৃত শিল্পের প্রতি দায়বদ্ধতাকে কথা ও কাজে সমীকৃত করেছেন। তিনি মিথ্যা বলেননি যে,—'অদৃশ্য জগৎ, গোপন অনুভূতি, অস্পষ্ট বোধকে এবং বোধ-এর রহস্য উন্মোচিত করা কবিতার কাজ নয়, বরং এই জগতে পৌঁছে দিয়ে উক্ত জগতের প্রকৃত রূপ দর্শন ও সত্যের মুখোমুখিতে নিয়ে যাওয়াই কবিতার কাজ।'—ফোক আর্ট তেমন কেউ এগিয়ে আসেননি। তেমন ভাল কাজও আজকাল চোখে পড়েনা। শিমুল এক্ষেত্রে কঠিন দায়িত্ব পালন করেছেন। তার এ কাব্যটি পড়ে মনে হল, আমাদের ঐতিহ্য ধারায় যে বেগবান স্রোতটি বাংলার জন-জীবনের অন্তরে প্রবা-

হিত তাই তিনি লঘু হস্তে এঁকেছেন সাবলীলতায়। এ ধরণের কাজে তিনি বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। পরিচিত শব্দ নির্বাচন, বিষয়বস্তুর প্রতি আন্তরিকতা ও পর্যবেক্ষণিক দৃষ্টি দিয়ে। তিনি ক্লিশে শব্দ এড়িয়ে গেছেন। এতে কাব্যে অভিনবত্ব এসেছে। তার বাচন ভঙ্গিটিও লক্ষণীয়। কাব্যিক ভাষাকে নাজীম হিকমাত-এর মত অনেকটা মুখের ভাষার কাছাকাছি নিয়ে এসেছেন। এলিয়টের পোড়োজমিতেও স্থানে স্থানে এ রীতির পরিচয় পাই। তিনি প্রচুর হালকা মিথ ও ট্রাডিশনকে কাজে লাগিয়েছেন। তার কবিতার বিষয়বস্তু যা তিনি চেতনার গাঢ়তায় মিশিয়ে বাণীবদ্ধ করেছেন তাতে একটা ভিন্নতর স্বাদ এনে দিয়েছেন।

'হত্যাকাণ্ডের পূর্বে' স্বল্পদীর্ঘ কবিতাটিতে তিনি মানুষের আদিম জন্ম সত্যকে চিহ্নিত করেছেন, যেখানে অকৃত্রিম জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে একটা বিশাল মন্ময় ইতিহাস ও পুরাণকে ফেলে এসেছে মানুষ। সে পিছনে ফেলে এসেছে এক গৌরবময় অতীত। তিনি বস্তুগত দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন কালানুক্রমিক বিবর্তন। যন্ত্র সভ্যতা মানুষকে কোথায় নিয়ে চলে তা সে নিজেও জানে না।

আমরা তাকিয়ে থাকি,
শুধুই তাকিয়ে দেখি
আজকের রোদ
তাকিয়ে থাকি আশ্চর্য ম্লান অন্ধকারে
আর বুকের ভেতর বাতাস এক মুহূর্তও স্থির নয়

কিন্তু এর মধ্যে একটা নষ্টালজিক নির্বস্তুক নান্দনিক বোধ কাজ করে যখন বলেন--

আর আশ্চর্য
হাজার বছর আগে
এই একই চাঁদ দেখতে পেতেন
আমাদের পুরানো মানুষেরা

এলিয়েনেশন তাকে গ্রাস করে ফেলে পুরোমাত্রায় যখন বলেন—

ক্লান্তিকে চোখের পাপড়ি বুজে আসে
বুজে আসে
বুজে আসে আর

মস্তিষ্কে রঙ ধরে
লাল
নীল
জলে ডোবা শিশুর মতোই
বুঝিনা
বুঝিনা আমরা
কি সেই রঙের অর্থ

অন্যত্র শিমুল মাহমুদ বলেন—

সবুজ প্লাবন মাঠে কে একজন
ফিরে যায় ফিরে আসে
দৈন্যতা গেয়ে ওঠে
ক্লান্তি আমায় ক্ষমা কর প্রভু
—(মর্ত্যলোকবাসী সকলেই মানুষ দেবদূত কেউ নন)

শব্দ তার হাতে নূতন রূপ পায়। শব্দের অতিপ্রাকৃত অর্থকে তিনি ধরার চেষ্টা করেন। যে অর্থ প্রচলিত অর্থকে অতিক্রম করে অন্ত-স্রোতের মত বহমান হয়ে নূতন কোন ব্যঞ্জনাকে চিহ্নায়ন করে বলে মনে হয়। এই আন্তরিক প্রয়াসে শব্দ প্রাণ পায়। আসলে শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে কবিতা লেখা খুব কঠিন কাজ নয়। কিন্তু শব্দগুলি দিয়ে ছবি, রঙ ফুটানো, দৃশ্য তৈরী করা, প্রতীকি-ভাবে জীবনের তথা বস্তুর অবয়বকে বিযুক্ত করে সারবত্তাকে তুলে ধরা, এতে আত্মার সঞ্চার করা এবং বিশ্বস্তভাবে তা পাঠকের হৃদয়ে বিশ্বাসযোগ্যভাবে সংক্রমিত করাটাই কঠিন কাজ। গভীর দৃষ্টি, আন্তরিকতা, বিশ্বাস, প্রেম ছাড়া এসবের বিকল্প নেই বলে মনে হয়। শিমুল এসব ক্ষেত্রে প্রায়শঃ সফল। শিমুল শব্দের আড়ালে প্রায়শঃ ভাবনাকে আড়াল করেন না মনে হলেও আসলে তিনিও প্রতীক সৃষ্টি করেন প্রতীকের জন্যই। আধুনিক কবিতার বিশেষ দিক ইঙ্গিতময়তা। ইঙ্গিতময়তা কবিতার উৎকর্ষতা বাড়ায়। এক্ষেত্রে প্রতীক, রূপক, চিত্রকল্প সৃষ্টির মাধ্যমে তার বিমোচন ঘটে। এই শক্তিশালী যুক্তিবহ প্রতীক অর্জনের কৌশল অর্জন চাট্টিখানি কথা নয়। নূতন নূতন প্রতীকের ব্যাখ্যা ও বিশ্বাস সঞ্চার করে পাঠকের মনে কবিতার বক্তব্য-লক্ষ্য পৌঁছে দিতে সফল প্রতীক তড়িৎ ভূমিকা পালন করে। মাঝে মাঝে সচেতন প্রতীকের

মধ্যেই শিমুলের কবিতার কবিত্বের অনেকখানি নিহিত থাকে। এভাবে তার বক্তব্য রহস্যপূর্ণ হলেও দুর্বোধ্য নয়। যেটা এলিয়টের কাব্য মানসকেই সমর্থন করে। শিমুল বিপ্লবের প্রতীক 'লাল' শব্দের ভেতরে—প্রবেশ করিয়ে দেন প্রেম আর দ্রোহ। এক্ষেত্রেও তিনি মৌল ভাব থেকে দূরে সরে যান না। বাকভঙ্গির সহজগুণে সেখানেও তিনি চমক সৃষ্টি করেন। যখন বলেন—

কোন্ সে নবান্নের উৎসব শেষে
তোমার ভ্রাতা তোমাকে কিনে দিলো
তোমার একমাত্র পোশাক লালছায়া।
বালিকা, তোমার ভ্রাতারা কি খুব লাল ভালোবাসে?
বালিকা। তোমাদের শষ্যক্ষেত। বালিকা
তোমাদের লাঠিয়াল। বালিকা
তোমাদের কৃষকেরা, হয়েছেন অনেক লাল।
একদা তোমাদের পূর্বপুরুষগণ
পলাশীর আম্রবৃক্ষতলে বেশ করে
লাল হয়েছিলো।
বালিকা। তোমার ভ্রাতারা সকলেই খুব লাল ভালবাসেন।
এমন বংশ গৌরব! ইতিহাস কোথায়! ইতিহাস কোথায়!

—এভাবে প্রতীক শিমুলের হাতে হয়ে ওঠে অস্তিত্বের ও আকাঙ্ক্ষার অনিবার্য প্রকাশ। এক্ষেত্রে তিনি যে ব্যক্তিক দ্রোহ ও সংগ্রামের তালিকা নির্মাণ করেন তা প্রতিবারই নূতন মাত্রা ও নূতন দ্যুতি লাভ করে।

আবার এভাবেই তিনি পরাবাস্তববাদী আবহ সৃষ্টি করে একটি নূতন দিগবলয় সৃষ্টি করেন। যেখানে এমন বর্ণ-গন্ধ পাওয়া যায় যা আমাদের চেনা জগৎ থেকে দূর মেরুবাহিত। পরাবাস্তববাদী কবিতা, 'মানুষেরা শিশু হতে ভালোবাসে বেশ'—কবিতাটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হতে পারে। উজ্জ্বল কয়েকটি পঙক্তি হলো—

জানালার চোখজোড়া ভেসে যায়
ভেসে যায় ঘুড়ি হয়ে দূরে।

'ঘুড়ি' প্রতীকটি সালভাদর দালির সেই অরুন্তুদ চিত্রকল্পটির কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু শিমুল মাহমুদ এখানে তা ভিন্ন আঙ্গিকে

ব্যবহার করেছেন। অতীতচারী শিমুলের মধ্যে হতাশা, বেদনা, আনন্দ এসে ভীড় করে। তিনি এসব প্রতীকায়িত করার চেষ্টা করেন এবং প্রাণপণে পাঠক হৃদয়ের গ্লানি, যন্ত্রণাকে জাগিয়ে তুলতে চান। তার প্রয়াস হার্দিক।

মহৎ কবিরা কঠোর তপস্বীর মত এলিয়ট কথিত নৈর্ব্যক্তিকভাবে যে বেদনার নীলাভ গল্প বুকে লালন করেন তাই তুলে ধরে পাঠকের আত্মায় বিলোড়ন তোলেন। অতীন্দ্রিয় বাণীহারা যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ ঘটান। এই বাণীহারা যন্ত্রণাগুলিকে খুঁচিয়ে ক্লান্ত করেন না।—'কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগায়?'—আর কেউ নন মহৎ কবিগণ। পাঠক একাত্ম হয়ে যান এই মহৎ কবি আত্মার সাথে।

শিমুল বড় বেশী স্মৃতিকাতর। এক অব্যক্ত মানস বেদনায় জর্জরিত। কোন কবিই নিজস্ব অনুভূতি ব্যতিত অন্যের যন্ত্রণাকে ফুটিয়ে তুলতে পারেন না। এই জন্য তিনি সবচাইতে বেদনা কাতর, মানবিক, সহমর্মী। তবে বিষণ্নতা, ব্যক্তিগত দুঃখবোধ থেকে যে কবিতা জন্ম নেয় তা মানুষের হৃদয়ে বেশী নিবিড় করে সঞ্চারিত হয়। পাঠক বলে ওঠেন, আহ্ কি দুঃখের, কি যন্ত্রণার, কি আনন্দের এই জীবন, ইত্যাদি। শিমুল সেই বোধ অনেকটা সঞ্চারিত করেছেন তার কাব্যে। এ যেন গ্রাম বাংলার সাথে কৃত্রিম নগর চেতনার দ্বান্দ্বিক সংকট যা থেকে পালিয়ে যাবার জন্য তিনি অতীতের কৃত্রিম অধ্যাস সৃষ্টি করেন কবিতায়। কবিতা তার বেদনাঘন রঙের, বহু কামনার, সৌরভের নবান্ন। তার শব্দোচ্চারণে ছায়াপাত করেছে কৈশর, শৈশব। গ্রাম বাংলার মানুষের নিরাভরণ জীবনাচার, দ্রোহ, প্রতিবেশ, প্রেম, অমর আকাঙ্ক্ষা তার চেতনার গভীর স্তরে প্রোথিত। ফলে 'কৈশোর' কবিতায় ফুটে উঠেছে—

> আর
> আমরা আমাদের
> পানিগুলিকে, অস্থির করে তুলি
> সাঁতার কেটে। আমাদের
> নদীর পানি। একদিন

পৌষের মেলায়
গান হয়েছিলো,
গাজীর গান।

তিনি যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত যখন বর্তমান দেশ ও কাল থেকে পালাতে চান। তখন বলে উঠেন—

কেমন করে এই বয়স বাড়ে
নিজ চোখে দেখে নিব আমি সারারাত।

এই উচ্চারণ শিমুলের সম্ভাবনাময় কাব্য প্রতিভারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। সময় দার্শনিকের এক আশ্চর্য ধ্যানের বিষয়। দার্শনিক প্লেটো একে নিত্যকার এক ধাবমান রূপ হিসাবে দেখেছিলেন। অগাস্টিন ঈশ্বরের কাছে এর স্বরূপ জানতে চেয়েছিলেন। তিনি যন্ত্রণায় চিৎকার করে বলতেন আমার আত্মা পুড়ে যাচ্ছে। তিনি পুড়ে যাচ্ছেন কারণ তিনি সময় কি তা জানতে চান। এক্ষেত্রে একটি জটিল জিজ্ঞাসার মুখোমুখি শিমুল ধ্যানলোকে ফিরে যেতে চান। তিনি কান্টের দেশ ও কালের ছাঁচ থেকে বেরিরে যেতে চান। মহাবিশ্বের এক দুঃসহ চাপের পীড়ন তিনি তীব্রভাবে অনুভব করেন।

যে কবিতাগুলো শিমুলের শ্রেষ্ঠ কর্ম বলে মনে হয়েছে। তাতে আবহমান জীবনের বর্ণ পরিচয়ের আলিম্পন ঘটেছে। গ্রাম বাংলার জনপদের একটা প্রগাঢ় সত্যোচ্চারণ তিনি এঁকেছেন। এখানে ভালবাসা আন্তরিক। তার কাব্যের সারাৎসারঃ হৃদয়ের নম্রতা, জীবনের সত্য, শ্রম ও ঘামে আঁকা, যা সহস্র বস্তু পরস্পরের সাথে গূঢ় সম্পর্ক স্থাপন করে।

কৃষক সম্প্রদায়ের বহু টানা-পোড়েনের চিহ্ন তার কাব্যের অঙ্গে, ঘামে, শ্রমে, তামাকের ধোয়ায়, প্রতিদিনের স্বপ্নে, আহার্যে, জীবন যাপনে, দ্রোহে, দারিদ্রে, ঘৃণায়, সংরাগে, সম্ভোগে সংগ্রথিত হয়ে আছে। কৃষকদের জীবন যাপনে, দেনা পাওনা, পার্বনে বস্তু ও বস্তু, বস্তু ও মানবিক সম্পর্কের সাথে যে দ্বান্দ্বিকতা তাতে তীব্রতর আলো ফেলেছেন। তাদের জীবন যাপনের অরুন্তুদ বস্তুতান্ত্রিকতার মর্মশাঁস ফুটিয়ে তুলেছেন কবিতার ক্যানভাসে। শব্দের সাথে বস্তুর সম্পর্ক নিবিড় হয়ে উঠে আন্তরিক উচ্চারণের উষ্ণতায়—

পাটের রশির সাথে
কিষাণীর কন্ঠির বন্ধন,
রয়ে যায় থেকে যায়, গোলাকার চন্দ্রমাস ধরে।

-র্ত রচনা'-র চতুর্থ সর্গটি আরো যাপিত জীবন সংলগ্ন স্বচ্ছ হৃদয়ের নিবিড় উত্তাপে উদ্ভাসিত। তাতে হৃদয়ের উষ্ণতা ফুটে উঠেছে অভিনব আবহে। এই অংশটুকু গ্রাম্য জীবনের হার্দ্য কর্মভূমির উপর সংস্থাপিত। এই কবিতার বাককণ্ঠে গ্রামীণ জীবনের বিবিধ সৌরভ, সরল জীবন যাপন, মান অভিমান, আনন্দ বেদনার সংকট আমাদেরকে নস্টালজিক আনন্দ বেদনায় ভারা- ক্রান্ত করে তোলে। জীবন যাপনের সহজ দৃষ্টি, অবভাস এতটা সহজ করে তুলেছে যা আমাদের মন্ময় চেতনাকেই বিদ্ধ করে তবু ছিদামের প্রেম, সংগ্রাম, ভালবাসা একাকার হয়ে উঠেছে সহজ ও আন্তরিক উচ্চারণে।

আমাদের চাষীরা গল্পের মানুষ।
ছিদামেব নৌকা, নিজেই এক গল্প
আর গল্পের পটভূমি অজো পাড়াগাঁ।
ঘর পালানো মেয়ে
যে আজ স্বামী সোহাগী
....
....

কালোমুখ ছড়িয়ে, স্বামী সোহাগী বৌ, হেসে ওঠে
উঠানে জোড়ালাগা কুকুর জোড়াকে বিরক্ত করে
সাত বছরের ছোঁড়া। আর হাটে
বোকা হাঁদা ভাতার, কম বয়েসি বৌয়ের মতো আরো এক
জোড় কুত্তা দেখে, হেসে উঠে, ঠোঁটের বাতাসে তোলে
কামুক আওয়াজ। পাটের দামের মতো
মস্করায় মেতে যায় বেটা।

সাদা মাটা বর্ণনাও আন্তরিক সহজ উচ্চারণে কবিতা হয়ে উঠেছে শিমুলের কলমে। 'নরম সাদা বক পক্ষী' তার উদাহরণ। এখানেও স্মৃতির দূরবীণ দিয়ে তিনি দেখেন অতীতকে। যন্ত্রণা, একাকীত্ব কবিকে পীড়িত করে তোলে। তিনি রক্তাক্ত হন এক কম্পিত অলৌকিক আনন্দ ভাবে।—যিনি কবি তিনিতো এই বোধ, এই

এষণা, নিয়ে অহর্নিশ ফিরেন। তিনি বর্তমানের হয়েও যেন অতীতের মানুষ। তার ফিরে আসা স্মৃতির ভিতরেই যেন তিনি জীবন যাপন করেন। সেখানে তিনি দেখতে পান জীবনের অন্য বিকাশ। কবির ভেতরে যেন ভেসে উঠে বিভিন্ন অতিন্দ্রীয় প্রতিমারা। তারা তাকে ক্রমশঃ ক্ষিপ্ত করে তোলে, আবার আকুল করে, আবার প্রেমে তাকে দুর্জয় করে তোলে। সারাক্ষণ বিষাদ তাকে আক্রান্ত করে। এই বিষাদ কখনো মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে, মহাজাগতিক যন্ত্রণাবোধ সময়ের দুঃসহ চাপ থেকে অন্যবিধ কারণ থেকে আসতে পারে। যন্ত্রণায়, নিঃসঙ্গতায় তিনি মত্ত হয়ে উঠেন। চারিপাশ থেকে নির্বিকারভাবে সরে যান তিনি, দুঃখ পান প্রতিবেশ দ্বারা। হয়তো মানসিক যোগাযোগের ভাষা হারিয়ে ফেলেন। বন্দি থাকেন মায়াবী ভাষার জগতে।'—তেমনি শিমুলের ইচ্ছার ক্রমিকতা ক্রমেই তাকে খণ্ড খণ্ড করে তোলে যখন নিজের আমিত্বে ক্রমশঃ নিজেই ভেঙে যান--

আমার যুবক অনুবাদ করে
আশ্চর্য শূন্যতা এক রমণীর চোখ,

বিষয়ী আমি এভাবেই আপেক্ষিকতার সূত্রে বিষয় আমি হয়ে যায়। ফলে তিনি স্বপ্ন দেখেন এবং স্বপ্ন দেখান—

সেই মেয়ে কাঁচের আড়ালে
কি করে জানলো রাস্তার এমন অর্থ
ওর চোখে রাস্তা অনুবাদ হয়
কেমন আকাশ বরাবর উঠে গেলো

এভাবে কবিতা তার কাছে আইজেন্টাইন বর্ণিত মন্টাজের মতো এক অনিবার্য গুণফল,—যা জন্ম দেয় তৃতীয় সংখ্যা যা পূর্ব থেকে গুণেও ওজনে ছাড়িয়ে যায়। কবি মূলত ধার না নিয়ে কাজ করেন। সে ধার প্রাকৃতিক বা প্রথাগতভাবে চিহ্নায়ন করে হোক না কেন, বাকরীতির বিপর্যয়ের ফসল হোক না কেন তাকে নিয়েই কারবার। এই কারবারে শিমুলের অতি শব্দ মুখীনতার জন্য মাঝে মাঝে তার উচ্চারণ তরল হয়ে গেছে বলে মনে হয়।

শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মী তাদের প্রিয় ভালোবাসাকে দীর্ঘদিন,
ঘুউম পাড়িয়ে রাখলেন, আর তাদের হাসিরা

সে সময় শুয়ে থাকতো ঘরের মেঝেতে এবং
প্রিয়তম আটপৌরে খেলারা সব বসে থাকতো উঁচু উঠোনে।

—এখানে বিমূর্ততার সাথে মূর্ততার প্রতিতুলনায় বক্তব্য জানা হয়ে গেছে অনেকটা। আবার 'মেঘদূত' কবিতাটির বিষয়বস্তু নূতন হলেও কবিতার প্রতীক আবেগ নির্ভর না হয়েও জ্ঞানাত্মক প্রতীক হয়ে গেছে যা তথ্য নির্ভর হয়ে উঠেছে।—

মেঘেদের কোন রাষ্ট্রীয় সীমারেখা নেই
কেবল সীমারেখা কার্যকরী হয়
চাকার দ্রুতিতে। চাকা আমাদের
ভূগোল শিক্ষা দেন।
আমাদের রাষ্ট্রের সীমানা
উত্তরে জলপাইগুড়ি
দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ইত্যাদি ইত্যাদি—

এই তথ্যের তালিকায় বৈচিত্র্য নেই অযথা বর্ধন ছাড়া। বস্তুর অন্তররূপকে, গোপন শক্তিকে তিনি হৃদয়াত্মক অনুভূতি ও স্বজ্ঞা মিশিয়ে আলোতে আনতে পারেননি যা আধুনিক কবিতার লক্ষ্যণা-ত্মক দিক। তিনি এক্ষেত্রে প্রতিশ্রুত দক্ষতার পরিচয় দেননি, যা একটি উৎকৃষ্ট কবিতা হয়ে উঠতে পারত।

শিমুলের বিষয়বস্তু প্রায়শঃ নূতন। তবে তার দেখার প্রেক্ষিত ভিন্ন। এটাই কবিত্ব। হাজার বছর আগেও ফুল, পাখি, নারী নিয়ে কবিতা লেখা হয়েছে। সুদূরেও হবে। তবে এই দেখার নূতনত্বই একমাত্র কাব্যের বিকাশ নয়। বিকাশ অন্য জিনিস। সৃজনীশক্তিই কবিতার প্রাণ। শিমুলের কবিতাগুলোতে যে চিত্রকল্প, রূপক সংযোজিত হয়েছে তা যথেষ্ট সময়ের অভাবে পরিপক্ক হয়ে উঠবার হয়তো অবকাশ পায়নি। তবে অবশ্যই তা সব ক্ষেত্রে নয়। তার ক্ষেত্রে হঠাৎ হঠাৎ-ই এমনটি ঘটেছে মাত্র। যা অতিক্রম যোগ্য।

শিমুল অনেক নূতন শব্দ, প্রতীক আমদানী করেছেন। প্রতীক, চিত্রকল্প, রূপক কবিতাকে বিমানবীকরণ করে না। যদি সঠিক প্রয়োগ হয় তবে তা কবিতাকে আরো মানবিক করে তোলে। বোদলেয়ার যে

রাজহাসের প্রতীক সৃষ্টি করেছিলেন সেখানে তিনি মানবিক যন্ত্রণা, সংঘাতকেই চিহ্ণায়ন, নির্দেশ করেছেন। অথবা ইয়েটস-এ—'ঐ তারাগুলির মধ্যে আমার রক্ত বয়ে চলে।'—এ সমস্ত এখন সরল হয়ে গেছে। আজকের প্রতীক, উপমা আরো তীব্র, জটিল, প্যাঁচানো। প্রতীকের কোন রীতি নেই। এটা যদি ব্যাখ্যাযোগ্য হয় এবং পাঠককে কম্যুনিকেট করে তবেই এটা রীতি সিদ্ধ হয়ে উঠলো। শিল্পের বিকাশ কারো ক্ষেত্রে ঘটে কারো ক্ষেত্রে ঘটে না। কিন্তু নূতন শিল্প সবাইকে সৃষ্টি করতে হয়। বিকাশ ঠিক আবিষ্কারের মত। বোদলেয়ার এমন সব উপাদান কবিতায় আনলেন যা পূর্বে ছিল না। তেমনি শ্যাক্সপীয়রে দেখা যায়। অনেক কবিগণ এত কষ্ট করতে অভ্যস্থ নন। এসব ক্ষেত্রে সৃজনী প্রেরণা কাজ করে। এসব কবিতা আমাদেরকে এক নূতন সম্ভবনার ইঙ্গিত দেয় মাত্র। আরো দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে। আমি নির্মোহভাবে কথাগুলো বলছি। শিমুলের মহৎ প্রয়াস থেকেই একদিন মহৎ কবিতা সৃষ্টি হতে পারে। সেই লক্ষণ শিমুলের কাব্যে উপস্থিত। মহৎ কবিতা হয় প্রায়ই দিব্যদর্শী। এদের যে সার্বজনীন ও সাধারণ গুণ তা হলো মানবিক গুণে ভরপুর, এতে জীবনের গভীর আনন্দ-যন্ত্রণা, প্রেম-বিরহ এক বিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে মর্মর মূর্তির মত। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ যেন একই বিন্দুতে সমপাতিত। এতে জীবনের গভীর দর্শন ছড়িয়ে আছে; যা অনেক গভীর থেকে উঠে এসেছে। বোদলেয়ার অর্থহীন বলেননি যে, দর্শনই সব কিছু। গভীর অনুপ্রেরণা, ভালবাসা, আন্তরিকতা থাকতে হবে সমানুপাতে। এর জন্য ব্যক্তিগত জীবন যাপন বদলানো দরকার, ব্যক্তি সত্ত্বার পরোৎকর্ষতার দরকার। অস্তিত্বের মূলে অনুসন্ধান করতে হবে। গৌতম বুদ্ধের মত না পারলেও একটা প্রণালীবদ্ধ চর্চা করতে হবে। আসলে গোপন ভাণ্ডার, কৃৎকৌশল সেখানেই, সেই মহৎ দর্শনের আড়ালে। এর জন্য মানসিক দিব্যতার দরকার, যার অনেকটাই সহজাত গুণ।—"একটি পাহাড়কে নিছক সাদা চোখে দেখলে তাতে অন্যকিছু চোখে পড়বে না। কিন্তু সে দেখায় যদি আবেগ, অনুধ্যান হাত মেলায় তাহলে এতে অসীমত্ব, আশ্চর্য অসাধারণত্ব চোখে পড়ে। দৃশ্যের এই রূপের ভেতরে অরূপকে, অসীমকে দেখার জন্য দিব্যতার দরকার। দৃষ্টির সাধনার দরকার। এটা অনুশীলন করে অর্জিত হতে পারে·········স্রষ্টার কাছে নতজানু

হয়ে বলা দরকার,—'প্রভু অরূপকে অসীম সৌন্দর্যকে দেখান, মহাজাগতিক শক্তিকে ধরতে চাই।'—মহৎ কবিতা বিষয়বস্তুতে থাকে না। এর ব্যবহারের দক্ষতা শৈল্পিক পদ্ধতিতে থাকে। একই বিষয় নিয়ে দু'জন দু'ধরণের কবিতা লিখতে পারেন। কেউ মহৎ, কেউ নিকৃষ্ট। এর জন্য একটা মানস জগত সৃষ্টি করে নিতে হবে এবং মানবিক বীক্ষা অর্জন করতে হবে। মহৎ কবিতার উপাদান যতনা বাইরে থেকে এসেছে তার চেয়ে ভেতর থেকেই বেশী এসেছে।"—কবিকে ঘিরে অসংখ্য অনুভূতি বিরাজিত থাকে। কোনটা গুরুত্বপূর্ণ, কোনটা গুরুত্বহীন, কোনটা তীব্র, কোনটা ক্ষীণ, কোনটা দীর্ঘ, কোনটা হ্রস্ব, শিমুল সঠিকমত সেসবকে পরিস্রুত করতে পারেননি অনেক ক্ষেত্রেই। অনেক ক্ষেত্রে মূল বক্তব্য থেকে সরে গেছেন। এতে কবিতার থীম দুর্বল হয়ে ওঠে। একজন প্রকৃত কবিকে অবশ্যই নির্মম সন্ন্যাসীর মত অপ্রয়োজনীয় আবেগ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে নিজেকে। বিপদজনক আবেগ থেকে যা শিল্পের ক্ষতি করে। আবেগ শিল্পসৃষ্টিতে প্ররোচিত করে কিন্তু প্রকৃত শিল্পে সেই আবেগের কোন কলুষ চিহ্ন পড়ে না। শিল্পের মন্দির যখন নির্মাণ হয় তখনই বাহুল্য আবেগ বিদায় নেয়। কেউ কেউ সেই আবেগেরই হুবহু অনুবাদ করেন। এতে করে কবি আবেগ কেন্দ্রিক হয়ে পড়েন। ফলে কবিতার সমগ্র সংগঠনের অন্যান্য অংশ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েন। অথচ এই আবেগ স্বচ্ছ চিন্তা, গভীর প্রজ্ঞা ও শুদ্ধ আত্মার স্পর্শে ভাষিক পরিপক্কতা লাভ করতে পারে।

এ সব সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠা দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার হলেও তা অসম্ভব নয়। শিমুল এলিয়টের 'তিনস্বর, ঐতিহ্য ও ব্যক্তিমনীষা' এবং অন্যান্য প্রবন্ধগুলি ভাল করে রক্তে মাংসে মিশিয়ে নিলে উপকৃত হবেন। ভ্যানখোকের 'হলুদ চেয়ার', 'গম ক্ষেতে কাক', 'ক্যাফেতে দুই রাত' চিত্রগুলি যথাস্থিতিবাদীদের মতো ছিল না। তবে তিনি যা এঁকেছিলেন তা ঐ বস্তুর সত্ত্বা। আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়, তবে একে বর্জন করা যায় না। অনুভূতিই কাঁচামাল যা জরুরী। এক্ষেত্রে মহৎ কবিতায় ব্যক্তিগত আবেগের পরিমাণ কম থাকে। তবে আবেগ ও অনুভূতির মিথস্ক্রিয়া থাকতে পারে। একটা অনুভূতিকে আবেগ পরিবর্তিত করে দিতে পারে আবার

পরিস্ফুত অথবা এলোমেলো করতে পারে। এটা শিল্পীর ব্যক্তি মানস দ্বারা নির্দিষ্ট হতে পারে কখন কোথায় তা সংযোজিত হবে। আবেগশূন্য কতকগুলো অনুভূতির সমষ্টি হতে পারে কোন কবিতার অংশ আবার আবেগ তাড়িত অনুভূতির সমবায়ে তৈরী হতে পারে তা। প্রতিক্ষেত্রেই সজাগ ও সচেতনভাবে এসবের ব্যবহার লক্ষ্যযোগ্য। এক্ষেত্রে রিলকের 'শৈশব' এবং শিমুলের "কৈশর" কবিতাদ্বয়ের আবেগ অনুধাবনযোগ্য।

ক. রিলকে ঃ আহা নিঃসঙ্গতা, আহা মন্থর সময়......
এতক্ষণে ছুটি!
....
....
আহা সেই আশ্চর্য সময়—সময়, যা অলক্ষ্যে ফুরায়,
আহা নিঃসঙ্গতা।

(—বুদ্ধদেব বসু অনূদিত)

শিমুল ঃ কোথাও ঢেউয়ের শব্দ। আমরা নাইতে চলেছি।
বেশ সকাল। সকাল অনেক।
এইমাত্র, বড় সড়ক ছুটে বেরিয়ে গেলো
যাত্রীবাহী কোচ।
দূরপাল্লার কোচ।
আহা, কোচের মানুষেরা
আমাদের চেনে না, চেনেনা
তবু তাকায়, হয়তো কচি আঙুল তুলে
ছোট্ট বালিকা
দেখায় নদী।

খ. রিলকে ঃ ওখানে দাঁড়ানো বাড়ি, কখনো বা একটা কুকুর,
আর ত্রাস, যা নিঃশব্দ রূপান্তরে হ'য়ে ওঠে সরল প্রত্যয় ঃ
আহা দুঃখ, অর্থহীন ; আহা স্বপ্ন, ভয়,
আহা সেই নিস্তল গভীর।

(—বুদ্ধদেব বসু অনূদিত)

শিমুলের আন্তরিকতার কমতি নেই। তার একটি বিশেষ দিক আমাকে মুগ্ধ করেছে। তা হলো বিজ্ঞানমনস্কতা তার আবেগকে

শুষে ফেলেনি। একরাশ তাজা শিউলির মতই তার অনুভূতি। অবিরাম বিজ্ঞান চর্চা শিল্পের জন্য ক্ষতিকর বৈকি। এলিয়টের নৈর্ব্যক্তিক হওয়ার অর্থ বিজ্ঞান মনস্কতা নয়। বিজ্ঞান নির্ভর কবিতায় দেখা যায় যুক্তির বাহুল্য। হৃদয়ের স্বতঃস্ফুর্ত আলো, নম্রতা, সততার স্বরূপকে বিজ্ঞান উন্মোচন করে না, প্রদর্শন করে মাত্র। কবিতাই সত্য উন্মোচন করে। কবিতার কাজ আরো দূরের, আরো বিশাল। শিল্পের প্রতি দায়বদ্ধ থাকাই বড় কথা। অবশ্য-ভাষার ব্যবহার, শব্দের অতীন্দ্রিয় অর্থের রহস্য, নূতন নূতন চিত্রকল্প রূপক অন্বেষণ· বিষয়বস্তুর সাথে জুতসই শিল্প-প্রকৃতির অন্বেষণ, ইঙ্গিতধর্মী প্রতীকের ব্যবহার কবিকে অবিরলভাবে সৃষ্টি করে যেতে হবে। সমকালীন বিজ্ঞান নির্ভর গতিস্রোত থেকে খানিকটা দূরত্ব রাখলে ক্ষতি কি? এটা হয়তো অনুধাবন করেছেন বলেই সমকালীন অন্যান্যদের মত বিজ্ঞান নিয়ে মতামাতি করেননি শিমুল মাহমুদ। যদিও তার দর্শন ও বাক্য প্রকরণ আধুনিক ও নিরীক্ষাধর্মী। যে কোন বিষয় নিয়ে কবিতা লেখা সম্ভব, এ বিষয়টি তিনি বোঝেন। তিনি এও বোঝেন যে, উক্ত লেখাটি হতে হবে শিল্পোত্তীর্ণ। যা প্রজ্ঞাপূর্ণ মেধা ও প্রতিভাগুণে সম্ভব। প্রতিভাই সব। আর সব গৌণ।

আমার কাছে যে যে বৈশিষ্ঠ্যগুলি ভাল লেগেছে তা হল, শিমুলের মধ্যে লোকদেখানো কোন চটকদার স্ট্যান্টবাজী নেই। সৃজন-শীলতাই শিমুলের অন্বেষা। কোন জটিল, উদ্ভট মেটাফর নেই কবিতাগুলোতে। অহেতুক শব্দ নিয়ে তিনি খেলেন না। তার লক্ষ্য ধারণাকে উন্মোচন করে তা পাঠকের বোধের কিনারায় পৌঁছে দেয়া। একটা নিজস্ব মনোজগত শব্দের সংশ্লেষে সৃষ্টি করা তার লক্ষ্য। অত্যন্ত তুচ্ছ, সাদামাটা জিনিসকে শিল্পে পরিণত করার দক্ষতা। আগে কেউ এমন করে দেখিয়েছেন বলে মনে হয় না। শিমুল এক্ষেত্রে শিল্পের সততা ও ইচ্ছাশক্তির ছাপ রাখার চেষ্টা করেছেন। নিছক শব্দের পর শব্দ না সাজিয়ে বরং চেতনা দিয়ে দৃশ্য ফুটিয়ে তুলতে তিনি দক্ষ। তার লেখায় চেনা জগত যেন নূতন রঙ, রস, গন্ধ, রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়। যা আমাদের বোধে আগে তেমন তাৎপর্য নিয়ে ধরা পড়েনি। তার কাব্যে সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের বুনট লক্ষ্যযোগ্য, যা আমাদের আত্মার

সংবেদনাকে ছুঁয়ে যায়। শিমুলের বক্তব্যে আড়ষ্ঠতা নেই। আছে খুব স্বচ্ছ সাবলীল গতিভঙ্গি যা সাধারণত পরিণত কবিদের লেখায় দেখা যায়। যা তার নীরব ও গভীর অনুশীলনেরই ফলাফল। ছন্দের ক্ষেত্রে শিমুল মাহমুদ প্রথাগত ব্যাকরণকে অতিক্রম করে গেছেন।

বাস্তবিকই যুক্তিগৎ প্রথাবদ্ধ ব্যাকরণ অনুসরণ করা অপরিহার্য নয়। শিমুল ফিরে তাকান আত্মার নম্রতার দিকে, আত্মার মুক্তির দিকে। যেখানে আছে এক আশ্চার্য সঙ্গতি, অদ্ভুত সঙ্গতি, যা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ঘটে যায়। কোন চিন্তা যোগ করার আগেই এমনকি চিন্তার কোন চিত্রকল্প ছাড়াই তা হতে পারে। আত্মার গোপন আবেগ, সৌন্দর্যকে তিনি নিকষিত করে আনেন। তার প্রতিটি কবিতার পেছনে এক ধরণের সহজাত আবেগী অনুপ্রেরণা কাজ করে। একটা নস্টালজিক যন্ত্রণা তিনি অনুভব করেন এবং যন্ত্রণাকে বিরল কৌশলে পাঠক হৃদয়ে পৌঁছে দিতে চান। পাঠক এতে একাত্ম হতে পারে এখানে যেন পাঠকের আত্মার ক্রন্দন বাজে। এমনি করে হার্দ্যিক আন্তরিকতা দিয়ে তিনি সাদামাটা শব্দে এই-সব বিরল প্রাণময় অনুভূতিকে গাঁথেন শব্দের পর শব্দ দিয়ে যেন আড়াল থেকে সেসব ফেটে বের হতে চায়, চেয়ে থাকতে চায়। সৌন্দর্য যেন হেসে উঠে। পাঠক নিশ্চয়ই তৃপ্ত হন এই সৌন্দর্যে অবগাহন করে।

পরিশিষ্ট ঃ

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিমুলকে দেখেছি লেখালেখি নিয়ে প্রথম থেকেই সারাক্ষণ ব্যস্ত। কতবার দেখেছি স্কাই জিনস্ আর গেঞ্জি পরে নিত্য নূতন মোটা মোটা পুস্তক হাতে হেঁটে যাচ্ছেন। তখন থেকেই পত্রিকা বের করছেন। সময়টা ১৯৮৬ কি ৮৭ সাল হবে। এক-দিন ডেকে নিয়ে একটি পত্রিকা ধরিয়ে দিলেন। যখনই আলাপ করেছি ভাল লেগেছে। আমার মনের দ্বার খুলেছে। এম. এইচ. হলে আমাদের আড্ডা জমত। লেখালেখিতে আমি শিমুলের পরে আসি। তবুও নানা কারণে সীরিয়াস হতে পারিনি। আমি তখন জীবন তৃষ্ণায় কাতর। একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব ছিলনা।

রাজনীতিও করতাম। কিন্তু অচিরেই রাজনীতি ছেড়ে শিমুলদের সাথে ভিড়ে যাই। যক্ষ্মারোগের অবনতি ঘটলে এম. এ. না করেই বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দিলাম। কবি সুব্রত অগাষ্টিন গোমেজ-এর কাছে শিমুলের 'মস্তিষ্কে দিনরাত্রি' দেখে চেয়ে নিলাম। এবং নষ্টালজিয়ায় আক্রান্ত হলাম। ঠিক করি একটা সমালোচনা তৈরী করব। কিন্তু নিজের দিকে তাকিয়ে আরো চারটি বৎসর কেটে গেল। শিমুল প্রচার বিমুখ খানিকটা লাজুক প্রকৃতির বলেই আমাকে অনুরোধ করেননি সমালোচনা লিখতে। সমালোচনার মত কঠিন কাজ করতে গিয়ে যথেষ্ট উদ্বেগ ও ভয় ছিল। অনেক ভেবে চিন্তে লেখাটি তৈরী করলাম। শিমুলের কাছে আমি গভীর-ভাবে ঋণী। শিমুল আমার ভরসার স্থল। এতদিনে হয়ত হারিয়ে যেতাম। ফলে বন্ধু হিসাবে তার কাব্যের সমালোচনার দায়িত্ব পালন কঠিন। তবুও আমি কোন আবেগ তাড়িত না হয়ে নির্মোহ-ভাবে লেখাটি তৈরী করেছি। এবং শিমুলের কাব্যের দুর্বল দিক-গুলিকে সনাক্ত করার চেষ্টা করেছি। শিমুল মাহমুদকে নিয়ে আমাদের প্রত্যাশা করার আছে, তার গভীর, তীব্র, ছোট ছোট এইসব কোমল হৃদয় সঞ্জাত অনুভূতিগুলি, ভাবনাগুলি, আন্তরিক-তায় ও প্রাণময় অনুভবে যেন অনেক গভীর সাধনার, যন্ত্রণার ফল হয়ে পাঠকের হৃদয়ে কান্না ঝরায়, আনন্দ দেয়, প্রভুর কাছে এই প্রার্থনা করি।

—মাঘ, ১৪০১ বঙ্গাব্দ

শুভ-এর স্বরূপ (**The nature of good**) অভিজ্ঞতা থেকে শেখা যেতে পারে, কেবলমাত্র যদি অভিজ্ঞতার আধেয়কে (**Content**) প্রথমে শুভ ও অশুভ অথবা অপেক্ষাকৃত ভাল ও অপেক্ষাকৃত মন্দ-এর ক্রমে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। এ জাতীয় শ্রেণীকরণ বা ক্রমবিন্যাস ইতিমধ্যেই ঐ একই নীতির বিধিসম্মত (**legislative**) প্রয়োগের অন্তর্ভুক্ত যাকে অনুসন্ধান করা হচ্ছে। যুক্তিবিদ্যার নীতিসমূহকে কেবলমাত্র তখনই দৃষ্টান্ত থেকে সাধারণীকরণের (**generalization**) মাধ্যমে অনুমান করা যেতে পারে যখন বৈধ যুক্তির দৃষ্টান্ত সমূহকে কোন মানদণ্ডের ভিত্তিতে প্রথমে পৃথক করা হয়। এই মানদণ্ডকে প্রকাশ করাই হচ্ছে সাধারণীকরণের কাজ। সৌন্দর্যবিজ্ঞানে (**Ethetics**) সুন্দরের মানদণ্ডকে যদি প্রথমে সঠিকভাবে প্রয়োগ করা যায় তাহলেই কেবল সৌন্দর্যের নিয়মসমূহকে (**laws of the beautiful**) অভিজ্ঞতা থেকে অর্জন করা যেতে পারে।

(—সি. আই. লুইস / শিমুল মাহমুদ অনূদিত)

Mind and the World Order (Newyork : charles scribner's sons. 1929) ২৯ পৃষ্ঠা, **The Ground and Nature of the Right (Newyork : Columbia University Press. 1955)** ২০—৩৮ পৃষ্ঠায় তাঁর **Critique of cogency** সম্বন্ধীয় আলোচনার সঙ্গে তুল্য।

অধিবিদ্যা ও দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি

শাহ আলম

প্রকৃতি ও সমাজ সম্পর্কে আমরা বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে বিভিন্ন ধরণের ধারণা পেয়ে থাকি। কিন্তু এসব ভিন্নমুখি ধারণাসমূহকে আমরা তিনটি উৎস থেকে উৎসারিত বলে ধরে নিতে পারি,—দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম। ঐতিহাসিকভাবে

দেখলে দেখা যাবে দর্শন মূলত পরস্পর বিরোধী দুটি ভাগে বিভক্ত—বস্তুবাদ ও ভাববাদ। বিষয়বস্তু বিচারে এই ভাববাদ আর ধর্ম আসলে একই জিনিস, পার্থক্য শুধু বহিঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে। ভাববাদে সত্যের অনুসন্ধান চলে কিন্তু ধর্মে তা স্বীকৃত নয়। বরং নির্দিষ্ট কাঠামোগত পূর্বধারণাকে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করাই ধর্ম।

হেগেল বলেছেন, পদ্ধতি হল বিষয়বস্তুরই গতি প্রকৃতি এবং এজন্য বিষয়বস্তু ব্যতিরেকে তার পদ্ধতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন সম্ভব নয়। অর্থাৎ পদ্ধতি বা উপায় বিষয়বস্তুর (অনেক ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যের) অনুগামী। দর্শনের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু ও তার পদ্ধতি সবকিছুই বেরিয়ে আসে মূল বা প্রধান প্রশ্ন থেকেঃ কোনটি প্রাথমিক? —'বস্তু' না 'মন'?—বস্তুবাদ মনে করে বস্তুই প্রাথমিক আর মন বস্তুরই বিকশিত অবস্থার উন্নত গুণাবলী (মানব মস্তিষ্কের সমন্বিত কার্যকলাপ)।—এই বস্তুর পরিবর্তনের কারণ নিহিত থাকে তার অভ্যন্তরে বিপরীত গুণের দ্বন্দ্বের মধ্যে, বস্তু স্বগতি সম্পন্ন। তাই কোন বস্তুকে পর্যবেক্ষণ করতে হলে বা তার অবস্থান, বিকাশ ও পরিবর্তন লক্ষ্য করতে হলে উক্ত বস্তুর বিশ্লেষণ থেকেই শুরু করতে হবে, যা সম্ভব বাস্তব পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা। এটাই হচ্ছে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি। অপর পক্ষে,—ভাববাদের মতে বস্তু নয়,—মন বা চেতনা (ধর্মে যা সৃষ্টিকর্তা) হল প্রাথমিক। আর বস্তু হচ্ছে চেতনার দ্বারা সৃষ্ট বা বহিঃপ্রকাশ মাত্র। ফলে কোন বস্তুর অবস্থান, বিকাশ ও পরিবর্তনের কারণ বস্তুটির মধ্যে খুঁজলে চলবে না; বস্তু বহিঃশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ সবের কারণ হল বস্তুবহির্ভূত, যা রয়েছে সেই মনে বা অতীন্দ্রিয় চেতনার আওতায়। অর্থাৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তার নাগাল পাওয়া যাবে না। এভাবে সৃষ্টি হয় মিথ্যার মোহজাল। ভাববাদী দার্শনিকদের মনগড়া সমাধান বা আত্মকেন্দ্রিক অলীক চিন্তাচেতনাই তখন মানুষের পাথেয় হয়ে দাঁড়ায়। আধুনিকযুগের প্রয়োজনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে হলেও এসব ধারণাকে গভীরতর বা যৌক্তিক জ্ঞানে উন্নীত করা হয় না। এই যে বস্তুর গতি বা পরিবর্তনের কারণ বস্তুর বাইরে খোঁজা, বিবিধ পূর্বধারণা নিয়ে মেতে থাকা, আত্মকেন্দ্রিক চিন্তানুসারে বাস্তব জগতকে দেখতে চাওয়া,—এ সবই অধিবিদ্যক পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি। অর্থাৎ বিষয়বস্তু

যখন বস্তুবাদ তখন তার পদ্ধতি হয়ে দাঁড়ায় বাস্তবতাকে উপজীব্যকারী দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি আবার বিষয়বস্তু যখন ভাববাদ তখন তার অনুগামী পদ্ধতিও হয়ে দাঁড়াচ্ছে তার মতই বস্তু বহির্ভূত বাস্তবতাবর্জিত অধিবিদ্যক পদ্ধতি।

এসব বিষয়কে যদি আমরা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখব বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হচ্ছে বস্তু বা বাস্তব প্রকৃতি জগত। বস্তু অতিরিক্ত মন বা চেতনার জগত নয়, আমাদের চারপাশের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগত, অতীন্দ্রিয় কোনো কল্পনার জগত নয়। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই বস্তুজগতকে জানা, এর মধ্যে ক্রিয়াশীল নিয়মসমূহ উদ্ঘাটন করা। এবং একে মানব কল্যাণে কাজে লাগানো। অর্থাৎ প্রকৃতিকে জানা ও পরিবর্তন করা, কোন অলীক জগতের অলীক কল্পনার জাল বোনা নয়। এই উদ্দেশ্য পূরণ করতে বিজ্ঞান যে পদ্ধতি বা উপায় অবলম্বন করে তা হল বাস্তব জগতের বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষা। বস্তুজগতকে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ও তা থেকে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত টানাই বিজ্ঞানের পদ্ধতি। অর্থাৎ বিজ্ঞানের ধারণাসমূহ হল বস্তু জগতেরই নিয়মনীতি। অতীন্দ্রিয় সত্তা, মন বা চেতনার ইচ্ছা, অলৌকিক মতামত বা আদেশের তোয়াক্কা বিজ্ঞান করে না। বিজ্ঞান বস্তুজগতকে দেখে বস্তু জগতের ভেতর থেকেই, কোন পূর্বধারণা বা কারো মতামত বা মনগড়া বিশ্বাস বস্তু জগতের উপর চাপায় না। অর্থাৎ বস্তুর রূপ, বিকাশ বা পরিবর্তনের কারণ খোঁজে বস্তুর অভ্যন্তরেই; অতীন্দ্রিয় মন, চেতনা বা সত্তায় নয়। তাই একথা সুস্পষ্টভাবে বলা যায় বিজ্ঞানের অবলম্বন বা পদ্ধতি হচ্ছে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি, অধিবিদ্যক পদ্ধতি নয়। বিজ্ঞান মূলত বস্তুবাদী, এতে ভাববাদের কোন স্থান নেই। বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি উভয় দিক থেকেই বিজ্ঞানের সাথে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের অবস্থান মিলে যাচ্ছে অথচ কোনভাবেই ভাববাদের সাথে বিজ্ঞানের মিল বা সাদৃশ্য নেই। ভাববাদ ও অধিবিদ্যা অতীন্দ্রিয় বা পরলোক সম্পর্কে যে ধারণাই দিক না কেন আমাদের সমাজ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে যে ধারণা দেয় তা অলীক কল্পনামাত্র, বাস্তব পরীক্ষালব্ধ সত্য নয়।

সাধারণভাবে বলা যায়, দর্শনের ইতিহাসই হচ্ছে ভাববাদ ও

বস্তুবাদ এবং তাদের পদ্ধতি যথাক্রমে—অধিবিদ্যা ও দ্বন্দ্বতত্ত্বের আবির্ভাব, বিকাশ ও সংগ্রামের ইতিহাস। সত্যানুসন্ধানের উভয় ধরণের পথ ও পদ্ধতির মধ্যে বাস্তব জগতের ক্ষেত্রে সত্যের সন্ধান দিতে পারে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান নির্ভর দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ; ধর্ম বা ভাববাদ নয়। মূলত সামাজিক কারণেই ভাববাদ ও অধিবিদ্যা বাস্তব সত্যের বিকৃতি ঘটায় এবং মানুষকে অলীক অতীন্দ্রিয় ধাঁধাঁয় ফেলে। কারণ সামাজিক সত্যের বাস্তবিক উদ্ঘাটন প্রগতিশীল শ্রেণীর পক্ষে চলে যায়, যার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী বাস্তব সত্যের বিকৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করে। আর ধর্মযাজক ও ভাববাদী দার্শনিকেরা তাদের কর্তব্য সুচারুরূপে পালন করে মাত্র। এমনকি এরা বিজ্ঞানের অবদানকে পর্যন্ত মানবকল্যাণের পরিবর্তে শোষকের মুনাফা বৃদ্ধিতে অপব্যয়িত হবার যুক্তি যোগায়।

বস্তুবাদী জ্ঞানবিদ্যার দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন কার্ল মার্কস। এঙ্গেলস ও লেনিন একে বিবিধ উপায়ে বিকশিত করেন, যা দেখা যায় তাঁদের বিভিন্ন দার্শনিক রচনায়। তবে তাঁদের ধারণা সমূহের উপর ভিত্তি করে একে সৃজনশীল পদ্ধতিতে সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্য করে তোলেন মাও সেতুঙ। যেমন লেনিন বলেছেন,—'জীবন্ত পর্যবেক্ষণ থেকে বিমূর্ত চিন্তা এবং তা থেকে অনুশীলন,—এটাই হল সত্যকে অবধারণের দ্বান্দ্বিক পথ, বিষয়গত বাস্তবতাকে অবধারণের দ্বান্দ্বিক পথ।'—এই ধারণারই বিশদ ব্যাখ্যা ও সৃষ্টিশীল বিকাশ লক্ষ্য করা যায় মাও সেতুঙ-এর 'মানুষের নির্ভুল চিন্তাধারা কোথা থেকে আসে?' নামক প্রবন্ধে। আমরা মূলত এই প্রবন্ধ থেকেই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী জ্ঞানতত্ত্ব আলোচনা করব।

মানুষের সঠিক চিন্তাচেতনা ভাববাদী অধিবিদদের দাবিমত সমাজের বাহির হতেও আসে না, আবার সে তা নিয়েও জন্মায় না। মানুষের সঠিক চেতনা আসে সমাজের ভেতর থেকে, তার সামাজিক কার্যকলাপের মাধ্যমে। এই সামাজিক কার্যকলাপের মধ্যে রয়েছে প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনের জন্য কর্মকাণ্ড, বিভিন্ন শ্রেণীর সংগ্রাম বা রাজনীতি এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা শৈল্পিক সাধনা। এই সব সামাজিক কার্যকালীন সময়ে বাস্তব জগতের বিভিন্ন ঘটনা আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মস্তিষ্কে

প্রতিফলিত হয়। এভাবে যে জ্ঞান অর্জিত হয় তা হল ইন্দ্রিয় জ্ঞান। যখন এই ইন্দ্রিয় জ্ঞান প্রভূত পরিমাণে সঞ্চিত হয় তখন তা যদি আমরা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সংশ্লেষিত করি বা সাধারণীকরণ ঘটাই তখন আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রে একটা গুণগত উল্লম্ফন ঘটে। এভাবে তখন যে জ্ঞান অর্জিত হয় তা হচ্ছে ধারণাত্মক জ্ঞান,— যাকে বলা যায় চিন্তাধারা। এটা হল দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী জ্ঞানতত্ত্বের গোটা প্রক্রিয়ার প্রথম পর্যায়। অর্থাৎ বাস্তব তথ্য বা পদার্থ থেকে আন্তমুখি চেতনায়, সত্তা থেকে চিন্তাধারায় চালিত হবার পর্যায়। এই পর্যায়ে চেতনা বা চিন্তাধারা (তত্ত্ব, নীতি ও পরিকল্পনা) বাস্তব জগতের নিয়মগুলোকে প্রতিফলিত করে কিনা তা প্রমাণিত হয় না; কিম্বা স্বরূপ অথবা ত্রুটি নির্ধারিত হয় না। এরপর আসে জ্ঞান-প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ চেতনা থেকে বস্তুতে বা চিন্তাধারা থেকে বাস্তব সত্তায় চালিত হবার পর্যায়। অর্জিত চেতনাকে অনুশীলনে নিয়ে আসা হয় বলে এই পর্যায়ের নামকরণ করা যেতে পারে অবরোহী পর্যায়। এই আরোহ ও অবরোহ মিলেই সম্পূর্ণ হয় দ্বান্দ্বিক জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া।

লেনিন বলেছেন যে, অবধারণের যেকোন দিক বা বৈশিষ্ট্যকে পরম করে তোলাই অধিবিদ্যক। সমাজ ও প্রকৃতির সকল বস্তুই বিপরীত গুণের সমন্বয়ে গঠিত। অবধারণ হল বিরোধাত্মক বস্তুসমূহেরই মস্তিষ্কে প্রতিফলন। ফলে অবধারণ প্রক্রিয়া বা জ্ঞানতত্ত্বে বিপরীতার্থক প্রত্যয়ের সমন্বয়ে নির্মিত হয় পূর্ণাঙ্গ দ্বান্দ্বিক জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া, যেমন—বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ, আরোহ ও অবরোহ, অবভাস ও সারবস্তু, মন ও বস্তু এবং অভিজ্ঞতা ও যুক্তি ইত্যাদি। এসবের যে কোন দিকটির দিকে অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান বা পরম করে তোলাই আমাদের অধিবিদ্যায় নিয়ে যাবে; যেমন নিয়ে গেছে পশ্চিমা বিশ্বের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীদের। সেখানে বিজ্ঞানী প্রযুক্তিবিদেরা পরিণত হন যৌক্তিক বা সংশ্লেষণ ক্ষমতাহীন এক একজন বিশ্লেষক বা বিশেষজ্ঞে আর সমাজবিজ্ঞানী ও দার্শনিকেরা পরিণত হন সামাজিক ভূমিকা বা প্রয়োগহীন তাত্ত্বিক চিন্তাবিদে। আর উভয়েরাই কার্যতঃ ভিন্ন প্রকারের হলেও অধিবিদ ও ভাববাদীতে পর্যবসিত হন। শুধু তাই নয় এক একটা দিককে পরম করে তুলতে যেয়ে তাঁরা উক্ত বিরোধী দিক

বা বৈশিষ্ট্য সমূহের ঐক্যকে ধ্বংস করে একটা থেকে আরেকটাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছেন। আরোহ থেকে অবরোহকে বিচ্ছিন্ন করে এক একটিকে পরম করে তোলার ফলে সৃষ্টি হয়েছে দু'ধরণের যুক্তিবিদ্যার পদ্ধতি আরোহী ও অবরোহী। যার কোনটিকেই পূর্ণাঙ্গ বলা যায় না এবং প্রকৃত অর্থে পূর্ণাঙ্গ সত্যে উপনীত করে না। অবভাস ও সারবস্তুর মধ্যে বিচ্ছিন্নতার দেয়াল টেনে এক একটিকে পরম করে তোলাতে "আমাদের জন্য বস্তু" এবং 'নিজের মধ্যে বস্তু' নামক ধারণার উদ্ভব ঘটেছে। ফলে বাহ্যবস্তু সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান হচ্ছে ভাসাভাসা এবং সারবস্তু চলে যাচ্ছে জানার বাইরে অজ্ঞেয়বাদে। মন ও বস্তুর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা টেনে মনকে পরম করাতে সৃষ্টি হচ্ছে ভাববাদের আবার নির্বিচারে সবকিছুই বস্তুময়' ব্যাখ্যা করাতে সৃষ্টি হচ্ছে যান্ত্রিক বস্তুবাদের। যা শেষ পর্যন্ত বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপের পথ করে দিয়ে ভাববাদে নিয়ে যাচ্ছে। অভিজ্ঞতা ও যুক্তির মধ্যে ছেদ টেনে জ্ঞানকে অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত ও অভিজ্ঞতাতেই বাক্সবন্দী করে রেখে হাতুড়ে জ্ঞানতত্ত্ব বা অভিজ্ঞতাবাদের জন্ম দিচ্ছে। অপরপক্ষে যুক্তি বা বুদ্ধিই জ্ঞানের উৎস ও পরিণতি ঘোষণা দিয়ে জ্ঞানকে করে তুলছে শেকড়বিহীন বৃক্ষে। এতে করে জ্ঞান হয়ে পড়েছে সামাজিক সংস্পর্শহীন অকর্মন্য ধারণার স্তুপ। দূরকল্পনা ও স্বজ্ঞার মতো অলীক মাধ্যম হয়ে দাঁড়াচ্ছে জ্ঞানার্জনের পথ। বিচ্ছিন্নতা অধিবিদ্যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সমাজ ও প্রকৃতির অন্তর্গত বিভিন্ন বস্তুকে তা পরস্পর বিচ্ছিন্ন স্বাধীন সত্তা হিসেবে দেখে। ফলে বস্তুর নির্দিষ্টরূপ চিরস্থায়িত্ব লাভ করে, এতে করে বস্তুর আন্তঃ-পরিবর্তন অস্বীকৃত হয়ে দাঁড়ায়। তখন তার পরিচালনার জন্য বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ অপরিহার্য হয়ে পড়ে, ভাববাদের আমদানী হয়। কারণ আন্তঃপরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন বস্তুর আন্তঃ-সংযোগ অথচ অধিবিদ্যায় রয়েছে আন্তঃবিচ্ছিন্নতা।

অধিবিদ্যার বিচ্ছিন্নতার বিপরীতে দ্বন্দ্বতত্ত্ব সমাজ ও প্রকৃতির বিষয় বা বস্তুসমূহকে দেখে আন্তঃসংযুক্ত। বস্তুজগত এর মতে এক অখণ্ড বাস্তবতা আর এতে আন্তঃসংযোগ থাকার ফলেই সম্ভব হয় এক বস্তু অন্য বস্তুতে পরিবর্তন। বস্তুসমূহের নিজেদের মধ্যে পরস্পর পরিবর্তন বা রূপান্তরের ফলে এদের নিয়ন্ত্রণ

বা পরিচালনার জন্য বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। বস্তুজগতের প্রত্যেকটি বস্তু বিপরীতগুণের সংযোগে গঠিত এবং এদেরই অবধারণের প্রক্রিয়া হিসেবে বিরোধী প্রত্যয়গুলোকে সংযুক্ত-ভাবে দেখলে তা পরিণত হয় পূর্ণাঙ্গ সত্য উদ্‌ঘাটনের দ্বান্দ্বিক মাধ্যমে আর বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে তা পরিণত হয় সত্য বিকৃতির অধিবিদ্যক পদ্ধতিতে। অধিবিদ্যার এই বিচ্ছিন্নতার রয়েছে সুনির্দিষ্ট সামাজিক উৎস। বস্তুসত্তার বিচূর্ণীভবন যেমন অতীন্দ্রিয় বহিঃ-শক্তির হস্তক্ষেপকে অনিবার্য করে তুলে ভাববাদে পর্যবসিত করে তেমনি মানবসত্তা ও সম্পর্কের বিচূর্নীভবন শোষকশ্রেণীর শাসন ও সার্বভৌমত্ব নিষ্কণ্টক ও নিশ্চিত করে। অপরপক্ষে বস্তুসত্তা-সমূহের আন্তঃসংযোগের ফলে পরস্পর রূপান্তর ও স্বগতিকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে ভাববাদকে নির্বাসিত ও বস্তুবাদকে প্রতিষ্ঠিত করে। তদ্রুপ সমাজে অধিকাংশ মানুষের মধ্যে সংযোগ স্থাপন বা একীভবন ঘটলে শোষকশ্রেণীকে উৎখাত ক'রে শোষিত মানুষের অধিকার অর্জন, মুক্তি ও বিজয়ের পথ সুগম হয়।

এবার আমরা মাও সেতুঙ প্রদত্ত দ্বান্দ্বিক জ্ঞানতত্ত্বের পূর্বের আলো-চনার ফলাফল লক্ষ্য করব। জ্ঞানতত্ত্বের দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্জিত জ্ঞানকে সামাজিক অনুশীলনে প্রয়োগ করা হয় এবং এভাবে তত্ত্ব, নীতি পরিকল্পনা ইত্যাদি প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জন করে কিনা তা নির্ণয় করা যায়। সাধারণভাবে বলা যায়, যা সফল হয় তা সঠিক আর যা ব্যর্থ হয় তা ভুল; প্রকৃতিজগতের সাথে মানুষের সংগ্রামে এটা সত্য। কিন্তু সামাজিক সংগ্রামে অগ্রগামী শ্রেণীর প্রতিনিধি শক্তিগুলো মাঝে মাঝে পরাজিত হয় তার কারণ এই নয় যে তাদের চিন্তাধারা ভুল বরং তার কারণ এই যে সংগ্রামরত শক্তিগুলোর পারস্পারিক ভারসাম্যে প্রগতিশীল শক্তির তুলনীয় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো অধিকতর শক্তিশালী। অথবা প্রগতিশীল শক্তির আভ্যন্তরীণ সমস্যা বা কৌশলগত ভুলত্রুটি ঘটেছে। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে বিকাশমান প্রগতিশীল শক্তি

ক্ষয়িষ্ণু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির উপর শেষ পর্যন্ত বিজয়লাভ করবেই।

চিন্তাধারা থেকে বাস্তবসত্তায় পরীক্ষিত হবার পর মানুষের জ্ঞানের আর একটা গুণগত উন্নয়ন ঘটে যা পূর্বের গুণগত উন্নয়নের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কেবল এই গুণগত উন্নয়নই প্রথম পর্যায়ের গুণগত উন্নয়নের সঠিকতা বা ভুলত্রুটি প্রমাণ করতে পারে। সত্যকে যাচাই করার এছাড়া আর কোন পথ নেই। একটা নির্ভুল জ্ঞান প্রয়শঃই বস্তু থেকে চেতনায় এবং চেতনা থেকে বস্তুতে অর্থাৎ অনুশীলন থেকে জ্ঞানে এবং জ্ঞান থেকে অনুশীলনে অনেকবার পুনরাবৃত্তির পরেই কেবল আয়ত্ত করা যায়।

মানুষের চিন্তাধারা যত ভিন্নরূপই নিক না কেন তা মূলতঃ দ্বান্দ্বিক ও অধিবিদ্যক এই দুই পদ্ধতিই অনুসরণ করে। পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতনতা না থাকলে অবচেতন মনে মানুষ অধিবিদ্যক পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে। কিন্তু দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য আমাদের সূক্ষ্ম দৃষ্টি তথা সচেতনতা অর্জন করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন উপায় নেই। একমাত্র সচেতনতার মধ্যেই এ পদ্ধতি ব্যবহার করা সম্ভব। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিই আমাদের সমাজ ও প্রকৃতি সম্পর্কে প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিতে পারে, দিতে পারে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি তথা বস্তুগত কাঠামোর স্বরূপ উন্মোচনে দিতে পারে জ্ঞানের শুদ্ধতা।

"বাংলাদেশের কবিতা নিয়ে ব্যাপক আলোচনায়, বৃহত্তর ময়মনসিংহের কবিতা নিয়েও পৃথক আলোচনার অবকাশ রয়েছে। আমাদের রয়েছে কবি চন্দ্রাবতীর অহংকার। এ অহংকারকে ললাটে ধারণ করেই বোধ করি বারোজন তরুণ কবির কবিতা সংকলন 'চন্দ্রাবতীর কয়েকজন সন্তান' প্রকাশের উদ্যোগ। বলা বাহুল্য আলোচ্য সংকলনের বারোজনই চন্দ্রাবতীর পুত্র সন্তান। সংকলনের নামেই প্রকাশ পায় চন্দ্রাবতীর পুত্র-গণের মধ্যে ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আর উত্তরাধিকার ধারণের অঘোষিত অঙ্গিকার সুতরাং ধরেই নিতে পারি এঁদের কবিতায় পাবো ঐতিহ্যের অহংকার আর নিজস্ব কাব্য ভাষা নির্মাণের গৌরব। বাংলা কবিতার যে বিস্তর পথ পরিক্রমণ তার একেবারে শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন বারোজন তরুণ কবিতা কর্মী। প্রত্যেকের মেধা ও মনন বিশাল কাব্য সম্ভারের দ্যুতি আর স্বতন্ত্র পথ নির্মাণের আকাঙ্ক্ষায় ভাস্বর—এমন বিবেচনাই সংগত।"

—ফরিদ আহমদ দুলাল

চন্দ্রাবতীর কয়েকজন সন্তান

শিমুল মাহমুদ

১

'মহামিলনে যেতে হয় একা, সঙ্গীবিহীন
সংগতিহীন :'

—কবি আশিক আকবর মহামিলনের উত্তেজনায় মাথাটাকে বানালেন টোটাল পৃথিবী। সৃষ্টি করলেন শ্রেষ্ঠ প্রতীক 'শিশু'। শব্দকে বহুমাত্রিক, প্রতীকি অর্থপূর্ণ রেখেও আরো মানবিকী ইঙ্গিত-ধর্মী ব্যঞ্জনার দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছেন তিনি অতীত অভিজ্ঞতাকে সাথে নিলেন পরিমিত নান্দনিক কৌশলে। মিষ্টিক চেতনা তার নান্দনিক কৌশলকে পৌঁছে দেয় অমিমাংসিত প্রকরণের মোহজালে, সীমিত জীবনের স্পর্শযোগ্য সঙ্গি

মুহূর্তে ধাবিত হয় স্পর্শাতীত মহাজাগতিক সঙ্গিতের গভীরে। —'বোল ওঠে বোল। তবলের বোল। নাচ শুরু হয়। নাচ। ভেতরের নাচ। নাচে খাজা। নাচে মোহাম্মদ। অন্ধ গায়ক গায় এ কোন সঙ্গীত। আদিম সঙ্গীত। আহ্! আনন্দের পৃথিবী। প্রণতি। প্রণতি আমার। প্রণতি আরতি আমার সকল বিভূতি।' —সঙ্গীতের পিছে পরে থাকে.—'যাদুর দেশ পদ্মিনী শংখিনী ঝাঁপি মৃত মৃত পাখিদের লাশ বেদের বহর আমতলা জামতলা কলতলা ছায়াহীন শুভ্র নিবাস মড়া মড়া শিশু আঁখিতারা কাচের আলোক কাচঘর......ফুল পাখি নদী নারী সবকিছু মোহর মোহরের আয় আয় লাল পরী নীল পরী ডুবতে ডুবতে আয় তারাদের দেশে যাই' —এই **Dream reality** জাগিয়ে তোলে বিরহ বেদনা, যা পার্থিব চেতনাকে তীক্ষ্ণ কষ্টবোধের মুখোমুখিতে নিয়ে এসে জীবন জিজ্ঞাসায় আছড়ে ফেলে, এখানেই আশিক আকবরের কাব্য মেধার সুপ্ত অহং।—'এতো ডাকাডাকি ডাকাডাকি সাতটি পাখি সাতটি পাখি একটি পাখি একটি পাখি একা একা উড়ে বেড়ায় উড়ে বেড়ায় উড়ে উড়ে পাখিটাকেই খুঁজে ফিরে খুঁজে ফিরে পাখিটাকেই পাখিটাকেই।' —ফলে বোধের বিদ্যুৎ,—'একই আমি শতবার শতজন হয়ে আসি তোমার কাছাকাছি।'—বস্তুর ভিতর প্রোথিত চেতনার প্রজ্ঞাগত উন্মেষ ঘটে যায় মানব চরিত্রের রহস্য ভেদের মধ্য দিয়ে আশিকের কাব্যে এমনই নির্লিপ্ত নিরাভরণ স্বীকারোক্তি-র মধ্য দিয়ে। ফলে অহং-এর পাশাপাশি জন্ম নেয় দ্বিধা সংকোচ ভয়। শববাহকের গুটির মত ভয়। আর তখনই জন্ম নেয় ব্যক্তি সত্তার দ্রোহ। এই দ্রোহ মানব দেহের জন্য। এই দ্রোহ নারী দেহ কিম্বা পুরুষ দেহকে অতিক্রমের দ্রোহ।

কবি আশিক আকবরের জন্ম আটষট্টির জানুয়ারীতে। অথচ তার রক্তে ইতিমধ্যেই গজিয়ে উঠেছে সৃষ্টি রহস্য, অধিবিদ্যা আর ঐতিহ্য চেতনা, যা একজন শিল্পীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই সম্পদ আবেগে বিভ্রান্ত হয়, অপচয়ে হয়ে উঠে আত্মঘাতী। ফলে আশিক-এর কবি সত্তার চূড়ান্ত অহং-এর পাশাপাশি পাওয়া যায় বিপর্যস্ত কবিকণ্ঠ। আর স্বাভাবিক কারণেই সমসাময়িক বাস্তব আবহ কিছু কিছু কবিতাকে মহৎ শিল্প হয়ে উঠতে দেয়নি। যেমন 'উপদেশ' কবিতাটি পুনরুক্তির মোহজালে ব্যর্থ। অথচ এই

'পুনরুক্তি'—বিষয়টি শ্রেষ্ঠ কাব্য প্রকরণে উদ্ভাসিত হয়েছে 'বিরহ বেদনা' অথবা 'মোহর' কবিতার শরীরে। 'অন্তরক্ত আলাপ' কবিতাটির বিষয়বস্তু এই সভ্যতার বিবর্তনের ধারার মানব প্রজাতির সত্তাগত পরিবর্তনকে সূচিত করে। মানব প্রজাতি সত্তাগত চেতনায় নর অথবা নারী—এই দুই পর্যায়ে চিহ্নিত হতে পারে না যদিও কাঠামোগত পার্থক্য থাকবে—তথাপি একই বস্তু সত্তার দুটি রূপ থাকতে পারে কিন্তু সত্তা অভিন্ন। আশিকের এক্ষেত্রে কাব্য দর্শন ভয়ানক যা মানব প্রজাতির সভ্যতাগত বিকাশের সাথে সম্পৃক্ত অথচ কাব্য শরীর নির্মাণে হেয়ালী কথোপোকথনের আশ্রয়ে তা শেষ পর্যন্ত মহৎ শিল্পকর্ম হতে বঞ্চিত হয়েছে। এ জন্য এই মেধাবী কবির শব্দশিল্প সাধনার বিশুদ্ধতা আবশ্যক। নতুবা ইশ্‌কের আগুন কবিকে এমন নিভিয়ে দিবেন যে পা পর্যন্ত প্রস্তুত নয় এক কদম সামনে বা পিছনে যেতে।

চন্দ্রাবতীর সন্তান আশিক আকবর-এর কবিতা পাঠে কবিকে বন্ধুজ্ঞানে বলছি, বিষয়বস্তুর ধরণের সাথে শিল্প প্রকৃতির গূঢ় আত্মিয়তা। আপনি যেসব লোকজ উপাদান নিয়ে কাজ করছেন তা যতটা ভেতর থেকে এসেছে তার চেয়ে বাইরের জগত থেকে এসেছে বেশী। অর্থাৎ এগুলি ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতাজাত। অবয়বধর্মী বাস্তববাদী শিল্প এগুলি। এতে অন্যান্য শিল্প প্রকৃতির ধারাও মেশানো যায়। তবে তা খুব সতর্ক ও যথার্থভাবে প্রয়োগ করতে হবে। চাপিয়ে দিলে চলবে না। তা স্বতঃস্ফুর্তভাবে চেতনার আলোকেই করতে হবে। হুইসলারের মতই চেতনার মাধ্যমে রঙ, ছবি দিতে হবে। তবে কোন ছকবাধা বাধ্যবাধকতা নেই। কামরুল হাসানের ফোক আর্টগুলিকে দেখা যেতে পারে। কিভাবে তিনি পাশ্চাত্যরীতি মিশিয়ে আধুনিক ঢঙে তুলে ধরেছেন আমাদের লোকজ ঐতিহ্যকে সমুন্নত রেখেও। তবে এসব ক্ষেত্রে ভাসাভাসা জ্ঞান থাকলে শিল্প ব্যর্থ হয়ে যাবে। রীতিমত পরীক্ষা নিরীক্ষা বা গবেষণা করতে হবে নিজের বোধ, স্বজ্ঞা ও কল্পনা শক্তির আলোকে। ফোক শিল্প নিয়ে এই নগর সভ্যতায় কাজ করা খুবই ভয়ানক ও কঠিন। যে পথে অগ্রসর হবার মেধা কবি আশিক আকবরের আছে বলে আমার বিশ্বাস। আমি তাকে অগ্রসর হবার জন্য আন্তরিক আহবান জানাচ্ছি।

'শিশুমৃত্যু প্রকৃতির গুরুতর অপরাধ'

—এই অপরাধবোধকে বুকে ধারণ করে কবি আশরাফ রোকন কাব্য দর্শন-এর সন্ধানে গালিব-এর মুখোমুখি হলেন। যে গালিব মৃত্যুকে শিখিয়েছিলেন নতজানু হতে। কবি আশরাফ রোকন-এর কবি সত্তার অন্তরগত স্রোতে গোপনে মিশে গেল, জলের আবেগের অনুভূতি, মাছের গল্প, সমৃদ্ধ নদীর মুগ্ধতা, ভৈরব সেতুতে মেঘনার ফেরিঘাট ফলে এরা সকলেই বাস্তবলোক হতে, বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার চিত্র হয়ে কবি সত্তার অলৌকিক রহস্যঘন প্রতীক হিসাবে রূপান্তরিত হয়ে নস্টালজিক চেতনার আবহে কাব্যকে পৌঁছে দিল অনিবার্য এক বক্তব্যের কাব্য আদর্শে। যে বক্তব্যকে উদ্ধার করতে সমুদ্র মন্থন আবশ্যক। অথচ এই মানব দেহ ধারণে রহস্যের অবসান নেই। ফলে রোকন চিৎকার করে ওঠেন, যা উপনিষদের সাথে তুল্য ঃ

নির্মিতির এ পর্যায়ে কাঠ কয়লা সেবন। চোখে ও নোখে আগুন
বোনেরা দীপ নিবিয়ে স্বপ্ন মদিরা পান শেষে স্বর্গবাসনায়।

(—মৃত্যুচিত্র)

I feed the holy fire with pieces of wood
May both the world be mine,
When I have them both,
I shall cross over death.

(—উপনিষদ ঃ অধ্যায় ৫০)

অথচ—

ক) আমার প্রাণ ভেসে যায় দুবলার চরে।
খ) অধোঃমুখে কেটে গেলো ভর সন্ধ্যে বেলা।
গ) আমার প্রিয়তম মাছঘর তোমাকে ভুলবো না।
ঘ) নৌকোর সারেঙ-এর মতো সুন্দর
সেঁটে থাকুক মধ্যবিত্তের মাটির দেয়ালে।

সর্বক্ষেত্রেই কবি আশরাফ রোকন-এর কবি সত্তা আধুনিক আবহরের মত অস্থির নয়। বরং ধীর সমাহিত শান্ত সৌম্যে আবেগ তাড়িত। আর এই জাতীয় আবেগের অনুরণন উৎকৃষ্ট কাব্যের সহায়ক।

তবে আবেগই কাব্যের চূড়ান্ত নান্দনিক বিকাশ নয়। আবেগ অবশ্যই স্বতঃস্ফূর্ততার আলোকে নির্মাণে রূপান্তরিত হবে। যেমনটি হয়ে উঠতে পারেনি রোকনের 'স্মৃতি বিষয়ক' অথবা 'হাঁটার গল্প' কবিতার মধ্যে। স্মৃতি বিষয়ক কবিতাটি একটি বিবৃতি ধর্মী সরল কবিতা। যাকে কবিতা হয়ে উঠবার জন্য যথেষ্ঠ সময় দেয়া হয়নি। বরং আবেগ কবির মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে যে ভাষার জন্ম দিয়েছে সে ভাষাকেই কবিতা হিসাবে রোকন এক্ষেত্রে উপস্থাপিত করেছেন। আর রোকনের এই আবেগ অনিবার্য। অনিবার্য কেননা এই আবেগ যুগ যুগান্তরের স্মৃতি তাড়িত আবেগ, যা মহৎ কাব্যের সত্তা। কিন্তু এই মহৎ আবেগকে রোকন আত্মঘাতী কাব্য-শক্তিতে পর্যবসিত করেছেন। এর জন্য রোকনের কবিআত্মার শাস্তি হওয়া উচিত। অথচ একই অনুসঙ্গের ক্ষেত্রে 'জেলে' কবিতায় রোকন উৎরে গিয়েছেন দক্ষ প্রজ্ঞানির্ভর কাব্য মেধার আলোকে। এক্ষেত্রে রোকনের যে ভয়ানক সফলতা তা হলো, 'জেলে' কবিতা-টিতে রোকন ঐতিহ্যের আধুনিকীকরণে আবেগ ও অভিজ্ঞতার সূক্ষ্ম মিশ্রনের মধ্য দিয়ে কাব্যের বিকাশ ঘটিয়েছেন, যে বিকাশ রোকনের সমৃদ্ধ নদীর মতই আমাকেও মুগ্ধ করেছে এবং আমারও 'সমস্ত আন্তরিকতা কংশ নদের জন্য।'—কাব্যের সাথে পাঠকের এমন সমন্বয় কাব্য গুণের একটি চমৎকার লক্ষণ অবশ্যই।

রোকন কখনো কখনো গল্প বুনতে ভালোবাসেন। তবে সে বুনন হঠাৎ করেই হালকা চালে হাঁটে। যেমনটি ঘটেছে সুখী শহরের গল্পের ক্ষেত্রে। অথচ এই গল্প 'বালিহাঁস হয়ে উড়ায় মূর্খ ব্যর্থতা সকল'—এর মধ্যে এসে শিল্প সফল হয়েও আবার ট্রেন আসার এক যন্ত্রণাকাতর অপেক্ষার মতই সফলতার প্রহর গুণে চলেছে। আর প্রহরে প্রহরে ঃ

> ভৈরব সেতুতে বৃষ্টি, আহ্ দক্ষিণা দেশের রাজকুমারী
> পরিয়ে কি দিলো ভৈরব সেতুর গলায় হীরক মালা।

রোকনের এই মাল্যদান কতটা কৃত্রিম অথবা কতটা আন্তরিক? রোকন কি কিছু প্রাকসিদ্ধ রীতি, স্বতঃসিদ্ধ মোটিফ নিয়ে কাজ করেছেন? একটা ধারাবাহিক শৃঙ্খলার মধ্যে অনুভবকে নিয়ে কাজ করে চলেছেন রোকন? যা কাব্য শরীরকে চাকচিক্য দান

করে। কখনো কখনো বৈভবও দান করে। 'অমিল' অথবা 'মেয়েটার হাত' কবিতাতে যে লাইটিং এসেছে তাতে করে কি কবিতা বহুমাত্রিকতা লাভ করেছে? কবিতা দুটো কি ন্যারেটিভ কবিতা নয়? বিচ্ছিন্ন কাহিনী বুনন-এর আড়ালে কাজ করেছে অপরিণত আবেগ। অবশ্য এর মধ্য দিয়েই রোকন বিভিন্ন ম্যাসেজ দিচ্ছেন। তবুও শেষ পর্যন্তকবিতার ইস্পাত প্রত্যয়ী নান্দনিক ইমেজ পুরোপুরি রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। তবে এক্ষেত্রে রোকনের ব্যর্থতা বলব না বলবো বিজয়ের প্রথম ধাপ। এই কারণে বিজয়, রোকন কবি হিসাবে নিজের কাব্য সত্তাকে প্রতারিত করেন না। ফলে নিরাভরণ সত্য ভাষণ তার কবিতায় অবলীলায় চিত্রিত হয়, যা হয়ে উঠতে পারে শেষ পর্যন্ত মহৎ শিল্প। এ জন্য আমার কবি বন্ধুকে অতিক্রম করতে হবে আরো দীর্ঘ পথ। অবশ্যই করতে হবে কাব্য প্রবজ্যায় চিরন্তন সন্তরণ।

৩

আকাশ ভাসানো চাঁদের রাত
এবং
ঘাটে বাঁধা একলা নাও বাতাসে দোলে

আমার মনে হয় কোন বিষয়-এর স্বরূপ উন্মোচনের অনিবার্য আকাঙ্ক্ষা না থাকলে লেখা উচিত নয়। তদ্রুপ কাব্য সত্তার স্বরূপ উন্মোচনে নির্মোহ থাকা জরুরী। এক্ষেত্রে কবি সত্তা এবং কাব্য সত্তার সীমাবদ্ধতাগুলি চিহ্নিত করাই নন্দনতত্ত্বে মঙ্গল জনক। এতে করে কাব্য মেজাজ পরিস্রুত হয়ে উঠবার অবকাশ পায়। এবং কাব্য মেজাজ অর্জন করে সম্মোহন ক্ষমতা। প্রথম অবস্থায় এই সম্মোহন মন্ত্রে মাসুম মোকাররম-এর 'দৃশ্যান্তর'-এ প্রবেশ করে ট্রেনের কামরায় চেপে বসলাম। উপস্থাপনার নতুনত্বে কেঁপে উঠতে গিয়ে হোঁচট্ খেলাম। অথচ ক্যানভাসটি আরো দিগন্ত-ব্যাপী তার ডানা মেলে দিতে পারতো। তেমনি 'ক্লিনিক্যাল টেস্ট' অথবা 'স্বপক্ষ কীর্তন'-এ অযথা কবিতার সুরকে টেনে টুনে লম্বা করতে হলো। কবিতা খুব বিজ্ঞান সম্মত, জ্যামিতিক মাপ জোখের ব্যাপার। অথচ এসবে আমরা সমসাময়িকরা গুরুত্ব দেই না শুধুই নির্ভরশীল হয়ে উঠি বাউল স্বভাবের মোহজালে।

মনে করা যাক, হাজারো অনুভূতি আমাকে ঘিরে আছে, আমি কাতর হয়ে পড়েছি, কেঁপে কেঁপে উঠতে শুরু করেছি প্রকাশ যন্ত্রণায়, চোখ মুখ দুলে উঠছে অথচ নির্বাচিত হচ্ছে না যথার্থ শব্দ। ফলে প্রপঞ্চগুলিকেই দিশেহারা হয়ে শিল্পোত্তীর্ণ না করেই কবিতায় ঠাঁই দিয়ে ফেললাম। আমরা বাস্তবকেই কবিতায় ঠাঁই দেই। তবুও বাস্তব ও শিল্প এক নয়। সব কিছু শিল্পোত্তীর্ণ হয় না। হলেও তা স্বার্থক হয় না। চারিপার্শ্বের অনেক বিষয়, ঘটনাই কাব্যিক নয়, গদ্যময়। যেমন রাজনৈতিক ঘটনা। একে শিল্পোত্তীর্ণ করা অসম্ভব নয় তবে নিঃসন্দেহে কাজটি কঠিন ও বিপদ জনক। যেমন মাসুম মোকাররম-এর কাসার বাটির টুং টাং শব্দ শুধুমাত্র বিপদজনক শব্দই জাগিয়ে তোলে অতীন্দ্রিয় সুরের অভিব্যক্তিতে পরিপূর্ণ নয়। অথচ ক্লিনিক্যাল টেস্ট বিপদজনক সীমানা অতিক্রম করতে করতে শেষ পর্যন্ত শিল্পের নান্দনিক পাখায় ভর করে উড়ে গেল—'একাদশী চাঁদের ভিতর।'-- অথবা—'মনে হয় খোঁয়ারী প্রহরে গত জনমে সে কী তবে আমার বোন ছিলো'—নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। অথবা হাদিউল ইসলাম-এর 'পা ফেললে যদি গন্তব্যেই নিয়ে যাবে পথ, আমি স্বজনের কাছে যাবো'। যা উৎকৃষ্ট কাব্য সৌন্দর্যের অর্থবহ অবগাহন।

কিন্তু উল্লেখিত উভয় কবির ক্ষেত্রেই কষ্টার্জিত আরোপিত শব্দ মোহজাল-এর বিভ্রান্তকর মায়ামরিচিকার জগত লক্ষ্যযোগ্য। মাসুম-এর 'চিঠি ছাড়বো তার কাছে' কবিতার শেষ তিন লাইনই কবিতা। 'আরো একদিন আকাশ ভাসানো চাঁদের রাতে/তার কথা মনে পড়বে এবং নদীর কাছাকাছি/কোন চিঠির বাক্স থেকে তার নামে চিঠি ছাড়বো'—এই শেষ তিনটি চরণ বাদ দিলে বাদবাকি শব্দের চাকচিক্য কসরত মাত্র। 'ক্যাভী ক্যাভী মেরা দিলমে'—কি শেষ পর্যন্ত দিলে আঘাত করতে পেরেছে? দিলের অলৌকিক সৌন্দর্যকে ছুঁয়ে দিতে পেরেছে? তার 'গুডবাই' কবিতার মত কাব্য রহস্যকে এই ক্যাভী ক্যাভী দিল গুডবাই জানিয়েছে। ফলে কবি বারবার আত্মরতির চোরাবালিতে নিমজ্জিত হন। নিমজ্জিত হন হাদিউল ইসলাম,—'বাতাস চুরুট খায় আমার আঙুলে'-এর মধ্য দিয়ে। অথচ শ্রেষ্ঠ চরণটি ঠিক এই চরণের পূর্বেই সৃষ্টি হয়ে গেছে,—'ঘাটে বাঁধা একলা নাও বাতাসে দোলে'—বিষন্নতার এই প্রান্ত ছুঁয়ে দেয়া

কম্পনকে হাদিউল ধৈর্যের সাথে দৃশ্যান্তর হতে মৌন গম্ভীর সূর্য রশ্মিতে স্নান করাবার অপেক্ষা রাখেনি। কিন্তু ‘কোনো কোনো উৎসমূল’—এ এসে হাদিউল-এর নস্টালজিয়া জীবনের গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতার সাথে মিথস্ক্রিয়ায় মিথস্ক্রিয়ায় চেনা ঐতিহ্যের সুঘ্রাণ ছড়িয়ে দেয়ঃ

বৎসরের শেষ শুক্রবার নদী তুমি এতো বেশি মনে পড়ো
যেন আকাঙ্ক্ষার উৎসমূল, এই আমি এতো বেশী বন্দী

অথবা

তার ঠোঁটে মেখে দেবো সরিষার ফুল
তার ঠোঁটে মেখে দেবো চরজাগা নদীর তৃষ্ণা।

এই চরজাগা নদীর তৃষ্ণার মত ভয়ানক কাব্য সম্ভাবনা প্রোথিত আছে এই কবির প্রজ্ঞার গভীরে। তাকে এখন থিতিয়ে নিতে সময় দিতে হবে, তারপর তাকে তুলে আনতে হবে নিখুঁত মানচিত্রের মত। যে মানচিত্র সর্বকালের সর্বমানবের তৃষ্ণা মেটাবে তার ক্ল্যাসিক দ্রাক্ষারসে।

৪

আদি পিতার কথা মনে পড়ে যায়
আর
কামফুল ফুটবে দেখো আঁধার এলেই
এবং
সানুগ্রহে আরেকটু ধৈর্য ধরুণ

উল্লেখিত চরণ তিনটি তিনজন কবির। প্রথমটি মামুন মাহবুব-এর, দ্বিতীয়টির কবি শামীম পারভেজ এবং শেষ রচনাটির রচয়িতা মশিউর রহমান। আমি কাব্য আবহের মধ্যে কাব্য-মাত্রা-কোলাজ নির্মাণে দুটি যোগবোধক অব্যয় ‘আর’, ‘এবং’ যোগ করেছি মাত্র। তিনজন কবির জন্মই স্বাধীনতার মধ্যে অথবা পরে। তবে কবির দৈহিক বয়স বিবেচ্য নয়। বিবেচ্য তার প্রজ্ঞার বয়স। প্রজ্ঞার পবিত্র অভিজ্ঞতার বয়স। যেমন মামুন মাহবুব-এর—

তারপর উপরে উঠলো
উপরে উঠতে উঠতে আকাশ বালারা পেলো মেঘের সাঁকো

অথবা শামীম পারভেজ-এর 'পরকীয়া'-র—'আয়ান ঘোষের চোখে ঈশ্বর ঘুমায়'—অথবা মশিউর রহমান খান-এর 'যযাতির গল্প'-তে —'অর্ধ হলুদ বোবা পাতার কি যে কষ্ট আহা!'—এই অর্ধ হলুদ বোবা পাতার কষ্ট যিনি উপলব্ধি করেন তিনি ঈশ্বরের বোবা কষ্টের স্বরূপকে স্পর্শ করতে পারেন বৈকি। অথবা মশিউর-এর—'বৃক্ষেরা বন্ধ্যা অসুখে ভোগে/তবু শীতের বিরুদ্ধে অভিযোগ নেই কারো।' —কিন্তু ব্রাত্যজনঃ কালযাপন কি নির্মিতির কালযাপন। এই নির্মিতি কি কৃত্রিম না আন্তরিক? এক্ষেত্রে আসতে পারতো গভীর মানবিক সম্পর্ক। যেমনটি পাওয়া যায়,—'শহরে মসজিদে শেষ-রাতের আযান, যখন পৃথিবী ঘুমায়; শহরটা তখন খুব নীরবে একা একা কেঁদে কেঁদে ভোর হয়।'—এখানে কবি অবশ্যই আনুষঙ্গিক চেতনা স্রোতকে তুলে আনতে পেরেছেন। অথচ 'কাল সারারাত শীতের সকাল'-এ কবি শামীম পারভেজ তা করতে ব্যর্থ হয়েছেন অনেকটা। আবার অনেকটা বাঙলা কবিতার মতো লিখতে গিয়ে মশিউরকে কলম ধরা উচিত হয়নি। এখানে অন্যবিধ টানাপোড়েন আসতে পারতো, যা কাব্যের বুকে রক্ত ঝরায়, কাব্য রক্ত ঝরার গানে পরিশ্রুত মর্যাদা লাভ করে। মামুন মাহবুব 'নারী ও পৌরাণিক বিশ্লেষণ' সৃষ্টি নয় বরং নির্মাণ করেছেন। তিনি ফোক ইতিহাস ও মিথ-এর বিস্ময়কর সংশ্লেষণ ক্ষমতার বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারতেন। চেক ফোক খুব উন্নত। অথবা স্পেনিশ ফোক দেখা যেতে পারে। অনুভূতির সরাসরি অনুবাদ কবিতা নয়। এর সাথে যোগ হবে প্রতিবেশ, যে প্রতিবেশ এর মধ্যে দুলে উঠবে অনিবার্য জীবন্ত চিত্রকল্প, আর এই চিত্রকল্পগুলি যে কথা বলে তা আমাদের নিয়ে যাবে অতি বাস্তবের সত্যালোকে, যাকে অভিজ্ঞতা দিয়ে স্পর্শ করা যায় না, স্পর্শ করা যায় প্রজ্ঞা দিয়ে। আমাদের পরিবেশ ও ঐতিহ্যে এমন শিল্প সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। নদীর তীরে আমাদের বাস। রক্তে মাংসে মাটি ও জলের গন্ধ লেগে আছে। এ জাতীয় কাজ করতে গিয়ে যেন কবি মুজিব মেহেদীর আত্মা পুড়ে যায়ঃ

কাঁধে এসে ভর করো হিম শৈল চূড়া
বুকে যে পাথর আছে আত্মার ফসিল
তারে শক্তি দাও
            তোমার অতলে আছে

....

পাখির আকুল করা গানে
খুলে যাক দপাদপ বুকের কপাট

এই দপাদপ বুকের কপাট খুলে গেলে আমরা আনন্দে চিৎকার করে উঠি, পাগল হয়ে উঠি, কেঁদে উঠি ভয়ানক তৃষ্ণা নিয়ে বুকে। আমাদের অস্তিত্বে, হৃদয়ে যেন টান পড়ে। কি করে নিজ হাতে স্বজনের কবর খুঁড়ি? কি করে অরুন্তুদ কাহিনী কেমন করে লিখি। অথচ এই কাহিনী লিখতে লিখতে কবি স্বাধীন চৌধুরী পাপে নিমজ্জিত ঃ

পুণ্যকে স্পর্শ করে জানলাম ঃ করেছি তো পাপ

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই কাহিনী বিবৃতিতে পর্যবসিত হলো। হয়তো স্বাধীনকে আরো খানিকটা সাধক হতে হতো।

আমরা পূর্ণতার সন্ধান করছি। সার্বক্ষণিক এ সাধনায় আমাদের আত্মা সাড়া দিক। আমাদের সত্যিকারের বিশুদ্ধ শিল্প হল আত্মার শুদ্ধতা। এই শুদ্ধতা অনিন্দ্য জসীম-এর,—'আমার ভালবাসা—শিমুলের রাজহাঁস বুকে সবিনয় চুম্বন।'—এই রাজহাঁস-এর অনুসঙ্গের মধ্য দিয়ে অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার তাবৎ তাৎপর্য স্পর্শে স্পর্শে নোতুন অর্থমাত্রা সৃষ্টি করেছে। সবিনয় অবলম্বন রাজহাঁস আমার সমগ্র জীবন। অথবা—'প্রাইমারি শিশুদের নামে আমি কি উইল করে যাবো আমার চেতনা বিকাশ।' এই চেতনার বিকাশ স্পর্শ করতে খুব অল্প কবি সত্তাই অতলের গভীরে প্রবেশ করেছেন। ফলে অনেক বড় কবিরাও আসল আত্মাটিকে ধ্যান করে দেখেননি। অনেকে দূর থেকে গন্ধ নিয়েছেন মাত্র। রবীন্দ্রনাথ প্রথম আত্মার স্পর্শে শিহরিত হয়েছিলেন বৈষ্ণব দর্শনে, বাউল গানে, আমাদের ফোক ঐতিহ্যে। যা সমসাময়িক কবিদের কবি সত্তায় পাওয়া যায় না। মামুন মোয়াজ্জেম আন্তরিক চেষ্টা করেছেন,—

ত্রয়োদশী চাঁদ এখন ভেঙে ভেঙে ধরেনা সে জল
কষ্টের কাঁকর জমে ভারী হয় বুকের উঠোন।

অথচ প্রগাঢ় প্রজ্ঞার পাশাপাশি 'জেগে ওঠে বাংলাদেশ'-এই ছেলেমানসী ও গতানুগতিক কাব্য কাঠামো দুঃখজনক। এক্ষেত্রে কষ্ট-যন্ত্রণাকে বুকে বেঁধে নির্মম সন্ন্যাসীর মত আবেগ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে

রাখতে হবে। মামুন-এর লেখার নির্মম সমালোচক মামুনকেই হতে হবে। বিপদজনক আবেগ যা শিল্পের ক্ষতি করে তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হবে। আবেগ শিল্পীকে শিল্প সৃষ্টিতে প্ররোচিত করে। কিন্তু প্রকৃত শিল্পে সেই আবেগের কোন কলুষ চিহ্ন পড়ে না। শিল্পের মন্দির সৃষ্টি হয়ে গেলে আবেগ আর তরল থাকে না, তা ঘনীভূত হয়ে মূল্যবান স্ফটিকে রূপ লাভ করে। এই বিষয়টি না বুঝলে কবিকে কবিতার প্রকরণগত সংগঠন থেকে বিচ্যুত হতে হয়। এতে টোটাল আর্ট সৃষ্টি হয় না। এ সমস্যা অনেক বড় কবির ক্ষেত্রেও ঘটে। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতায় এমনটি হয়েছে, তবে তিনি তা শিল্পের অপরাপর শক্তি দিয়ে পুষিয়ে দিয়েছেন। স্বচ্ছ চিন্তা, গভীর প্রজ্ঞা, শুদ্ধ আত্মার স্পর্শে কবিতা ভাষিক পরিপক্কতা লাভ করতে পারে অনেকটা।

কবি শতাব্দী কাদের আত্মার পরিশুদ্ধতায় স্বর্ণলতার ঝোপে নিজেকে উদোম করে দেখতে চান পুরুষ চড়ুই-এর অন্তর আত্মার মাঝে। আর তখনই সন্দেহ দোল খায়, কবির এই সন্দেহের প্রশ্ন শস্যহীন পৃথিবীর কাছে।

শতাব্দী কাদের-এর কবিতার ঢঙে রয়েছে এক প্রকার গল্প বলার কৌশল। এই আঙ্গিকগত গুণধর্ম ওর কবিতাকে করে তুলেছে ঋজু আবার কখনো কখনো শিথিল। তবে তা অবশ্যই গল্পের রেশ ধরে। আর এই গল্প অত্যন্ত স্পর্শকাতর ঃ

ক) তুমি কি এতোটা পথ একা হেঁটে এখানে এসেছো ?

খ) আজ আসি, আগামীতে দেখা হলে আরো কিছু ব্যক্তিগত কথা টথা হবে।

কবির কৈশোর ফিরিস্তি কবিতাগুলির বিষয়বস্তু নস্টালজিক চেতনায় লঘু লয়ে এগুলেও ভেতরে ভেতরে একটা অস্পষ্ট অর্থ দ্যোতনা সুর বুনে চলে ; ফলে—'অস্থির ডানারা তাই সাঁতরায় আগুনে.........নরকে ....।'—এই কৈশোরই একদিন 'দৃশ্যাবলীর ডানা' হয়ে ভেসে ওঠে নদীতে ঃ

নদীর সিথানে বসে ঝিমোয় শালিক...
চোখে জল, জলের ভিতরে এক অস্থির আকাশ,
কুমারী ঢেউয়ের স্তন সারি সারি রূপোলি ঝালর

এই কুমারী ঢেউয়ের স্তন-এর দৃশ্যের মধ্যে উন্মোচিত হলো কবির কাব্যিক দৃষ্টি, মনিষা ও প্রেম। কতটা শুদ্ধতায়, কতটা অভিজ্ঞতার নিকষিত রূপান্তর এই কাব্যমেধা! যা নোতুন কাব্য মাত্রা সংযোজন করে। একজন কবিকে দীর্ঘ রক্তাক্ত পথ পাড়ি দিয়ে এই কাব্য-মাত্রা-মনিষায় অবগাহন করতে হয়। মানুষের জীবনের গভীরতা থেকে উঠে আসে সত্যোচ্চারণ। যে উচ্চারণকে শিল্পে রূপ দিতে হলে প্রয়োজন আত্মার মহৎ সাধনার আলো আর প্রতিভার উত্তাপ। শিল্পের অনেকটাই অদৃশ্য, রহস্য, অসীম জগতের প্রতীকায়ন। ইন্দ্রিয়জ ভাষা কেবল একে প্রতীকায়িত করতে পারে উপমা, রূপক, বাক প্রতিমায়। অথচ পুরাপুরি ব্যাখ্যাযোগ্য নয় এর অর্থের ব্যঞ্জনা। মহৎ শিল্পকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রেও অথবা সমালোচনা অথবা বিশ্লেষণে নিয়ে আসবার জন্যও প্রয়োজন যথাপোযুক্ত প্রতীক, যা ইঙ্গিতধর্মী অর্থ সৃষ্টি করে থাকে। এক্ষেত্রে শিল্পের এই অদৃশ্য সৌন্দর্যকে স্পর্শ করার জন্য কেতাবী জ্ঞান অনেকটাই অর্থহীন। তৃতীয় নয়নের দরকার বৃদ্ধ টিরোসিয়াসের মত অনেকটা।

আমরা সমসাময়িকতা, বর্তমান অনুষঙ্গ নিয়ে আজ যে প্রাণান্তকর কসরৎ করছি এসবই একদিন পুরনো হয়ে বাতিল হয়ে যাবে। অথচ সমসাময়িকতার নিরিখে এসব উপাদানও জরুরী। প্রকৃত কবিকে কবিতার শ্বাসত উপাদান ও ক্ষণস্থায়ী সমসাময়িক উপযোগী উপাদানের পার্থক্য বুঝতে হবে। এ দুয়ের সমন্বয় করতে হবে। কোন মহৎ কবিতার সবটুকু কালের বিচারে বাঁচেনা। কাল দাঁত বসায় না এমন কোন শিল্প নেই। তবু কালের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে এমন সব উপাদান থাকে যা শিল্পীকে অনুসন্ধান করতে হয়। আমার মনে হয় এক্ষেত্রে শ্বাসত উপাদান যা কবিতাকে মহৎ করে তা ইন্দ্রিয়জ ভাষায় খানিকটা ইঙ্গিত দেয়া যায় কিন্তু ব্যাখ্যা করে স্পষ্ট করা যায় না। কেননা প্রকাশযোগ্য যে বিষয় কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে তা বিকল্প কোন ভাষা অথবা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। অথবা এমনভাবে বলা সম্ভব শিল্পীই একমাত্র তাঁর শিল্পের মাধ্যমে তা প্রকাশ করেন এবং যেহেতু প্রকাশযোগ্য বিষয়টি একমাত্র শিল্পেই নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব সেহেতু দ্বিতীয় কোন ভাষা এক্ষেত্রে অক্ষম। শিল্পের এ পর্যায়ে এসে সমালোচনার সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত হতে পারে।

সময়ের বিচারে নীতি, সত্য, সৌন্দর্যও বদলায় তবে এদের রূপগত কাঠামো বদলায় না। যা বদলায় তা শুধু আধেয়। এগুলি গাণিতিক ও যৌক্তিক কাঠামোকে মেনে চলার মতই। আইনস্টাইন কাল ও স্থানের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে পারেন, নিউটন পদার্থ বিজ্ঞানে অতীতকে ভেঙে চুরে ফেলতে পারেন। কিন্তু সবই কার্যকরণ ও যুক্তির অধীন। ফলে আইনস্টাইনকেও বলতে হয়েছে, 'ঈশ্বর জগতকে নিয়ে পাশা খেলেন না'। বাংলা সাহিত্যে এই ডিসিপ্লিনকে রবীন্দ্রনাথ আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন। ফলে রবীন্দ্রনাথ কখনও পুরাতন হয়ে ওঠেন না। একটা চক্রালম্বী বিশাল পর্বতের মত তিনি দাঁড়িয়ে। রবীন্দ্রনাথই একজনমাত্র বাংলা সাহিত্যে যিনি জীবনভর কষ্ট করে নিরবিচ্ছিন্ন সাধনা করে শিল্পের সত্যকে ধারণ করেছিলেন। তিনি সত্যকে ক্রমাগত স্পর্শ করেছেন। হোক না তা হেগেলীয় আংশিক সত্য। তবুও নন্দনতত্ত্বে তিনি দিব্যদর্শী। চর্যাপদ অথবা বৈষ্ণব পদাবলীর মত এই দিব্যজ্ঞানই হলো স্বরস্বতীর গুপ্ত রহস্য। যা ধারণ করার জন্য চাই গৌতম বুদ্ধের অহম ও সাধনালব্ধ জীবন প্রণালী।

আলোচ্য বারোজন চন্দ্রাবতীর কাব্য পাঠে প্রায়শঃ আমি কষ্ট পেয়েছি এই সাধনার হেয়ালীপনা দেখে। শব্দ নিয়ে খেলতে খেলতে আত্মার কণ্ঠস্বরকে কবিগণ পাশ কাটিয়ে গিয়ে নিজেদের প্রতারণা করেছেন। ফলে আত্ম প্রতারণার বিপরীতে জন্ম নিয়েছে ইগো, ইগো থেকে প্রচারমুখি মুখরতা, যা কাব্যের ধ্যান মগ্ন জগতকে মুহূর্তে রমণী রক্তের মত উষ্কে দিয়ে উদ্দেশ্যহীনতায় পর্যবসিত করে। তবে উল্লেখিত গ্রন্থপাঠে আমার ভেতর কাব্য-মাত্রা-গুণই আলোড়ন তুলেছে বেশী। ফলে ধ্যানমগ্ন কালোত্তীর্ণ শিল্পালোকের আকাঙ্ক্ষা আমার জেগেছে এবং দাবী তুলেছি এই শিল্পের এই দিকটির। আগামীতে চন্দ্রাবতীর সন্তানদের কাব্যে অবশ্যই এমনটি ঘটে যাবে। কেননা আমাদের জ্ঞান সসীম কিন্তু শিল্পের জ্ঞান অসীম। আসলে মহৎ শিল্পের গোপন ভাণ্ডার, কৃৎকৌশল সেখানেই, সেই মহৎ দর্শনের আড়ালে।

পরিশিষ্ট

চন্দ্রাবতীর সন্তানগণের সাম্প্রতিক কালের কবিতা

আশিক আকবর

বয়েত

১

ভালোবেসে গঙ্গায় দিয়েছি ফুল
যমুনায় কেটেছি সাঁতার
ব্রহ্মপুত্রে ঢেলেছি গ্লাস গ্লাস জল
তৃষ্ণা তবু থেকে গেছে আকাশ সমান।

২

স্নান
শেষ স্নান
প্রাণ বিয়োগের পর স্নান
তুমিই দিয়ে দিও নারী
তোমাকে ছাড়া আমি তো কাউকে দেখিনি।

৩

কী দুঃখে নিজের মূর্তি বানিয়েছি
করেছি পূজা
চোখ হারালে বুঝবে গো রাধেশ্যাম!

৪

চোখে জমেছিলো এক ফোঁটা শিশির
শিশির থেকে এক কণা নিয়ে
তৈরী করেছি সমুদ্র, পাহাড়, পর্বত শৃঙ্গ
এই মাঠ ঘাট লোকালয় গ্রাম—
থেকে গেছে তবু এক ফোঁটা শিশির।

৫

বাতাসে তুমি যে শরাবের খুশবো ছড়িয়ে দিয়েছো
আমি তা পান করেই আপাদমস্তক মাতাল হয়েছি
পানহীন পান করে যে পেয়েছে শরাবের এই স্বাদ
সেই জানে কতো তুচ্ছ ঐ সাকী
কতো তুচ্ছ ঐ প্রাণের শরাব!

৬

মৃত্যু আমাকে তাড়া করছে
তাড়া করছে প্রেম
তবু পাড়ে বসে আছি রাধেহীন শ্যাম!

আশরাফ রোকন

কাহাদের পশু আত্মাগুলি

কাহাদের পশু আত্মাগুলি
ছিড়ে খায় লোভনীয় স্বপ্ন
গোধুলির নিচে ঢাকা
কালো মুখগুলি
লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ে
অন্ধ রাতের কার্নিশ ছুঁয়ে
এক মরুময় চিহ্ন
বিভেদহীন তীরের ঘূর্ণি
বিষের বেদনা
পতন শুনি দূরের—
অবাধ্য রাতের পঙক্তিরা
ব্যর্থ হয়
কোন্ পশু আত্মাগুলি শীৎকার করে?

সমুদ্রের ভাবনা এলে

সমুদ্রের ভাবনা এলে মনে, অরণ্য আমি পূর্ণিমায় চুপচাপ!
তীরবিদ্ধ হাঁসের রক্তিম পাখাটির মতো নিজেকে গুটিয়ে রাখি আর

ভাবি সেই সব প্রকৃতি যা আমাদের নিবিড় সান্নিধ্যে জড়িয়েছিলো ; যা আমাদের গীতল শরৎলগ্নে ছুঁয়েছিলো কলাবতী ফুলের ভঙ্গিতে...

মন্ত্রতাপে আমাদের পুড়ে গিয়েছিলো অন্তরাত্মা, আমি অনন্তের বেশে
তোমার ফর্সা আত্মার খোঁজে পেরিয়ে এলাম ভূলোকের স্বপ্নসীমা,
জলপরিধি, বিজ্ঞানের অথৈ জলে নাইতে নাইতে বোবা হরিণের মতো
সমুদ্রের ভাবনা এলে গভীর মনে, আমিও বনের ভাষা শিখতে আগ্রহী হই ;
আমারও বুকের মধ্যে লবণগন্ধী ঝড় বয়ে যায়, জোছনার ভ্রমর নিয়ে রাত
জেগে
জেগে
জেগে হয়ে পড়ি বুড়োদের শরীরের মতো শীর্ণ আর বিদিশা
হাতের কাছে বিরূপ আয়নাটিরে অন্ধ করে দিই অভিশাপে।

কবিতা বিষয়ে কবিতা

আমাদের এই সব কবিতারা একদিন হাঁটতে শিখবে,
রাতে এসে দরোজায় দাঁড়িয়ে রইবে, গুন্‌গুন্‌ গানের শব্দ মাথায় নিয়ে।
পৃথিবীতে যতো ফুল ফোটে, চাঁদ তারা, সমুদ্র ও হরিণ তাদের
নিজস্ব বোধের পরিখায় নতুন নতুন স্মৃতিচাষে মগ্ন হয়, তেম্নি
এই গানের জগত, কান্না ও হতাশার জগত
নিহত বর্ষায় অথবা ভয়াল যুদ্ধের রাতে   আমাদের কবিতাগুলি
বেহুলার বাসর থেকে পালিয়ে বেড়ানো সুখের খোঁজে
আসবে এই শিল্পের বজ্রনেশায় উড়াতে নিজেরই সবুজ ভঙ্গিমা।
আমাদের এই সব কবিতারা একদিন
নাবালকের বোধ নেবে চুরি করে,
আমাদের এই সব কবিতারা একদিন
অঙ্গীকার করবে লোভী মাছদের, যারা আমাদের হাড়
গিলে খেতে চেয়েছে এবং বার বার তাড়া করেছে
আমাদের কবিতার পিছু পিছু।

রক্তে বন্দী অন্ধের ঘুঙুর। জীবন বাঁধা পাপের শিকলে!
নগ্ন তাপের ভিতর জাগছে বিস্মৃতি। নারী এক কোমল বনের নাম.
যে কেবলি জাগায়, হাসায় আর মৃদু শব্দে
আলাদা করে রাখে স্মিত আবেগ,-ফুল ঝরে, ফুল ঝরে যায়।

পৃথিবীর প্রতি

ঠোঁটে মদের গন্ধ নিয়ে পৃথিবী আর কতো খেলবো ?
চোখ খোলো, দ্যাখো তোমার সামনে ফুল ফোটে
ঝরা পাতার মুকুট নিয়ে অবুঝ বালক এক
পৃথিবী তোমার কোমল তন্দ্রায়
ধনুকের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে র'লো ; আর
তোমার সামনে যে অস্থির রাজ্যপাট তাকে
তছনছ করে যায় লোভী ক্রীড়নক !

পৃথিবী আর ঘুমায়োনা। জাগো, দ্যাখো
তোমার পায়ের উপর রক্ত ঢালে কারা ?

সবুজ মাংস স্পন্দন

রাতে পার্কের গাছগুলি ঘুমায়
মরমী পোকার দাঁতে লেগে থাকে ক্লোরিফিল
অন্ধকারে ভয়ের দরোজা খোলা থাকে ?

পাতাদের সঙ্গীত থেমে গেছে
রাতযন্ত্রের তারে কান্নার হ্রেষা
নিশ্চল চাঁদের কিনারায় জাগে
শোকাবহ রক্তিম দিনের স্মৃতি !

আহবানের গাঢ় হাত স্পর্শ করতে চাই
ফসলের মুঠোতে খুলে যাক একাকী বাগানের মুখ।

২

ঘুমের অরণ্যে মাছিদের বাসি লালা ঝরে
চাঁদ সূর্য তারা নেই
সাপের শীতল শরীরের মত অন্ধকার
অনেক অস্পষ্ট বীণার আওয়াজ।
ভাইবোন এসো আজ চোখে জল হয়ে
ঝিম্ ধরা বাতাসের নার্স
পশুর আত্মহত্যার মত এই রাত
জেগে আছে বৃক্ষের সবুজ মাংসে।

ইতালী সেলুন

কখনো মৃত্যুর আদলে
অসংখ্য কালো ফড়িং আসে বদলে নিতে
আমার সুউচ্চ স্বপ্নের সাথে তাদের লোমহর্ষক চাঞ্চল্য

আমি হতে চাই নীরবতাহীন
সবুজ ক্রাচে নিজের নরোম ছায়াটিকে বেঁধে দিই, যে ভাবে
জ্যৈষ্ঠ্যের জোয়ারের সময়
মাটিকে বেঁধে দেয় শ্রমিকেরা দল বেঁধে—
তবু নিরন্তর এই পারাপার ভেদ করা যায় না
যুদ্ধ ও অমানবিক কামনা পোড়ায়
অনায়াসে
পূর্ণিমা রাতের উজ্জ্বল বেদনায়।
কখনো কখনো
বিরহমাখা মাটির অন্তর হতে শুনতে পাই
কোমল সঙ্গীত।

২,

যতোবার নীরবতা চেয়েছি
ততোবার আগুনে পুড়েছে চোখ
ছায়াহীন ছায়ার মাঝখানে
বসে থেকেছি জীবনের অনেক দিন

আর যারা ডেকে ওঠেছে বন্ধু আমায়
তাদের অন্তর থেকে
গেয়ে উঠেছি আমিও হার্দ্য গান
বলিনি কখনো নিজের মাঝে
কেনো আমি এতোকাল
লুকিয়েছিলাম নিজেকেই।

মৃত্যু আবহাওয়ায়

পৃথিবীর তাবৎ মৃত্যুর গান আমি গেয়ে যাবো, এই পক্ষাঘাতে ভাঙা
রাষ্ট্রের দাঁতে
লেগে আছে অনেক গু, মুত। তার রোষে ভরা চোখের লেন্স আমি
খুলে নিতে চেয়েছি বহুবার বহুবার। পাণ্ডুর রোগীর মত এই সমাজকে
খুঁচিয়েছি দূর্বার ডগা দিয়ে; আর জুতোপেটা চোরের মত
বুর্জোয়াগুলি রাতের অন্ধকার ব্যতিত বের হয় না লোক সমক্ষে।

পথের সামনে থাকি কেবল আমি, আমরা কতিপয় অদৃষ্টবাদী—
সারাক্ষণ চাঁদের দিকে চোখ বাড়িয়ে অনেক পার্থক্য রচনা করি।
আবহাওয়ায় অনেক ধুলো, কাঁকরের গুঁড়ো আর হতাশা
একটি রেশমি রুমালের মত মন, তবু, উটের পীঠে সওয়ার হয়,
নারী ও নক্ষত্র মাড়িয়ে এক অস্থির খুরের চিহ্ন
অবিরাম পতঙ্গের পুড়ে মরার মত আমাকে দুবিসহ করে।

আমি মরতে মরতে বেঁচে যাই নৌকোয় পাল দেখে
বাতাসের চিকন আদরে আমি বেড়ে ওঠি শস্যময়
এক আদিম চিলের কানের মত আমার আত্মা ভেসে ওঠে,
আমার দেহকে ঘিরে অনেক বিদ্যুৎ আর বালিফেনার কোমল রশ্মিতে
আমি এক স্তব্ধ রাতের কান্না শুনি আবহমান চিতায়।

শস্যের কালো পোট্রেট দেখে কতোবার কেঁদেছি
চৈত্রের মাটির মত ফেটে যাওয়া আমার পলিময় হৃদয়
বৃষ্টির প্রতিভার কাছে নতজানু—

একটি ভালবাসাময় বিকেলের জন্য আমরা
চা-র কাপে দিয়েছি ঢেলে মনোযোগ আর

আমাদের পরস্পরের ইশারাগুলি মূর্তির মাথার মত
গোল চেতনায় কতোবার মৃত্যুকে মেনেছে স্বাধীন।

মন্ত্র : ১০

পড়ো, রাতের স্তব্ধতা, ভোরের কবিতারাজি
আমার সুন্দর ক্ষতে যে সব ঝড়ো মৌমাছি

মাকড়সার রক্তাভ চোখ আমাদের ঘিরে
বুনে যায় এক অবিনাশী জাল কী যে!

পড়ো, নিসর্গে ছড়ানো শস্যদানার ভাষা
জমাট ব্যথায় ফুর্তিবাজ সুদীর্ঘ আশা

আর বেদনার শত সহস্র সিঁড়ি
স্মৃতিরা হত, ভালোবাসা নষ্ট কানাকড়ি।

আমরা জানি না আমাদের শ্যামল চোখের নিচে
জমেছে কতো অস্পষ্ট দিনের ব্যর্থতা মিশে।

১৪০৪-র শেষ পূর্ণিমা

আশাগুলি দানা বাঁধে দূরের দিগন্তে
ভুল জোছনায়

প্রতিশোধে
অহংকারী মেঘে।

যাপিত জমাট ক্লান্তি নষ্ট করে
ফুল আর কাঁটার গোপন মধুর সম্পর্ক।

পুরনো প্রেমের অবিশ্বাস অনেক পোড়ায়,
চাঁদের সাথে বদল হয়েছে কেউ কি কোথায়?

কালো রাজহাঁস

ফুলছুঁড়িদের রাঙা হাসি যেন ওপারের আকাশ
আমরা খুঁজি মেঘের খুনসুঁটি।
যাদুউপত্যকায় হাড়ের কণা

সীমাহীন দুঃখে কুৎসিত।

বাতাসে উঠেছে ঢেউ
পাগল হয়ে ছুটে বেড়ায় বৃষ্টির চতুর শিশুগুলি।
কাদা ছিটায়, মাটিতে শোকার্ত ফসল!
সকলের শেষে
পানপাত্র ভেঙে ফেলে ঘূর্ণমান কালো রাজহাঁস।

জীবন-৩

কান্তির গহীন রোদ লেগেছে পথে
এখন শুধু সামনের দিকে চোখ

নোনা হাওয়ায় ভেসে চলে নৌকো
আমরা পেয়েছি খুঁড়ে বিগত যৌবন

হাসো, কাঁদো, স্বপ্নের ভেতরে জাগো
শোনো, ডাকে রূপালী অবগুণ্ঠন লাখো

সৃষ্টি অমর, স্রষ্টা ক্ষণিক বর্ণনাকারী
সহস্রের প্রেম খুঁজে আত্মাগুলি জাগে

২.

আমি
এই অভিশাপ
তোমাকে ফেরত দেবো
তোমাকে ফেরত দেবো
তোমাকে ফেরত দেবো।
মধ্যাহ্ন ভোজে
মনে পড়ে
আজ
কালের ধ্বনি
যখন জেগেছি
শূন্য বাগানের পাশে
একা, এক ডগার বক ফুল
ছিন্নভিন্ন।

স্থানাঙ্ক নির্ণয়ের একটি মহৎ ও অক্ষম প্রচেষ্টা

নমো মহদ্ভ্যো নমো অর্ভকেভ্যো
নমো যুবভ্যো নমো অশিনেভ্যোঃ
(ঋগ্বেদ)

কবিগণের মধ্যে যাহারা মহত্ত্বাভিমুখি, তাহাদের প্রণাম করিতেছি
কবিগণের মধ্যে যাহারা উত্থানরহিত, তাহাদের প্রণাম করিতেছি
কবিগণের মধ্যে যাহারা নিষ্ঠনবিশ, তাহাদের প্রণাম করিতেছি
কবিগণের মধ্যে যাহারা প্রপীড়িত অভিজ্ঞতাভারে, তাহাদের প্রণাম
করিতেছি
কবিগণের মধ্যে যাহারা মহৎ বা নিঃশক্তি বা নবিশ বা বৃদ্ধ নয়
সে-দলের আমাকে আমি প্রণাম করিতেছি

কবিগণের মধ্যে যাহারা তৈলমর্দনকারি, তাহাদের ভৎর্সনা
করিতেছি
কবিগণের মধ্যে যাহারা তুখোড় বেনিয়া, তাহাদের ভৎর্সনা,
করিতেছি
কবিগণের মধ্যে যাহারা মোহগ্রস্ত, তাহাদের ভৎর্সনা করিতেছি
কবিগণের মধ্যে যাহারা মতলববাজ, তাহাদের ভৎর্সনা করিতেছি
কবিগণের মধ্যে যাহারা মোসাহেব বা ব্যবসায়ি বা লোভি বা
সুযোগসন্ধানি নয়
সে-দলের আমাকে আমি ভৎর্সনা করিতেছি

জীবনানন্দে বুঁদ যে কবিতা

বাসন্তি জোছনায় মৃত মৃগদের মতো আমরা ক'জন হাত পা ছড়িয়ে
অসামান্য
এক খুঁজে পাওয়া বোধ করে বসে আছি, বলি ইউরেকা, আর পুরনো
সে সাগরেই

প্রতিদিন বুনে যাই প্রপঞ্চ আলেয়া
চন্দ্রীয় মৃদালোয় জাগে সংবেদ, নড়ে ওঠে দু'চারিটি
মৃগাংশ শিশু, কস্তুরি সুবাস মাখা শিঙেদের ডালপালা বাড়ে, ইউরেকা
বলে বলে

জোনাকিরা আলো ঢালে ধূসরিম
জোনাকিরা বুঝে গেছে বোধকরি ভেসে যেতে হবে,
আর ভাসা কাজে নদী নয় সাগরই উত্তম

সবুজ বিকেলের মন

ঝাঁকাভরা সবজি নিয়ে চাষীরা হাঁটে যাচ্ছে, রোদ পড়ে গেছে বিকেলের দেশে, এদেশের ধানখেত তার ঈশ্বরের স্তব করছে এখন, বাতাসের আড়ালে পরস্পরের প্রেমে বিনত শনগাছ, মাটি প্রিয় ঈশ্বর আমার, তোমার একফালিতে কয় একক ধানপান ফলাও

এই বৃক্ষরাজি তোমার পোষা ত্বকেরই লোম, মাটিরই অংশ ওরা যেমন এই মানুষ, তার হাতে গড়া যে কোনো মূর্তি, এই শান-শওকত, দুঃখ ও মরিচের ঝাল, সব তোমারই বৈচিত্র্যরাশি অণুপরমাণু, জৈবনিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া

এই অপরাহ্নের
দেশ জুড়ে এখন মৌ মৌ ঘাসের ঘ্রাণ, সবুজ সব মদের পিপে ছড়ানো তোমার বুকে, হাঁটুরেরা পান করে করে এইসব মদিরা, চারপাশে ছড়িয়ে যাচ্ছে লাউ ও শিমের সুঘ্রাণ, তরুলতা, হাজার শাকের ভালোবাসা।

অনিন্দ্য জসীম

শিমুলের ১৮তম জন্মদিনে লিখিত কবিতার প্রথম ফিরিস্তি

ঃ চন্দ্রীমা উদ্যান সাক্ষী থেকো বোন
ঃ তরুণ রিক্সা সাক্ষী থেকো ভাই
ঃ তেসরা ডিসেম্বর সাক্ষী থেকো শুভরাত্রি

১.

যখন এতোই নিকটে এসেছে পাহাড় গ্রহণ করো, অরণ্য শয্যায় ঢেলে
বুকের সঞ্চিতা বা'হাতের আঙুলে গুনে নাও ঈশ্বরের বয়স।
ঝর্ণার যোনিতে রেখে স্তন্যের ভূগোল ভুলে যাও মাতালের

ত্রিভূজ কীর্তণ, আলোর সমীপে রাখো ভোরের সবুজ।
আপনাবেগে মুগ্ধতা বড়ো বেশী নিঃশব্দ যার তার হাতে
মরে যাওয়া আনন্দ গুলো স্বপ্ন দেখুক একান্ত স্বজনের ঘরে।
অনাহারী কৃষকের মাঠে আয় করের হিসাব চাইবোনা আমরা
দু'একটা
নিরামিষ ভোজী শ্বেত কবুতর আর পদ্ম পাতার চুল এলিয়ে
বসে থাকা সুকন্ঠি ভ্রোমরের কাছে না হয় রেখে গেলাম না পাওয়ার
সজীব তৃষ্ণা, রাতের সুখবাদী দুঃখেরা জ্বলুক অন্ধকারে বেমালুম!

২,

ওপাশে বিশুদ্ধ মাতালের টিপো, কুকুরের ঘেউ ঘেউ...
পেঁচার গোহার ভেতর অসতী নিশীথ, অন্ধকারে
আমি এক ছায়াহীন ভূতুরে রহস্য-নেশাখোর শহরের নাভিমূলে
ছড়িয়েছি শরতের শুক্রাণু বীজ
আহা! বিগত বর্ষার পাপ, স্মৃতির শৃঙ্গারে ধর্ষিতা হলে
বুকের নেকলেস বাজুখাড়ু কোমড়ের বিছা ক্ষতি কিছু
হবেনা নারীর ; নারীতো ঈশ্বরের পাঠাগার।
তুমি মানো বা না মানো সে তোমার মৌলিক অধিকার

৩.

এই যে হাঁটছি ছায়াহীন ক্ষণপদে জ্যামিতিক ভাবনার ভেতর
কোথাও পাইনি খুঁজে মেধাবী অগ্রজ, রাতের কান্নার মতো
ডুবো জাহাজের বিউগুল সহসা কুখিঁয়ে উঠে।

সে নক্ষত্রগুলো স্বপ্ন বিক্রেতা ছিল বিগত ফাগুনের তারা আজ
একান্তে ফেরী করে স্মৃতির কাডিওগ্রাফ, যে গেছে হারানের পথে
তাকে বলি ফিরে যাওয়া ভালো, সত্যেরা স্মৃতি হয় কালের সমীপে...
যারা জানে সময়ের ইলেকট্রন বিন্যাস তারা জানে সবচেয়ে
গভীর ভালোবাসা পৃথিবীতে খুব অল্প আয়ু নিয়ে আসে।

৪.

মৃত্যু শিকারী নই সময়ের ভাস্কর। একাই
অন্ধকারে বিদ্ধ করেছি, একজোড়া কনিষ্টা আঙুল
সযত্নে ফেলে যাওয়া আধফোঁটা চুমু লুকিয়ে রেখেছি

ফুলতোলা বালিশের নীচে। কাউকে বলেনি ভয়ে
বৃক্ষেরা জেনে গেলে পাখিদের বলে দেবে সব
পাখিরা ভোরের হকার পৃথিবীর প্রথম সাংবাদিক।

৫.

দ্বি-খণ্ডিত উল্কার বিচ্ছুরণ থেকে বিভাজিত
এক টুকরো বসন্ত কাল ছিড়ে ফেলে সময়ের সম্বিৎ
এ দৃশ্যের কৌণিক ফটোগ্রাফী প্রতি রাত ব্ল্যাকমেল হয়
প্রতিরাত হীরক তৃষ্ণায় এক আউন্স ঘুমের ফসিল
কড়া নাড়ে, দরজা খুলে না...
কেউ নেই বলে নৈশব্দ এতো গাঢ় হয় বুঝি।

৬.

একে একে দু'হাতের পাঁচটি আঙুল
চল্লিশ বার গুণে দেখলাম, ছায়ার বয়সের চেয়ে
সাতাশ গুণ বৃদ্ধ আমি। তবুও মৃত্যুকে ভয়। যদি
জানালার গ্রীল ভেঙে কখনো উড়ে আসে কালো প্রজাপতি—
হলুদাভ মৃত্যু,—পালাবো কোথায়?
শিব লিঙ্গের উত্থিত অশ্বেরা আটকে রেখেছে
দক্ষিণ কাহিনী নদীর গতি পথ।

৭.

কেনো এ সকাল।
চুনকাম খসে পড়া রাজবাড়ীর পুরনো মডেল।
অসুস্থ শয্যার পাশে মুমূর্ষু হাতের যন্ত্রণা।
ফ্রয়েড। ফ্রয়েড।
দু'তলার গ্রীল বেয়ে উঠে আসা সুগন্ধি ভোর।
শূন্যে ভাসমান ছায়ার কার্পেট—অর্ধায়ু যৌবন।
নারী ও পুরুষের মাঝে শিল্পীত রাত্রি প্রবাহ।
কেনো-এ সকল।

৮.

হরতাল। বৃক্ষদের সালোক সংশ্লেষণ বন্ধ।
পাখিদের পিকনিক দেখতে গিয়ে ভাঙবো কাঁটাবন

সঙ্গিনীর নোলকের ফাঁক দিয়ে চরাচর সবুজ রহস্য আর
বৃক্ষের ভাষাগুলো লুকিয়ে রাখবো কৌশলে।

আলো জ্বললো। আর্যসুরা পান করে
হাওয়ায় উড়লো সাত কোটি বধির নক্ষত্র
কলসী বালিকার হাতে শালুক পাতার গান
এক দল টুপিওয়ালা রোদ এসবের দেখলোনা কিছুই
হরতাল! পূর্বজন্মে কবিরা মাছেদের অন্ধ প্রজাতি ছিলো
এ বিশ্বাস পুরাণে নেই।

হাদিউল ইসলাম

মাংসের প্রতিমা

সমুখে মাংসের প্রতিমা সোনা রং
বুকের উপর পা রেখে দিব্যি শালিক
নড়বড়ে হৃদয়টা বেজে উঠে, চং
পা নয় গো পা নয়
আমি শুধু পদচিহ্নের মালিক...

পোকা কাটা প্রিয় মুখ

পোকা কাটা প্রিয় মুখ ফেলে দিই
হাতে তবু পুরনোর গন্ধ লেগে থাকে
সেই কবে স্বপ্ন আমি কিনেছিলাম
রাধা দোকানীর কাছে
আজ দেখি ইমিটেশন রং তার জ্বলে গেছে
আহা হৃদয়টা বাজে খরচ
আমি আর স্বপ্ন কিনবো না গো গয়লানী মাসী...

ছোঁয়া

ছুঁয়ে দিলে কেঁপে উঠে স্বর্গ
ছুঁয়ে দিলে নেচে উঠে স্বর্গ
ষোলকলা ফুটে উঠে চৌষট্টি কলায়

এক ধরণের খেলা হয়
এক ধরণের গান হয়
রোদ্দুরে পুড়েছে পিঠ মনেই পড়েনা
ছুঁয়ে দিই কেঁপে উঠে স্বর্গ
ছুঁয়ে দিই নেচে উঠে স্বর্গ...

মানুষে মানুষ নেই

মানুষে মানুষ নেই। সরে গেছে। কিছু কিছু মরে গেছে।
ফলিয়ে প্রচুর অন্ধকার শুধু প্রেতকায়া। প্রেতেরা বিমুগ্ধ
এই নিয়ন আঁধারে। চোখেরা বিকল তাই সকল সমান।
মানুষে মানুষ নেই। সরে গেছে। কিছু কিছু মরে গেছে।
আছে শুধু কুমির খোঁয়াড়।

আত্মীয়

ছেঁড়া খোঁড়া হৃদয়টা জোড়াতালি দিয়ে
রোদ্দুরে দাঁড়াই। বাতাসে বাতাসে তারা
রমণী এখন
চোরাবালি গান গাই
হৃদি জলে ভেসে যায় রাধার কলস
তবু রোদ উঠে, রোদকে বলি—আত্মীয় তোরাই...

প্রাচীন পন্থী

নড়েচড়ে শক্ত হয়ে বসে প্রবীণ আঁধার
গর্বিত ইঁদুর এক অবিরাম শানিয়ে যায়
ল্যাজের মহিমা
কতিপয় চোখ করে চকচক স্বর্গীয় আমেজে
ল্যাজ ধরে মারি টান
মৌজের মজমায় জব্দ হয় লোভ সাম্প্রদায়িক ক্রোধ
দেশলাই জ্বালি
নড়েচড়ে শক্ত হয়ে বসে প্রবীণ আঁধার...

প্রতিশ্রুতি

সুধী অন্ধকার বৃন্দ
আপনারা আলোকের কাছে যেতে চান শুনে আমি খুশি
আমি যারপর নেই আনন্দিত আপনাদের এই সুন্দর আগ্রহে
লাইব্রেরীর এক একটা বই খুলে আমরা আলো নেবো
তার আগে চলুন নিজেদের খুলে দেখি কোথায় কোথায়
অন্ধত্ব সেঁটে আছে, গর্ত খুঁড়ে বসে আছে অশ্লীল ইঁদুর
এইসব ছুঁড়ে ফেলি।
আপনারা আলোকের কাছে যেতে চান শুনে আমরা খুশি
খুব দ্রুত লোডশেডিং এখন কমিয়ে ফেলবো আমরা
ধবধবে আলো দেবো এমন প্রতিশ্রুতি যদিও কঠিন...

গাছ

বহু পথ হেঁটে এসে ঘাম মুছি
মুখরা রোদের থেকে একটু সরে গাছের ছায়ায়
মনে হয় শান্তি
গাছ, এতো ছোটো কুঁজো হয়ে যাই...

যেতে যেতে তর্জন গর্জন
চঞ্চল বৃষ্টির থেকে একটু সরে গাছের নিচেই
মনে হয় বাঁচা গেলো
গাছ, এতো কম পাতা অল্পতেই ভিজে যাই......

মাসুম মোকাররম

মিথ

প্রিয় এবার আসুন আমরা বিয়ে খেলি
বহুদিন কমরেড বলে দিয়েছি মিছিল
মদ্যপ ছিলাম বলে তাহাদের ছিলো বিপদ
প্রিয়
এবার অষ্টমী স্নান   পাপদের নির্বাসন
নীল ঘরে চলো নাচ শিখি
কাল আমাদের বিয়ে দিন   চলো প্রিয় স্বপ্ন দেখি

ইনট্যুশন

অযথা ভেতরে ভেতরে গলি
খুব ভোরে জেগে যাই পুরোহিত পাড়া...গানেদের
রেওয়াজ শুনা কখনো হয় না তবু
দিনরাত দিনরাত
রোদে মেঘে পথে পথে সম্ভাব্য সকল আবাস
দুপুরে পণ দিয়ে খুলে ফেলি গোলাপী অন্তর্বাস
সহবাস ভুলে যাই স্বপ্নের ভেতরে

অযথা ভেতরে ভেতরে গলি
এগান পায় কী সে টেলিপেথী পথে ?

ফিডব্যাক

আমি তাঁকে থাপ্পর দেই বলিঃ মোকাররম
চুমু দে রাতে কবি নজরুল কাঁদে

এই ভাবে দিন সব গত হয়ে যায়
এই ভাবে মদের আবেশ কেটে কেটে ভোর

আমি তাঁকে থাপ্পর দেই বলিঃ মোকাররম
ঘুম যা

৬

প্রাসঙ্গিক দ্রষ্টব্য

আলোচিত বারজন কবির মধ্যে—
শতাব্দী কাদের, স্বাধীন চৌধুরী, মামুন মোয়াজ্জেম, মামুন মাহবুব, শামীম পারভেজ এবং মশিউর রহমান খান-এর কবিতা সময়মত না পাওয়াতে—এই ছয় জনের কবিতা ছাপা সম্ভব হলো না। আমরা লজ্জিত।

শুদ্ধতা ও অভিজ্ঞতার গান ঃ সাদা ঘোড়ার স্রোত

আলোচক
শিমুল আজাদ

'সাদা ঘোড়ার স্রোত' কবি শিমুল মাহমুদের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। সাড়ে তিন ফর্মার এই কাব্যগ্রন্থে মোট আটত্রিশটি কবিতা স্থান পেয়েছে। চমৎকার ঝকঝকে অফসেটে ছাপা আমানউল্লাহ্-র প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জায় গ্রন্থটি বেশ রুচিসম্মত এবং উন্নত। প্রকাশকাল ঃ মাঘ ১৪০৪। মূল্য ষাট টাকা। গ্রন্থে রচনার কাল উল্লেখ নেই। গ্রন্থটি প্রথম দৃষ্টিতেই নজর কাড়ে। এ গ্রন্থের প্রতিটি কবিতা পাঠে মেধা, মনন ও অনুধ্যানের দাবী রাখে। কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মস্তিষ্কে দিন-রাত্রি'র থেকে এ কাব্যে কবি অনেক বেশি গভীরে প্রোথিত এবং উত্থিত হয়েছেন-এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। 'সাদা ঘোড়ার স্রোত'-এর কবিতাগুলি এক মহত্তম উপলব্ধির, মহাগতীর ধারণাকে উন্মোচন করে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ মহাধারণার অন্তর্লীন অনুবর্তন সচকিত। মহাবিবর্তনের মহাপরিক্রমায় সবকিছুই চলমান। এই চলমান প্রক্রিয়ায় নিরলস অভিযাত্রী শুভ্র ঘোড়সওয়ারী কবি তাঁর যাত্রাপথে তাঁর চিন্তায়, ধারণায় অভিজ্ঞতার শুদ্ধতম বিশ্লেষণ করেছেন একজন বলিষ্ঠ ধারালো আত্মপ্রত্যয়ী ধ্যানী সাধকের মত। মহাজাগতিক পরিমণ্ডলে মানুষের অবস্থানগত সত্য মানুষকে কিভাবে নুব্জ, শূন্য, নিঃসঙ্গ ও যন্ত্রণাকাতর করে তুলেছে কবি তারই চিত্র একজন নিখুঁত চিত্র শিল্পীর মত এঁকে গেছেন। এ সত্য উন্মোচনে তাঁর এতটুকু জড়তা বা আড়ষ্টতা চোখে পড়েনা। আর এ কারণেই তিনি এই দশকের একজন শক্তিমান কবি হিসাবে অবশ্যই প্রতিভাত হবেন।

কাব্য আন্দোলনের ইতিহাসে বিবর্তন সহজাত। যুগ ও সময়ের পরিবর্তনের পাশাপাশি মানুষের যাত্রার পরিবেশ সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধের ব্যাপক

পরিবর্তন সাধিত হয়। যেহেতু শিল্প মানুষের জীবনযাত্রা, ধারণার এক মহত্তম উপলব্ধির নির্যাস। তাই এ নির্যাস গ্রহণে মানুষের চিন্তায়, চেতনায়, আলোড়ন ওঠে। জীবনকে সত্য ও সুন্দরের মুখোমুখি দাঁড় করায়। কবিতা শিল্পের এক গতীমান স্তর। যা মুহূর্তেই ঝড় তুলতে সক্ষম। ভাঙতে এবং গড়তে সক্ষম। আর এ ক্ষমতার বৃত্তে, বলিষ্ঠতা, তীক্ষ্ণতা ও গভীরতা এক বিশেষ গুণ। কবিতার স্বরূপ নির্ণয় করতে যেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণ কবিতাকে বিশেষ বিশেষ মর্যাদার গুণে অভিষিক্ত করলেও প্রত্যেকের ভিতর এমনতর নৈকট্যের আস্বাদন সহজে খুঁজে পাওয়া যায়। কবিতা মূলত জীবনের এক মহত্তম উপলব্ধি। এক মহত্তম ধারণা! শব্দ, বাক্য, ছন্দ, অলংকারে গড়া এক মায়াবী মোড়ক।

'সাদা ঘোড়ার স্রোত' কাব্যগ্রন্থের কবিতায় বক্তব্য উপস্থাপনে কবি বেশ পরিশুদ্ধ। মাটি ও মানুষের প্রতি গভীর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিপাত বেশ নজরে পড়ে। কবির দৃষ্টি আন্তর্জাতিক। কবিতায় শব্দচয়ন, বাক্যবিন্যাস, বিষয় বর্ণনার পদ্ধতিতে এই আন্তর্জাতিক আবহাওয়া পরিলক্ষিত। জীবন ও জগৎকে নির্মোহ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করা, জীবনের অর্থ নিরুপণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দৃশ্যমান—

আমাদের এই প্রণয় উপাখ্যান বিবর্তনে বিবর্তনে
ভয়ে শিহরণে আনন্দে সঙ্গমে
আর বংশ বন্ধনে
এই বন্ধন
অন্ধ
অন্ধ মানুষের সমাবর্তন।

(—হয়তো এই মানুষের এই যাত্রাপথ
এই মহাবিবর্তনের যোগফলে সীমাবদ্ধ)

আধিপত্যবাদের অবস্থানগত সত্য মানুষকে তার মৌল অবস্থানকে অস্বীকার করে। কুক্ষিগত করে তার অপরাপর স্বাধীনতা। স্বাধীনতার এই অমোঘ বিপর্যয়ে কবি উপলব্ধি করেন তিনি কৃতদাস। তাঁর আত্মার অভীপ্সায় আঘাত আসে। তিনি দেখতে পান তাঁর স্বাদেশিক পরিমণ্ডলে কোন আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবার নয়। বীরত্বের নিপুন

তরবারী দিয়ে সমস্ত বাঁধা বিপত্তিকে উচ্ছিন্ন করার কোন সাধ্য তার নেই—

এই দেশে, এই শহরে কোন অশ্বারোহী নেই,
নেই কোন বীরবাহু।

(—কৃতদাস গাথা)

তীব্র ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ ধনতন্ত্রের তেমনি আধুনিকতার একটা প্রধান লক্ষণ। ধনতান্ত্রিক ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ গড়ে তুলেছে এক প্রতিযোগিতা-মূলক সভ্যতা। এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের আদর্শকে স্বীকার করে নেওয়ায় আধুনিক সাহিত্যে পাই, কবিতায় পাই ব্যক্তির অভিজ্ঞতার রূপায়ণ, তার অন্তরলোকের উদ্‌ঘাটন—বিশ্বকে দেখা হয় ব্যক্তির চোখ দিয়ে। যেখানে ব্যক্তির স্বাদশীকতার হাওয়াও দুর্লক্ষ্য নয়। যান্ত্রিক সভ্যতার পরিবেশে লালিত মানব সমাজ মূলত তীব্র সংকটের মুখোমুখি। এই সংকট ব্যক্তি মানুষের, রাষ্ট্রের তথা গোটা বিশ্বের। যে কোন মুহূর্তে ধুলিস্মাৎ হতে পারে আমাদের সভ্যতা—মানুষের পরিবেশের ধ্বংসময় অধ্যায়। বেশির ভাগ আধুনিক কবিতা স্বীকারোক্তিমূলক। তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশের নাগরিক মানস তথা তার পরিবেশ বেশ রক্তাক্ত, বিপর্যস্ত। তারই রূপায়ণ দেখি কবি শিমুল মাহমুদের কবিতায়—

ক) শৃংখলিত কৃতদাস আমি সভ্যতার পকেটে পকেটে
বিকিয়ে দিয়েছি এই দেহ এই দেহের সমগ্র আত্মা
এই দেহ, এই দেহের সবটুকু মন
এই মন, এই মন আমাদের নয়। আর তাই
অবহেলায়—অবহেলায়, অযতনে, অবেলায় ছড়িয়ে ফেলেছি
এই মন, এই স্বপ্ন, এই সোনার দেহ আমার মাঝ রাস্তার ধুলোয়।
(—কৃতদাস গাথা)

খ) এই মিথ্যা বিকেলের গল্প
আমাদের মিথ্যা বাসনা মিথ্যা বারান্দা ঘিরে
এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় মুহূর্ত গুণে গুণে
ক্লান্ত বিষন্ন মোগল কন্যার মিথ্যা অহংকার
এই অহং, এই মিথ্যা বিকেলের ঝুল বারান্দায় এসে ঝুলে থাকে।
....

তোমাকে পাবার বাসনা পারস্য পাহাড়ে পাহাড়ে পাহাড়ি
পাখির পাখায়
ভেসে থাকে।

(—আর্য কন্যা)

সত্য ও সুন্দরের সাধনাই একজন শিল্পীর আত্মগত বিশ্বাস। সে বিশ্বাসের ভিতর আকাঙ্ক্ষার ক্ষয়, জয়, পরাজয় সবই ঘটে। পাওয়া না পাওয়ার দ্বন্দ্বে ক্রমশ গতীমান মানস খুঁজে পায় এক পরিশুদ্ধ সত্য। যেখানে দেখা যায় আকাঙ্ক্ষার মৃত্যু নেই। তৃষ্ণায় পরিতৃপ্ততা নেই। তা এক শিকড় থেকে আরেক শিকড়ে সঞ্চায়ণ ঘটায়। কাল থেকে কালে। এক জীবন থেকে আরেক জীবনে—

কাল মহাকাল ধাবমান
খেলা করে স্নায়ুতে স্নায়ুতে
শিরা উপশিরায়
আমরা জীবিত থাকি
জীবিত থাকি
এই ভূগোলের ভয়ানক কক্ষে।

(—কা আ তরুবর পাঞ্চ বি ডাল
চঞ্চল চী এ পইঠা কাল)

স্পর্শযোগ্য পূর্ণপ্রাপ্তি কবির প্রাণে কখনো ধরা দেয়না। কবি অভিজ্ঞতার পথ মঞ্চে তারই সাড়া পান। দেখতে পান বিকৃত রুচির প্রকাশ। শুনতে পান সমকামীদের শীৎকার ধ্বনি। আর বুঝতে পারেন নিজেকে জাগিয়ে রাখার মাঝে পাপ। বাঁচিয়ে রাখার মাঝে, ধারণ করার মাঝে পবিত্র পাপের বোঝা। এই বোঝাকে অতিক্রম করতে, পবিত্রতার অনুভবে অপ্রাপ্তির ভয়াল আরতীতে কবি গুমড়ে ওঠেন। বুঝতে পারেন পবিত্রতার পূর্ণ শর্তে তিনি স্নাত হতে পারেননি। পূর্ণ হতে পারেননি। এক বিষন্ন শূন্যতার ভয়াল থাবা তাঁকে ঘিরে আছে। কবি তা ভাঙতে চান। গুড়িয়ে দিতে চান—

এই আসবাব ভেঙে ফেলি
খান খান শূন্যতা
এই চিৎকার ভেঙে ফেলি
খান খান শূন্যতা

(—সহবাস এবং পবিত্র পাপের বোঝা)

এভাবেই সংকট থেকে সংকটে, প্রাপ্ত থেকে অপ্রাপ্তির মহাবিশ্বে ঘূর্ণায়মান সত্তা শুদ্ধতার স্পর্শ পান। প্রকৃতির ঐশ্বর্যে আন্দোলিত হন। সময়ের সুঘ্রাণে নেচে ওঠেন। আগামী দিনের আকাঙ্ক্ষার প্রাপ্তি থেকে আজকের বা বর্তমানের পাওয়াকে তিনি কাজে লাগাতে চান। যতটুকু এগিয়েছেন লাভ করেছেন তার ভিতরই পুণ্যময় বীজকে জাগিয়ে তুলতে চান—

আগামী দিনের জন্য পানীয় পচাতে নেই
পানপাত্রে বেজে উঠুক মাদল—

পরজন্মের ঘোড়া এসে
ঘাস খেয়ে যায়
আমাদের অন্ধ আত্মায়।

(—শুদ্ধতা ও অভিজ্ঞতার গান)

আত্ম আবিষ্কার একটি সচেতন প্রয়াস। এ প্রয়াসকে অস্বীকার করতে পারেনা আধুনিক কবি মানস। বর্তমান থেকে অতীত, অতীত থেকে বর্তমান এরই মধ্য দিয়ে মানুষকে ভবিষ্যতের পথ রেখা এঁকে নিতে হয়। আর তারই ভিতর হিসেবের পরিমাপের প্রশ্ন আসে। প্রায় মনে হয় ভুল সবই ভুল। আর মনে হয় এর থেকে পরিত্রাণ নেই। নিস্তার নেই। নেই কোন উদ্ধারকারী। বর্তমান থেকে পলায়ণপর কবি অতীতে, পৌরাণিক কালে আশ্রয় চান। যেখানে তার পরিত্রাণ, আনন্দ—এমনই উচ্চারণ শিমুলের প্রতিটি কবিতার ভিতর কখনো উচ্চকিত, কখনো নিঃশব্দে চিত্রিত—

এই পথ
কতটুকু ভুল
কতটুকু সংশোধনযোগ্য এই দেহ,
দেহের শরীর।
....
আমাকে পরিত্রাণ দিবে এমন অশ্বারোহী
নগরময় নির্মাণে নির্মাণে
ফিরে যায় একাকী
চাঁদের খনিজ পথ পাশ কেটে
আঁধার যুগ বরাবর।

(—আমার যত গ্লানি)

আত্ম আবিষ্কার এবং তার স্বীকারোক্তি। পলায়নপর মনোবৃত্তি একজন আধুনিক কবির মৌল অবস্থান। ক্রমশ অগ্রসর কর্মঠ একজন কবি সময়ের কাছে পরাজিত। তিনি পরিত্রাণ চান। অন্ধ হতে চান! চান তার মৃত্যু। মরুভূমির মতো শূন্যতায় এ অভিশাপ থেকে মুক্তি নেই। মানবিক অনুভূতি বর্জিত, যন্ত্রণাপীড়িত আধুনিক মানুষের মর্মান্তিক ছবি অংকিত হয়েছে কবি এলিয়টের পংক্তিতে—

> **Shape without form, Shade without colour,**
> **Paralysed force, gesture without motion.**

এই আতংকজনক নেতিবাদ ও শূন্যতাবোধ থেকে আত্মহত্যা বেশি দূরে নয়। কবি শিমুল মাহমুদের এই পরিত্রাণের প্রচেষ্টাও আমাদের চিন্তিত ও আতংকিত করে তোলে—

ক) এই চোখ অন্ধ
বন্ধ হয়ে যাক
দিগন্তে একা
বিষন্ন!

(—যীশুর শহর)

খ) যতক্ষণ স্বপ্নে বাঁচি
ততক্ষণ জীবন।—ঘুম ভাঙলেই মৃত্যু।
মরুভূমি বরাবর কালো নিকষ মৃত্যু নামে
ক্যাকটাস পাতার ফাঁকে
....
স্বপ্ন আমার সমস্ত শরীর
এই শরীর স্বপ্ন
স্বপ্নের আঁধার।

(—শুভ্র অশ্ব অলৌকিক)

এই নির্বেদ ও হতাশা থেকেই এসে যায় এক মানসিক জরা—যেহেতু শূন্যতাবোধের, নিরর্থকতাবোধের জীবাণু ঘুন পোকার মতো আত্মাকে আক্রমণ করে। আর এই 'বিস্ময়বোধের অসাড়তা' আধুনিক কবির নিয়তি—

ক) এই মৃদু বিকেলের মসৃণ সময়ে—
নিঃসঙ্গ কুকুরের মত নিঃসঙ্গতার পাপ

নিরিবিলি শুয়ে থাকে আমার বুকের
গভীরে নিশ্চিত।

(—একা একজন যুবক)

খ) আমাদের রক্তে ফোটায় ফোটায় মিশে আছে পাপ
নিঃসঙ্গতার পাপ।
নিঃসঙ্গ প্রাচীন জ্যোৎস্না
মৃত পাখির পালকের মত
নিঃসঙ্গ প্রাচীন জ্যোৎস্না।

(—সাদা ঘোড়ার স্রোত)

পথের নেশা পথিককে পেয়ে বসে। জ্ঞান পিপাসু প্রাণ পথ চলতে চলতে তার দৃষ্টির, আত্মার তৃষ্ণাকে পরিপূর্ণ করতে চান। এ এক মোহ। পথিকের কাছে এ এক বিস্ময়। আর এ বিস্ময়ের মাঝে থাকে এক পরম ট্রাজেডী। দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা আর নিঃসঙ্গতার তীব্রময় তাপ। এ তাপে পুড়ে দগ্ধ প্রত্যেককেই হতে হয়। হতে হয় অন্ধ। সময়ে সময়ে পথিক তাই নিবৃত্তি চান, চান পরিত্রাণ। চান অবলম্বনের সারা—

আমাকে ফেরাও
আমার প্রিয়তম ভগ্নী
কন্যা
বউ
আমিতো যেতে চাইনি এতটা পথ
অপরিচিত পথের মোহে অন্ধ হয়েছি আবার।

(—এই দেহ ফেলে আসি পদ্মায়)

মহাবিশ্বের মহাজাগতিক পরিবেশে ক্ষুদ্র গ্রহের ক্ষুদ্র প্রাণী মানুষ। সৃষ্টির পর থেকেই সে প্রকৃতির বিস্ময়কে অর্জন করার জন্য ছুটেছে এবং ক্রমশ তার স্বাদ কম বেশি সে অস্বাদনও করেছে। মানুষের সীমাহীন আকাঙ্ক্ষার কাছে তার সাধ্যের হাত অপ্রতুল এবং নগন্য। এ নগন্য সাধ্য বা ক্ষমতা সে মানতে রাজী নয়। সে খণ্ডতার মাঝে অখণ্ডতার—অপূর্ণর মাঝে পূর্ণের শৃংখল জুড়ে দিতে বদ্ধ পরিকর। কবির কাজ অপূর্ণর ভিতর পূর্ণের, খণ্ডের ভিতর অখণ্ডের নির্মাণ।

অদেখাকে দেখার, অজানাকে জানার আগ্রহে, পথকে জাগিয়ে দেয়ার—

পৃথিবীর বয়স কত ? কত সময় লাগবে
পৃথিবীর জন্ম হতে শেষ দিন পর্যন্ত
একবার ঘুরে আসতে ? দিগন্তের কোন জায়গা
হতে শুরু পৃথিবীর সীমানা ?

....

আহ্ পিতা !
আমরা সূর্যকে ছুঁয়ে দিব কিভাবে
কিভাবে আমরা সূর্যের স্পর্শ পাবো ?

(—আরবের রূপকথার আশ্চর্য ফিনিক্স পাখি)

গতীর সাথে মহাগতীর মিশ্রণে এক অনির্ণীয় আনন্দে ভেসে কবি শিমুল মাহমুদ তাঁর কল্পনার সীমাকে তরঙ্গিত করেছেন। তাঁর অভিজ্ঞতার ভিতর শুদ্ধতার মাত্রা লেপন করেছেন। মৃত্যুর ভিতর, শূন্যতার ভিতর, রাতের নিসর্গতার মধ্যে গভীর স্বপ্নকে আয়ত্বে আনার তীব্র আকুতি তাঁর কবিতায় ফুটে উঠেছে। পাহাড়ী মুক্ত, স্বাধীন, সৌন্দর্যময়ী, দীপ্তময়ী ঘোড়ার সাথে, বন্যতার সাথে, মানুষের জীবনের সংযোগ সাধনে কবি তৎপর হয়েছেন। ঘোড়ার প্রচণ্ড গতীর সাথে তাঁর আত্মার গতীকে সংযুক্ত করার আকুতি কবির কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়েছে—

বুদবুদ উড়ে যায় শূন্যে। শূন্যতার পথ বেয়ে মৃত্যু নামে
গভীর রাতে একাকী
কোন এক পাহাড়ী ঘোড়ার দেশে। পাহাড়ী ঘোড়ার স্রোত
তোমাদের স্রোতের সাথে যোগ করে নাও
আমার এই রহস্য বেঁচে থাকার
তোমাদের কাহিনীর সাথে যোগ হোক
মানুষের চলমান শৌর্য গাথা বীর রস রক্ত লাল কণিকা
উল্লাস অনাগত ঢেউ স্রোত এই ঘুড়ি উড়ানো জীবন স্পন্দন।

....

স্নায়ুতে প্রবাহমান সাদা ঘোড়ার স্রোত
জীবিত থাকার মধ্য দিয়ে এই ধাবমান স্রোত

(—সাদা ঘোড়ার স্রোত)

শিমুল মাহমুদের কবিতার মূল লক্ষ্য মানুষের চিন্তনে গভীর জিজ্ঞাসার বীজকে রোপন করা। হৃদয়ে মহত্তম উপলব্ধির ধারণা পৌঁছে দেওয়া। আর এ কাজটি করতে যেয়ে তিনি তাঁর শিল্প মাধ্যমে কোন আড়ষ্ঠতা বা অস্পষ্টতা রাখেননি। তবে তাঁর উচ্চারণ পদ্ধতি গম্ভীর এবং গূঢ়তর। সেখানে ঢুকতে গেলে এক ধরণের গম্ভীরতা প্রয়োজন। চিন্তাশক্তি, মেধা শক্তিকে বিশেষ প্রস্তুত রাখা প্রয়োজন। তিনি তাঁর কবিতায় আবেগকে সংযত এবং সংক্ষিপ্ত করেছেন। আত্মস্বীকারোক্তি-মূলক এই কবিতায় কোন দ্বিধা নেই। বর্ণনার স্থূলতা নেই। তাঁর কবিতা পড়তে যেয়ে হোঁচট খেতে হয় না।

কবিতা যেহেতু জীবনের মহত্তম উপলব্ধিকে উচ্চকিত করে। জীবনের অতৃপ্ততা, সৌন্দর্যময়তা, সুন্দর অসুন্দর, নিঃসঙ্গতা, যন্ত্রণার চিত্রকে চিত্রায়িত করে তাই কবি শিমুল মাহমুদের কবিতায় এই মহত্তম উপলব্ধি ও সংকটের ভিতর মূর্তমান হয়েছে ঐতিহ্যপ্রীতি, পৌরাণিক স্বপ্নে বিভাজিত হবার সরব মানস। বর্তমানে হাঁপিয়ে উঠে অতীতে ফিরে যাবার তীর্থ অভীপ্রায় ঝংকৃত প্রাণ গভীর ভিতর মহাগভীর আরাধনা করেছেন। সাদা ঘোড়ার স্রোতে নিমজ্জমান হতে চেয়েছেন। বীরত্বের তীব্রতা নিয়ে ছুটতে চেয়েছেন। মানুষের চিরন্তন ট্রাজেডী, জীবনের নিরর্থকতা, সময়ের বিভৎসতা নির্ণয়ে তিনি যথেষ্ট তৎপর হয়েছেন। প্রায় মুহূর্তে কাব্যগ্রন্থের কবিকে দেখা যায় দার্শনিক দৃষ্টিকোণে উচ্চকিত, জিজ্ঞাসিত প্রাণ এবং তিনি মর্মাহত। উপলব্ধিগত অভিজ্ঞতার শুদ্ধতম গান তিনি পাঠককে শুনাতে চেয়েছেন। এই গান নির্মাণে তাঁর ক্লান্তির পাশাপাশি পলায়নপর মনোবৃত্তি যেমন জেগে উঠেছে তেমনি তা গেয়ে যাবার দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞাও ঝংকৃত হয়েছে তাঁর কবিতায়। কবিতার নান্দনিকতা নির্মাণে তাঁর সচেতন প্রয়াসও লক্ষ্যযোগ্য। একজন নিপুণ শিল্পীর মত শব্দকে তিনি ঘসে মেজে ছেকে তুলেছেন পরিশুদ্ধ প্রয়াসে। এ কাজে তাঁর স্বার্থকতা তুলনাহিত। অনেক গদ্যগন্ধী শব্দকে তিনি কাব্যগন্ধী করতে পেরেছেন—যা কবিতার সঙ্গীত ধর্মকে অনস্বীকার্য ব্যাখ্যায় পর্যবসিত করেছে। যা কবির বিশেষ কৃতিত্ব। কাব্যের শব্দসম্ভারের মধ্যে কাব্যের সঙ্গীত জাগ্রত হয়—আরো স্পষ্ট ভাবে বললে শব্দ যখন অর্থদ্যোতনার সহযোগে ধ্বনিদ্যোতনা সৃষ্টি করে তখন সেই ধ্বনির বিন্যাসেই

কবিতার সঙ্গীত জন্ম নেয়। শব্দের স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনি, দীর্ঘ ও হ্রস্ব স্বর, যুক্ত ও অযুক্ত ব্যঞ্জন যে নানা বিচিত্ররূপে সাজানো যেতে পারে তারই সবচেয়ে সঙ্গত ও আবেদ-দ্যোতক বিন্যাসই কাব্যের সঙ্গীত। মনে রাখা দরকার এই সঙ্গীত কাব্য থেকে আলাদা কিছু নয়। ছন্দের মধ্যে এই সঙ্গীত-গতী স্থিতি পায়। কবিতায় চিত্রগুণের জন্য যেমন উপমা, তেমনি কাব্যের এই সঙ্গীত আশ্রয় পায় বেশির ভাগ অন্তর্লীন অনুপ্রাসে। কবিতায় মৌলিক যে আবেগ, যা শব্দের অর্থের দ্বারা শুধু আয়ত্বে আসেনা, শব্দের ধ্বনি দ্বারা সেই অনুভব-প্রসু আবেগকে ধারণের জন্যেই কবিদের শব্দ সঙ্গীতের সাধনা। মানুষের অনুভূতির যে জগৎ ভাষার দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব তার চরমতম দিগন্ত পর্যন্ত শব্দের ধ্বনি সম্পর্কের মাধ্যমে, শব্দের শ্রুতির মাধ্যমে প্রকাশ করাই বিশুদ্ধ কবিতার কাজ।—আর এ ক্ষেত্রে কবি শিমুল মাহমুদের কবিতা অন্তর্লীন অনুবর্তনে বিশেষভাবে সার্থক ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। উপমা, অলঙ্কার, ছন্দ ব্যবহারে তিনি ততটা সচেতন হননি যতটা বক্তব্য নির্মাণে, শব্দ গঠনে সাঙ্গীতিক অনুরণণে সচেতন হয়েছেন। তাই বলে কবি শিমুল মাহমুদের কাব্য-মান এতটুকু ক্ষুন্ন হয়নি। গভীর বিশ্লেষণে মনে হয় এর বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

কাব্যালোচনার পরিশেষে বলতে হয় বাংলা কাব্য আন্দোলনে অসংখ্য আন্দোলনকারীর ভিতর কবি শিমুল মাহমুদ এক অনন্য সংযোজন। তাঁর এ নিরলস প্রচেষ্টা সার্থক। দিন দিন তাঁর উত্তরণ বাংলা কাব্যমোদীদেরকে সচ্ছল করে তুলবে। গড়ে তুলবে আত্মিক উপলব্ধিতে সদা জাগ্রত প্রাণ; জীবনের মহত্তম অভিজ্ঞতায় পর্যবসিত স্বেচ্ছায় নিবেদিত সত্তারূপে।---এ অঙ্গীকার কবি শিমুল মাহমুদকে প্রত্যহ আচ্ছন্ন করুক – এ প্রার্থনা আমাদের সবার।

শিমুল মাহমুদ-এর সাম্প্রতিক কবিতা

নিঃসঙ্গ পদাবলী

২

আমি নিঃশব্দ গভীর রাত্রীর গহনে
সেই চোখ ছুঁয়ে দেখি।
কার চোখ ভাসে ওই মরা বাতাসে ?
আমাকে ঘিরে নিঃসঙ্গ নির্জনতার কণ্ঠস্বর
নৈঃশব্দ রহস্য সৃষ্টি করে।
সেই রহস্য ছুঁয়ে দেখি আমি
ছুঁয়ে দেখি সময়ের সূক্ষ্ম সুতোর শরীর।
কার চোখ ভাসে ওই মরা বাতাসের শরীরে ?

৩

কে যেন ডাক দেয় আমাকে সবুজ ঝোপের আড়াল থেকে
হাসছে ঝাউবন নির্ভার আলোর হ্রদ নিয়ে বুকে
শিশু বৃষ্টির ঝালরে লজ্জিত ঝাউবন হয়ে উঠে উজ্জল
আর আমি শিশু পুত্রের মত ছবি আঁকি অদৃশ্য বাতাসের বুকে
ঝোপের আড়ালে পাখি
পাখিদের লেজে লেজে দোল খায় পরিপক্ক ফল
বেদনার ফলগুলি পেঁকে উঠবে এই শরতের ছোঁয়ায়
কে যেন ডাক দেয় আমাকে সবুজ ঝোপের আড়াল থেকে

৫

আমার আনন্দ লুকিয়ে থাকে
বিষন্ন মৃত বাতাসের শরীরে।
কেমন রোগার্ত গ্লানি, ক্লিশে চিৎকার।
নরম বালুচরে, নলখাগড়ার বনে বনে
প্রজাপতির গোপন চিৎকার।
আমি চিৎকারের সুর ধরে গোপন সৌন্দর্যের জাল বুনি।
অরণ্যে অন্ধ ময়ূর নাচে। আশ্চর্য আদিম আনন্দ।

একখানা পাহাড়ি টিয়ে ডেকে যায় পাহাড়ের বুকে
অথচ সন্ধ্যার বুকে কি তীব্র রক্ত ক্ষরণ
আহা সন্ধ্যার অন্ধ চোখে পাহাড়ি ফুল
ফুলের পাপড়ি ছিঁড়ে ঝরে যায়।
পাহাড়ের আড়াল থেকে কে যেন দেখে ফেলে এই
রোগার্ত দৃশ্যাবলী। হায় দৃশ্য!
আমাকে অন্ধ করে দাও
মাতাল ময়ূরের মত অন্ধ হব আমি।

৭

কাশবন ছেড়ে চলে গেছে বুনো হাসদল
বৃষ্টির কণাগুলি কেঁদেছিল হাস শাবকের শোকে
কাশবনে ভেসে থাকে বুনো হাসের চিৎকার
আলোতে চিৎকারগুলি ফোটা ফোটা ঝরে
সেখানে অবাক সঙ্গীত
সঙ্গীতের অন্তর আত্মায় স্বপ্ন তরঙ্গ বয়ে যায় অনিবার।
এক দীর্ঘ সোনালী ঝর্ণা থেকে
একটি গোলাপ ফুল ঝুকে চেয়ে আছে নদীর দিকে
রাত্রি নেমে আসবে অতি সতর্ক পদে
এই রূপালী দীঘল বালুচর অন্ধকারে কাঁদবে
বুনো হাস শিশুর বিরহ শোকে।
নদীর গহীনে কেন এত পোড়া দহন জেগে থাকে রাতভর!

৯

আমার অনুভূতিগুলি বয়ে যায় গাছেদের পাতায় পাতায়
দূরে আরো দূরে অবিরাম শষ্য ফোটে
ধূসর পাখিরা গান গায়
জলের শব্দ টুপ্‌টাপ্ বাজে
কি আশ্চর্য সতেজ হওয়ায় ভেসেছিলাম সেইদিন
নিদ্রালু মদির বিকেল ডাক দেয় আমাকে
ঘাসের সতেজ ঘ্রাণ বালিকার ঠোঁটের মত মায়াবী আর
হৃদয়ের স্বচ্ছতা যেন শান্ত সকাল
সে আসবে একদিন তীব্র আবেগ নিয়ে বুকে

দূরে আরো দূরে সুর ভাসে
ভারতীয় বাঁশির মোদন মোহন সুর।

১৩

আজ সকালে শরৎ নেমে আসবে গাছের পাতায়
খুব ভোরবেলা কোন এক গহীন বনের আড়ালে
হরিণ শিশুরা হাঁটছে নিরিবিলি
ওদের চোখের গভীরে আজ সকালে শরৎ নেমে এলো
এই শরতে বেদনার ফুলগুলি ফুটবে আবার
বসন্তের আগে ঝরে যাবে ওরা।

এত বেদনা ফুলের পাপড়িতে কি করে জড়িয়ে থাকে চিরদিন
হায় বোবা বেদনার ফুলের বাগান!

১৪

হায় বেদনা জাগানো ফুলের পাপড়ি
তোমার পরাণিয়া সুর রিনরিনে শিশির ঝরায়
এমন প্রশমিত যন্ত্রণার লাল লাল ফুল
তোমার স্নায়ুতে এত নেশার সুবাস
এত সুকমল সুবাসে কি যন্ত্রণা মিশে আছে এখনো?
আজো কোন্ প্রাণ পরাণের সুর বাজে ফুলের শিরায়
ঐ লাল শিরায় শিরায় এত রহস্য
এত যন্ত্রণার দীর্ঘশ্বাস কি করে মিশে থাকে
আমি তা বুঝবো আজ কিভাবে বলো?

১৫

তোমার স্নায়ুর ভেতরে আমার বিষন্নতা প্রবাহিত করি
প্রবাহিত করি অজস্র ফুলে ভরা বিকেলের তীব্র কণ্ঠস্বর
এত স্মৃতি বহন করবে কিভাবে তুমি?
কিভাবে রাতের ফুলগুলি ভেজা জ্যোৎস্নায় কালো হয়ে উঠবে!
আমার যন্ত্রণার ফলগুলি সব পেকে উঠবে এই জ্যোৎস্নার বর্ষায়
এমন সাজানো জ্যোৎস্না কিকরে আকলে তুমি?
গ্রামের ঐ তালপুকুরের ধার ঘেষে মরা বাতাস ভেসে থাকে।

ফুটেছে শিমুল ফুল।
মেয়েগুলি দলে দলে আসবে আজ
খোঁপায় কষ্টের নীল ফুল গেঁথে
এতটা নীল স্মৃতি কিভাবে বহন করলে তুমি এতকাল ?

১৮

স্বপ্নের ভিতর ফ্যাকাশে ছাইগুলো উড়ছে।
কেমন হলুদ আলো জ্বলে উঠে থেমে যায় নিরবতার ভিতর।
দূর নিরবতার গভীরে আমি বেদনার সুর শুনি,
ডুবন্ত বৃক্ষগুলি নির্জনতা পান করে
রাত্রির নির্জন সুরের ভিতর আমি নিঃসঙ্গ নিঃশ্বাস ছড়াই।
হায় নির্জন নিঃসঙ্গতা
নিলাভ কষ্টের মত নির্জন রাত্রি
আমি ক্রমাগত ছড়িয়ে যাই
জলে ডোবা বৃক্ষের নীল স্নায়ুতে স্নায়ুতে।
এই রাত্রিতে জন্ম হবে আমার
হায় নীলকণ্ঠের দেবতা
এত জল, এত ঘোলা জল
জলের স্রোতের ভিতর কেন এত পোড়া দহন জেগে থাকে রাতভর !

১৯

সুরের ইন্দ্রজাল আমাকে মোহমুগ্ধ করে
কি তীব্র মুগ্ধতা
কি তীব্র দহন এই সুরের শরীরে
সময় গলে গলে ঝরছে পাতার আড়ালে
আর নদীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে ফুল ফোটে
পাথরে পাথরে গান বাজে
আমার বুকে বিষাদ
বিষাদ আমাকে দূরে নিয়ে যায়
আমার আত্মাকে দ্বিখণ্ডিত করে খেলা করে বিষাদ
জলন্ত তৃষ্ণার দহন
কেন কাঁদছে ওই ঋতুবতী ফলগুলি ?

আহা ফলের কান্নায় এত আগুন কে ছড়ালো !
ওই নদীর ঢেউয়ে কার মুখচ্ছবি ভাসে ?
তোমার পদধ্বনি শুনতে পাবো না আর কোনদিন।

২০

নক্ষত্রের আলোগুলি মরে যায় প্রহরে প্রহরে
নদীর তীরে তীরে বকফুল নরম চোখ তুলে তাকায়
গাছেদের নির্বোধ নীল পাতারা বুকের অতলে রাতভর স্বপ্ন বোনে
দুঃখী ডালিম ফল রাতভর কাঁদে আর
আমাকে ছুঁয়ে ফেলে নীল ঘাসফুলগুলির আশ্চর্য প্রেম
হায় কাচা যন্ত্রণার নীল ঘাসফুল
নীল প্রজাপতির পাখায় ঘুমাও।
ফড়িংয়েরা কি রঙ ছড়ায় ওই মরা শিশিরের শরীরে
কারা ডাকে ? ওই জলাশয়ের গভীর থেকে
কার চোখে দেখেছিলাম এই বনময় ছায়াছায়া শ্যামলতা ?
হায় মৃত নক্ষত্রের রাত
হায় কাচা যন্ত্রণার নীল ঘাসফুল !

আমি চিনতাম সেই শ্যামল চোখের কাচা মেয়েটাকে।

২২

বিষন্ন জলের গান শুনি আমি মাঝরাতে
কালরাতে তুমি এসেছিলে চুপিসারে
আহ্ ঘাসফড়িং নাচে তোমার চোখে
দূর থেকে আরো দূর থেকে ভেসে আসে বাতাসের একটানা সুর
আরো দূরে জলের শব্দে ভাসে অতীন্দ্রিয় জলরঙ
হায় স্বপ্নের বরফফুল
তোমার শীতলতায় ঝরে যায় পাখির পালক মৌরী ফুল
ফুল আর পালকেরা ভাসে জলরঙ ছবিতে
ওরা দুঃখের ছবি আঁকে নিজেদের শরীর দিয়ে
আর কোনদিন আমাদের সেই মেঠো উঠোনে
আকাশের তারাগুলি ঘাস খেতে আসবে না ঝাঁক বেঁধে
আমার স্নায়ু পরিপূর্ণ হয় বাদামী যন্ত্রণায়

রোদ পালায়
ওই পরিচিত তারাগুলি মরে যায়
নিঃসঙ্গ কষ্ট বেঁধে বুকে
বিষন্ন জলের গান শুনি আমি মাঝরাতে

২৩

এত দীর্ঘ সময় পর
আমি জেগেছি এক গভীর নদীর ভেতর।
আকাশ আজ এত শ্যামল হলো কেন ?
আর ওইখানে পরিচিত মানুষের ঢল
পানির ঘোলাজলে কেন এত কান্না লুকিয়ে থাকে !
মানুষের শ্যামল কান্না আকাশের মত জমাট
আমি ভাবিনি কোনদিন এই ফ্যাকাশে রাত্রি আর দিনের কথা
শিশুদের রক্তে জমে ওঠে বৃষ্টি ও নদীর স্মৃতি
এই সন্ধ্যায় বৃষ্টি ঝরবে আবার
ভেজা মানুষের সাথে হাঁসগুলি জলের ভিতর কি খুঁজছে এখন ?

২৫

এইখানে নির্জন বিতাড়িত বসন্ত জেগে আছে
বিতাড়িত বসন্তের স্নায়ু প্রবাহিত হয়
প্রতিটি পাতা আর ফুলের অন্তরে অন্তরে।
আমার মানসী আসবে
কষ্ট আর ফুলের কান্না নিয়ে বুকে
আর এই রুগ্ন অপরিচিত বসন্তের শরীরে
বেসুরে উড়বে যত পাখিদের কংকাল।

বিকেলটা মরে গেছে গতকাল
রাস্তার কুকুরের মত।
মরমিয়া সঙ্গীতের কাঁধে কাঁধে
রাশি রাশি মানুষের মরা দেহ দোল খায়
বিষন্নতার ভিতরে ফুল পাখি হিমফুল নাচে।
দূর থেকে ভেসে আসে
কালো অশ্বের কালো খুরের আওয়াজ
এত কালো কালো ভয়
এত মৃতের কফিন কি করে বহন করবে তুমি ?

২৬

এই নিশ্চিদ্র বিকেলে কে চুরি করে পবিত্র অনুভূতি
এত আলো বহন করে কে
কার ছায়া অমন বদলে যায় ?
সবুজ প্রাণ বয়ে যায় জারুলের বনে
তৃষ্ণার্ত উটের মত দু' একটি বয়েসি গাছ
হেঁটে গেল যুবতী নদীর তীরে।
হায় বৃষ্টি
বৃষ্টিতে রোদ হাওয়া দোলে
শালের পাতারা চোখে ঘুম নিয়ে দোলে ঝিম ঝিম
যুবতী নদীর বুকে
মেঘের কোমল বুক ঘষা খায় নিরবে
দূরে একজোড়া মাছরাঙা গান গায়
কবরের গভীরে বাজে মৃতের সঙ্গীত
হায়
মৃত ও জীবিতের মাঝামাঝি
কি করে বাস করি আমি ?
কিভাবে দেখি প্রকৃত ছবি এই জীবিত ও মৃতের।

টি. এস. এলিঅট ও আবুল হাসান : একটি তুলনামূলক আলোচনা

মাসুদুল হক

বিংশ শতকে যদি কোনো একটি কাব্য বিশ্ব-সাহিত্যে কবিতার মোড় ঘুরিয়ে থাকে তবে তা নিঃসন্দেহে 'দ ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড'। কবিতাটি আলোড়ন যেমন সৃষ্টি করেছে, তেমনি এর দুরূহতাও কবিতাটি বুঝবার পক্ষে কম জটিলতা সৃষ্টি করেনি। টি. এস. এলিঅট যে—নতুন টেকনিক এই কাব্যে ব্যবহার করেছেন তা পূর্বাচরিত ইংরেজী কাব্যধারার টেকনিক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, এ-কথাটি সর্বাগ্রে মনে রাখতে হবে। কাব্যে ডান, ব্রাউনিং এবং উপন্যাসে প্রুস্ত ও জেমস জয়েস প্রবর্তিত রীতিকে এলিয়ট আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলেন, গদ্যের লজিক ভেঙ্গে, এক চিন্তা থেকে সংলগ্ন অন্য চিন্তায় দ্রুত বিচরণকে কাব্যের স্বাভাবিক রীতি হিসেবে ব্যবহার করলেন, নাটকীয় স্বগত ও সংলাপ এবং কথ্য ভাষার যথেচ্ছ মিশ্রণ ঘটালেন এবং সেই সঙ্গে বিশ্বের যাবতীয় সাহিত্য, দর্শন, পুরাণ থেকে উদ্ধৃতি ও উল্লেখ অবলীলায় ব্যবহার করলেন কাব্যের মধ্যে, এবং এইভাবে একটি মিশ্র কোলাজকে শিল্পের মর্যাদা দিলেন। বলা বাহুল্য, এই টেকনিককে স্বীকার করেই পাঠককে এলিয়টের কবিতার মধ্যে প্রবেশ করতে হচ্ছে।[১] তবে, টি. এস. এলিয়ট, নিঃসন্দেহে আজকের পৃথিবীতে কাব্য-প্রেমিক ও অ-প্রেমিকদের কাছে পরিচিত একটি নাম, কবি, নাট্যকার ও সমালোচক।

অন্যদিকে, "পঞ্চাশের দশকের কয়েকজন কবি বাংলাদেশের কবিতার নতুন জমি তৈরী করলেন, আবাদ করলেন সেই জমি মেধা ও শ্রমে। এই জমিতে পা রেখেই ষাটের

দশকের সিকদার আমিনুল হক, রফিক আজাদ এবং আব্দুল মান্নান সৈয়দ বিশিষ্টতা অর্জন করেন। তাঁদের আবির্ভাবের পরই সানাউল হক খান, নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহা এবং অকাল প্রয়াত আবুল হাসানের কাব্যশস্য হিলহিলিয়ে ওঠে''।[২] সেই, আবুল হাসান, প্রয়াত হয়েও আজ অবধি—বাংলাদেশের কবিতার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট নাম। ''আবুল হাসান মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত কবি, কবি ছাড়া আর কিছুই নন। তাঁর প্রতিটি নিঃশ্বাসে বয়ে গেছে কবিতা। তাঁর এলোমেলো জীবনের ছাপ পড়েছে তাঁর কবিতাতেও। এই এলোমেলোমি তাঁর কবিতার দুর্বলতা এবং শক্তি। আবুল হাসানের কবিতার আপাত-অসংলগ্নতা এমনই হৃদয়গ্রাহী যে পাঠক অভিভূত হয়ে পড়েন। তাই, তরুণ কবিদের কাছে তিনি এত প্রিয়। তিনি যৌবনের বিষন্নতা, নিঃসঙ্গ এবং দীর্ঘশ্বাসের কবি। তাঁর শিল্প-সৌন্দর্য বোধ যেমন তীক্ষ্ণ তেমনি তীব্র মানুষের প্রতি তাঁর মমতা, জীবনের প্রতি ভালোবাসা।'[৩] তরুণদের উপর জীবনানন্দ দাসের পর বাংলাদেশের কবিতায় সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছেন আবুল হাসান। তিনি শান্তি আর শিল্পের মানুষ, সর্বোপরি মানবপ্রেমী প্রকৃত কবি।

আধুনিক বাংলা কবিতার শুরু রবীন্দ্র-প্রতিভার বিসর্জনের মধ্য দিয়ে। এর আদি নির্মাতারা রবীন্দ্রনাথের ভক্ত ছিলেন না এমন নয়, তবে তাঁর অন্ধ অনুকার হবার দুর্মতি তাঁদের হয়নি। তিরিশের কবিরা রবীন্দ্রবিগ্রহকে সরাতে চেয়েছিলেন চেতনার মণ্ডপ থেকে আত্মরক্ষার তাগিদেই; প্রচণ্ড মার্তণ্ড তাপে মুখপোড়া হনুমান হবার বদলে তাঁরা ফিরিয়ে নিলেন তাঁদের মুখ পশ্চিমে, 'অন্য কোথা অন্য কোনো খানে'। বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাস, বিষ্ণু দে এবং অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখ এই শতাব্দীর তিরিশের দশকে যে নতুন কবিতাকালের জন্ম দিলেন তা নিঃসন্দিগ্ধভাবে য়ুরোপ-প্রভাবিত এবং অলজ্জভাবে ইংরেজী কবিতার পরিগ্রাহী। পশ্চিমের সভ্যতা, সাহিত্য, দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছিল আগে থেকে। উনিশ শতকের পূর্বার্ধের রোমান্টিক কাব্য-ধারার কুলপ্লাবী বিস্তারণের শেষ ঢেউ এসে পরিণতি পায় রবীন্দ্রনাথের কবিতায়। পশ্চিম থেকে তিনিও নিয়েছিলেন বিস্তর এবং তাঁর কবিতায় য়ুরোপীয় রোমান্টিকতার আদর্শ আশ্চর্য ফসল ফলিয়েছিল। কিন্তু য়ুরোপের সাহিত্য ভূমিতে

ততদিনে ঘটে গিয়েছিল আরেকটি বিপ্লব—সে বিপ্লব আধুনিকতাবাদের। রবীন্দ্রনাথের জন্মের চার বছর আগে ১৮৫৭ সালে বোদলেয়ারের 'লা ফ্ল্যুর দ্য ম্যল' এর প্রকাশকে প্রয়াশ চিহ্নিত করা হয় আধুনিক কবিতার জন্মক্ষণ হিসেবে। তারো আগে এডগার অ্যালান পো'র কবিতায় ছিল আগামী শস্যের বীজ। রবীন্দ্রনাথ এই আধুনিকতার স্পর্শ পাননি বা পেতে চাননি। তবে, রবীন্দ্রনাথ দুর্মরভাবে রোমান্টিক ছিলেন এবং আমাদের সাহিত্যে প্রাক-আধুনিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। কিন্তু তিরিশের কবিরা প্রত্যক্ষ আদর্শ হিসেবে রোমান্টিকতা তথা রবীন্দ্র আদর্শকে গ্রহণ করলেন না। তাঁরা গ্রহণ করলেন অ্যালান পো-বোদলেয়ার সৃজিত, ফরাসী প্রতীকবাদীদের দ্বারা চর্চিত এবং পরবর্তীকালে ইংরেজ ইমেজিস্টদের দ্বারা প্রবর্ধিত কাব্যাদর্শকে। তাই রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন ছিল সচেতন পথানুসন্ধানের ফল। তিরিশের কবিদের পথ হাতড়াতে হয়নি দীর্ঘকাল, কেননা পথ তো ততদিনে পাকা হয়ে গিয়েছে পশ্চিমে। প্রায়-সমকালীন ইংরেজী কবিতা-পুস্তক ও 'ক্রাইটেরিয়ন', 'পোয়েট্রি' প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত চালান আসতো বিশ দশকের কলকাতায়। সে সময়ের তরুণ কবিরা এদের মধ্যে খুঁজে পেলেন ভিন্ন এক বলয়ের সন্ধান, যেখানে রবি করোজ্জ্বল আশবাদের প্রতারণা নেই, অনিঃশেষ মঙ্গলালোকে পৃথিবীকে রঞ্জিত দেখার ভাবনা নেই—আছে জীবনকে নিরঞ্জন ও নির্মোহভাবে দেখার প্রণোদনা। প্রত্যক্ষ প্রেরণা হিসেবে তিরিশের কবিদের সামনে উপস্থিত হলেন টি. এস. এলিঅট, এজরা পাউণ্ড এবং অন্যান্য ইংরেজী ইমেজিণ্ট কবি। পরোক্ষভাবে বোদলেয়ার, র‍্যাঁবো, মালার্মে প্রমুখ ফরাসি প্রতীকবাদী কবিদের সৃজিত কাব্যাদর্শের আকর্ষণে প্রলুব্ধ হলেন তাঁরা। তিরীশের বিভিন্ন কবির কবিতায় এই য়ুরোপীয় কবিদের প্রভাব বিভিন্ন রূপ ও মাত্রার, তবে আধুনিকতার চেতনার প্রসারণ এবং আধুনিক কবিতার ভাবাদর্শগত ও করণ-কৌশলগত দিকটি এই সব বাঙালী কবিরা পেয়েছিলেন টি. এস. এলিয়টের কাছ থেকে।[৪] এ প্রভাব কারো কারো ক্ষেত্রে ছিল খুবই নির্মমভাবে প্রত্যক্ষ। তবে, ষাট দশকে, বাংলাদেশের কবিদের ক্ষেত্রে —বিশেষ করে আবুল হাসানের উপর টি. এস. এলিয়টের প্রভাব দেখা যায় পরোক্ষভাবে। আর এই পরোক্ষতার কারণেই আবুল হাসান তাঁর নিজস্ব স্বকীয়তা পেয়েছেন। হয়ে উঠেছেন কবিদের কবি ; যৌবনের বিষণ্নতা, নৈঃসঙ্গ্য এবং দীর্ঘশ্বাসের কবি। আমাদের

আলোচনা এগোবে মূলত আবুল হাসানের উপর টি, এস, এলিঅটের পরোক্ষ প্রভাব বিষয়ে—তুলনামূলক আলোচনায়।

ইংল্যাণ্ডের কবি টি, এস, এলিয়ট ; বাংলাদেশের আবুল হাসান সৃজনশীলতায়, সামাজিক ভূমিকায়, খ্যাতি—অখ্যাতির টানাপোড়নে, এমনকি ব্যক্তিগত জীবনে অনেক ক্ষেত্রেই এঁদের দুজনের অমিল থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিল থাকাটাই স্বাভাবিক। মিল-অমিলের এই তুলনামূলক বিচারটির গুরুত্ব বাড়ে, যখন আমরা দেখি এ' দুজনের কবিতার স্বরে, গঠনে, বয়নে ও চিন্তনে সাযুজ্য আছে। তবে, পরোক্ষ প্রভাবের ক্ষেত্রে অবশ্যই আবুল হাসান—টি, এস, এলিঅট দ্বারা প্রভাবিত। কেননা টি, এস, এলিঅটই বিংশ শতাব্দীর গতিপথকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন।

লক্ষনীয়, এলিঅট ও আবুল হাসান বেশ কিছু কবিতা লিখেছেন আত্মসমালোচনার তাগিদে, তবে এলিঅটের সংখ্যাই বোধ হয় বেশি। উভয়ের এই আত্ম সমালোচনার সুরটা প্রথম দিকে এক, যখন নিজস্ব পলায়নী রোমান্টিক মনোভাব তাদের আক্রমণের লক্ষ্য—আবুল হাসানের 'অন্তর্গত মানুষ' এবং এলিঅটের 'ইস্টকুকার' উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আবুল হাসানের কবিতায় এক ধরণের অপরাধবোধ কাজ করে—যার সুযোগ এলিঅটের মধ্যে নেই, যেহেতু এলিঅট অনেক বেশি সতর্ক পা ফেলেছেন আধ্যাত্মিকতায়।

আমি যদি বোলতে পারতাম
আমি এর কিছু নই !

এই পাথরের চোখ
পরচুলা
নকল পোশাক,
এসব আমার নয়
এসব আমার নয়, প্রভু

আমি যদি বোলতে পারতাম !
—(অন্তর্গত মানুষ ঃ রাজা যায় রাজা আসে)

এমন পীড়াদায়ক অপরাধবোধের জায়গায় আমরা এলিঅটকে দেখি আত্মশুদ্ধির জন্যে বিলাপ করতে—

I said to my soul, be still, and wait without hope
For hope would be hope for the worng thing ; wait without love
For love would be love of the wrong thing ; there is yet
But the faith and the love and the hope are all in the wating.

(EASTCOKER : FOUR QUARTETS)

নারীর ব্যাপারে এলিঅটের আগ্রহ ছিল রক্তমাংসের মানুষের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার মত, নর-নারীর সম্পর্ক তাই নানান জটিলতা নিয়ে উপস্থিত তার কবিতায়। কোনো আধ্যাত্মিক ভাববাদের কাছে, তিনি নারীকে সমর্পন করেননি, রবীন্দ্রনাথ যেমন করেছিলেন কোনো এক পর্যায়ে। ঠিক, এলিঅটের মতোই আবুল হাসানের নর-নারীরাও জটিলতা নিয়ে উপস্থিত। দৃষ্টান্ত দেয়া যাক—

তাহলে বেরিয়ে পড়ি তুমি আর আমি দুজনায়
যখন ছড়ানো সন্ধ্যা আকাশের গায়
যেনো রোগী টেবিলে শায়িত, আচ্ছন্ন ইথারে ;
চলো যাই সেই পথে জনশূন্যপ্রায় সেই দিক
যেখানে আপন মনে কথা বলে নির্জন পথিক
অশান্ত একরাতের পালা শেষ হলে শস্তা হোটেলের
এবং কাঠের গুঁড়ো ছড়ানো রেস্তোঁরায়, যেখানে জমেছে খোলা-
ভাঙ্গা ঝিনুকের
সেই পথ যা এগোয় একঘেয়ে কুতর্কের মতো,
চতুর মতলবে নিয়োজিত,
এবং যা ঠেলে নিয়োজিত,
এবং যা ঠেলে দেয় চূড়ান্ত প্রশ্নের দিকে......
জিজ্ঞাসা করো না যেন, 'সেটা কী আবার ?'
চলো যাই, এই তো সময় বেরোবার।

(টি. এস. এলিঅট ঃ জে. অ্যালফ্রেড প্রুফকের প্রেমগীতি।
অনুবাদ ঃ জগন্নাথ চক্রবর্তী)

এলিঅট যেখানে নারীকে প্রস্তাব দিচ্ছেন ভ্রমণের ; রাত্রি যাপনের এবং সেই প্রস্তাবের মধ্যে ব্যক্তি থেকে বস্তুতেও প্রতিফলন ঘটে। কিন্তু, আবুল হাসানের প্রস্তাবে ব্যক্তির অনুভূতি কেবল ব্যক্তিতেই প্রতিফলিত।

কুমারী, তোমার এই অনুভূতিময় উষ্ণ অন্ধকার ঝুলবারান্দায়

আজ বড় মেঘলা দিন
আজ বড় সুসময়
এসো হোক তোমাতে আমাতে
এখন তমসা, কোনো চাঁদ নেই
তোমার বুকের পাত্র আলো দেবে
স্পর্শ করলেই চোখে জেগে উঠবে যুগল পূর্ণিমা।

(আবুল হাসান : স্তন)

এলিঅটের কবিতায় সমসময়কে পরিবর্তিত করে তুলবার অভিপ্রায় লক্ষ্য করে অমিয় চক্রবর্তী যেমন সেই প্রবর্তনাকে 'মানসিক সংকল্প' (**Human will**) বলে উল্লেখ করেছিলেন, তেমনি আবুল হাসানের কবিতাও সময়ের সঙ্গে বোঝাপড়ার সূত্রে এগিয়ে গেছে। সত্তা স্বরূপের প্রস্থানভূমিতে। আর এলিঅটের পরোক্ষ প্রবর্তনায় তৈরি হয়েছে এরকম কিছু কবিতাংশ :

ক. এসেছিস তো কী হয়েছে? কিছুই হয়নি দ্যাখ্
ঐতো আচ্ছন্ন ঘাস, ধানী জমি, ঐতো কোমল নৌকো, ধরিত্রী
আকাশ!

এসেছিস তো কী হয়েছে? কিছুই হয়নি দ্যাখ্
ঐতো ডাকছে পাখি, জ্বলছে যৌবন, চাঁদ, ঐতো জোনাকী!

(রূপ-সনাতন)

খ. আমি আবার ফিরে এলাম, আমাকে নাও
ভাঁড়ার ঘরের নতুন মরিচ আবার মশলা পাতা গেরুয়া ছাই
আমায় তুমি গ্রহণ করো।

আমি আবার ফিরে এলাম,
স্নিগ্ধ কাক, আলাপচারী তাল চড়াই
আমাকে আজ গ্রহণ করো।

(প্রত্যাবর্তনের সময়)

গ. মৃত্যু আমাকে নেবে, জাতিসংঘ আমাকে নেবে না,

আমি তাই নিরপেক্ষ মানুষের কাছে, কবিদের সুধী সমাবেশে
আমার মৃত্যুর আগে বোলে যেতে চাই,
সুধীবৃন্দ ক্ষান্ত হোন, গোলাপ ফুলের মতো শান্ত হোন

কী লাভ যুদ্ধ করে? শত্রুতায় কী লাভ বলুন?

(জন্ম মৃত্যু জীবনযাপন)

আবুল হাসানের কবিতার প্রাণসূত্র প্রধানত কবিতার উপর কবিমনের স্বাধিকার প্রচেষ্টার সমন্বয়। এলিঅটও তর্জনী উঁচিয়ে এই আত্মসংস্থাপনের কথা বলেছিলেন ব্যক্তি—নৈর্ব্যক্তিকতার বর্গ নির্মাণ করে।[৫] এলিঅট থেকে দৃষ্টান্ত দেয়া যাক—

ক. পা আমার মুরগেটে এবং হৃদয়
পায়ের তলায় ঠিক। ঘটনা ঘটার পরক্ষণে
কেঁদেছিল। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল 'নূতনের হয়েছে সময়'
কিছুই বলিনি আমি। আপত্তি পুষিনি কোনো মনে।

(টি, এস, এলিঅট ঃ পোড়ো জমি। অনুবাদ ঃ জগন্নাথ চক্রবর্তী)

খ. জ্বলতে জ্বলতে জ্বলতে জ্বলতে
আমাকে উদ্ধার করো প্রভু
হে প্রভু উদ্ধার করো

(পূর্বোক্ত)

গ. তাই এখানে আমি, মধ্যপথে, কুড়ি বছর পার করে দিয়ে
দীর্ঘতর এই কুড়ি বছরের অপচয় ঘটেছে, যে বছর আমি
রহস্যপুরির উন্মোচন করি
সবেমাত্র দুই একটি শব্দের ব্যবহার শিখছি এবং যার
প্রতিটি পদক্ষেপই সম্পূর্ণ নতুন উন্মোচন, আর ভিন্নতর
ব্যর্থ অনুরণন।

(টি, এস, এলিয়ট ঃ ইস্টকুকার। অনুবাদ ঃ মাসুদুল হক)

বাংলা কবিতায় এলিয়টের দান নগর চেতনা এবং বিষাদ ও বিসঙ্গতির বোধ। নগর-নিসর্গের বিবিধ সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও হতাশা এলিঅটের কবিতায় ব্যাপ্ত। প্রুফ্রক প্রথম আধুনিক মানুষ এবং নাগরিক। 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' এর প্রেক্ষাপটেও এক ঘেয়েমিপূর্ণ ও বিবমিষাময় নগর-জীবন, যেখানে হায়াসিন্থ জন্মে না, যেখানে এপ্রিলও ফুল খেলবার মাস নয়, কেবলি স্মৃতি দংশনে পীড়িত লক্ষ্যহীন মানুষের ক্লান্তি ও নির্বেদ চতুর্দিকে। আধুনিক জীবনের আর্কিটাইপ এই পোড়ো জমি মূলত মানুষের মানসিক প্রতিবেশেরই প্রতিচ্ছবি।[৬] আবুল হাসান

নাগরিক জীবনের সীমাহীন ক্লান্তি ও বিষাদকে তাঁর অনেক কবিতায় মূর্ত করেছেন। এলিঅটের নগর অনুভবের সংক্রাম এসব পংক্তিতে স্পষ্ট ঃ

আমি কার কাছে যাবো? কোনদিকে যাবো?
কোন শহরের দিকে যাবো আমি? যৌবনের জ্বলন্ত শিরায় আজ
এই যে জ্বলছে চাঁদ জ্যোৎস্না, চাঁদ জ্যোৎস্না আর জ্যোৎস্নাফুল
হৃদয়ের ভিতরে ব্যাকুল
জ্বলছে এই যে স্বপ্ন, স্মৃতি, শব্দ, অলংকার
অভাবের মরীচিকা, এ শহর কার?

(আবুল হাসান ঃ দূরযাত্রা)

আবুল হাসান-এর কবিতায় কখনো কখনো এলিয়টের কবিতার পুরো স্তবকের পরোক্ষ মিল দেখতে পাওয়া যায়। উদাহরণ হিসেবে দেখানো যায় 'রাজা যায় রাজা আসে' গ্রন্থের 'স্মৃতিকথা' কবিতার নিম্নোদ্ধৃত স্তবক ঃ

রুগী তার মাতাল স্বামীর কাছে না গিয়ে নিজেই একরাতে
একে একে শূন্যতায় সলজ্জ কাপড়গুলি খুলে ফেলে কুয়াশায়
উন্মাদিনী কোথায় পালালো!
নিজস্ব ভ্রূণের হত্যা গেঁথে দিয়েছিল তাকে মানসিক হাসপাতালের
এক কোণে!
কোথায় সে? এখন কোথায়?

এর সাথে মিলিয়ে পড়া যায় **'The waste land'** এর 'সলিল-সমাধি' নামক চতুর্থ পর্বের অংশ বিশেষ ঃ

Phlebes the phonecian, a fortnight dead
Forgot the cry of gulls and the deep sea-swell
and the profit and loss.

আবুল হাসান ও টি, এস, এলিঅটের আরো বেশ কিছু কবিতার, কিছু কিছু লাইনে আশ্চর্যরকম মিল পাওয়া যায়। যেগুলো কখনো ভাবনায়, কখনো চিত্রকল্পে—একই রেখার দুই মেরুর প্রান্ত বিন্দু হিসেবে চিহ্নিত হয়ে ওঠে। দৃষ্টান্ত দেয়া যাক—

বলি তাই এসেছি তোমার কাছে ইস্পাতিনী
শুশ্রূষার সবুজ চুম্বনে আজ স্নিগ্ধ কোরে দাও তুমি এ হেন মলিন মুখ,

সামাজিক ওষ্ঠ আর অন্তরাল
গভীর গভীরতর অন্তরাল—
সেবিকা ; সেবিকা !

(আবুল হাসান ঃ ব্লেড)

কিংবা ঃ অপরাহ্ন ভরা রেলিং এ হেলান দেয়া এক সারি
সাদা কাপড়ের মতো সাদা নার্স
বুকের বাঁ পাশ থেকে অস্তগামী রোদ্দুর টলমলিয়ে উঠলো
এইমাত্র
তার সেবিকা পোশাকে।
সে এখন কী যে তার অস্তগামী দেহের পোশাকে ঠিক
বোঝা যায় না দুঃখী নার্স, সেবাকাতরতা ভরা শরীর সন্ধিতে
ক্ষয়িষ্ণু মানুষের কত মৃত্যু, আর্তচীৎকার অসুখের গ্লানি
সে অনুভব করেছে তার সহিষ্ণু সেবায় !

(আবুল হাসান ঃ সাদা পোশাকের সেবিকা)

একই বিষয় সংশ্লিষ্টতা , এমনকি স্তবকেও মিল দেখতে পাওয়া যায় এলিঅটের **'east coker'** কবিতার তৃতীয় পর্বের একটি স্তবকে।

Our only health is disease
if we obey the dying nurse
whose constant care is not to please
But to remind of our. and Adam's curse
And that, to be resfored, our sickness must grow worse.

(T. S. Eliot : EAST COKER, Four Quartets)

আরেকটি তুলনা দেখানো যাক—

মান্ধাতার আমলের এই নদী; নদীর বাতাসে ওড়া রুগ্ন গাঙচিল
সমূলে ভাঙ্গতে কে বা বসে আছে লঞ্চের কেবিনে !

(আবুল হাসান ঃ লঞ্চের কেবিনে)

টি, এস. এলিঅটে দেখা যাক—

I do not know much about gods ; but I think that the river
is a strong brown god-sullen, untamed and in tractable,

শিল্প-প্রকৃতের সারসত্তায় ; শব্দের অনুকল্প স্থাপনা, দৃশ্যের সচেতনের, অদৃশ্যতা—অচেতন—বোধসৃষ্টি ; তরঙ্গায়িত উপলব্ধির বস্তু কাঠামো

বিনির্মাণ—এসব পরীক্ষা-প্রক্রিয়া-প্রকল্পই কবিতার শরীর ও মন—এ ভাষিক শিল্পের সংস্থিতি।[৭] যেখানে অনিশ্চয়তা নিশ্চয়তার অন্তলোকে, তার সর্ববিধ বিকশিত হতে চায় হয়তো-বা **'in my beginning is my end"**—এলিঅটের বাক্যটাই বোধ হয় অনুরণন, শব্দ যোজনা এমন চেতনার বিলোড়নে। সময় (**time**) এবং স্থান (**space**) সম্পর্কে এলিঅটের ভাবনার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় আবুল হাসানের কবিতায়। দৃষ্টান্ত দেয়া যাক—

> in my beginning is my end. Now the light falls
> Across the open field, leaving the deep lane
> Shuttared with branches, dark in the afternoon
> Where you lean against a bank while a van passes.
>
> (T. S. ELIOT : EAST COKER)

ঠিক এমনি, 'কারো আদি নেই। কারো আনাদি নেই'—আবুল হাসানও মহাচৈতন্যের অনিশ্চয়তার নিশ্চয়তার অন্তর্লোকে, বাক্যের অনুরণন বিদ্ধ করেন বিশুদ্ধ শিল্প বাসনায়।

> কারো আদি নেই। কারো অনাদিও নেই!
> মর্মক্ষুব্ধ চৈতন্যের বিশুদ্ধ অগ্নির কাছে প্রত্যেকের মৃত্যুর দলিল
> ধীরে ধীরে বাজেয়াফ্ত স্বাধীনতা চুক্তির মতোন পুড়ছে!
> ধানের মতোন ঝরছে অভাবের যুবতী শরীর।
>
> (আবুল হাসান ঃ মৃত্যু, হাসপাতালে হীরক জয়ন্তী)

এলিঅটীয় কাব্যদৃষ্টিতে আবেগমুক্ত নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী কবিই সৎ কবি, আর অ-কবি বা অপদার্থ কবির পংক্তিভোজে স্থায়ী আসন তাদেরই, যাদের কাব্য-প্রেরণার মরাগাঙে কটালের বান ডাকে শুধুই আবেগ ও ব্যক্তিত্বের টানে; সচেতন এবং যত্নবান না হলে তাদের নিমজ্জন অবশ্যম্ভাবী অখ্যাতির চোরাবালিতে।[৮] পূর্বসূরী কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের বিশিষ্ট কাব্যতত্ত্বের প্রতি অনুসূরী এলিঅটের মাত্রাতিরিক্ত নির্মমতা চোখে পড়ার মতো--

The business of the poet is not to find new emotions, but to use the odinary ones and in working them up into poetry, to express felling which are not in actual emotions at all. And emotions which he has never experienced will serve his turn as well as those familiar to him. Consequantly, we must believe that 'emotion recollected in 'tranquillity' is an inexact formula. For it is neither emotion, nor recollection, nor, without distortion of meaning, tranquillity.[৯]

প্রকৃত তথ্য এই যে আবেগ এবং ব্যক্তিত্ব থেকে এলিঅটের অপসরণ বাস্তবে কাব্যিক অপসরণ, এবং তা ভিক্টোরীয় যুগের রোমান্টিক কাব্যধারা থেকেই। অধিকতর সঙ্গত অর্থে অবশ্যই তা অতিক্রমণ কিংবা উত্তরণ। আবেগ সর্বস্ব গীতিধর্মিতা থেকে আবেগ নিরপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিকতায়, মন্ময় থেকে বস্তুনিষ্ঠ ক্লাসিক ধর্মিতায়—কল্পনার রাজপুত্র আর আবেগের সৌধ সমস্ত কিছু অকপট নিস্পৃহতায় ঝেড়ে ফেলে তাঁর নায়কেরা অনায়াসে বলতে পারে—

No ! I am not prince Hamlet, nor was meat to be ;
Am an attendant lord, one that willdo,
To swell a progress, start a scene or two
Advise the prince ; no doubt, an easy tool,
deferential, glad to be of use,
politic, cautions, and meticulous ;
full of high sentence, but a bit obtuse ;
A times, in deed, almost ridiculous—
Almost, at times, the fool,

I grow old......I grow o'd......
I shall wear the bottoms of my trousers rolled.

(T. S, Eliol : Prufock)

অন্যদিকে আবুল হাসানও আবেগ সর্বস্ব গীতিধর্মিতা থেকে আবেগ নিরপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিকতায় পৌঁছে যান। কবিত্বের অতি লৌকিক অনিবার্যতায় সৃষ্টি ও স্রষ্টার কলকাঠি সঞ্চালনক্ষম নিগূঢ় ভাষা রহস্যে তার নায়কের মুখ থেকে নিসৃত করেন—এক নতুন আত্মউপলব্ধি। এ যেন এলিঅটীয় কাব্যদৃষ্টির পরোক্ষ প্রভাব, যা তাকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করে। দৃষ্টান্ত দেয়া যাক—

আসলে আমার বাবা ছিলেন নিম্নমনের মানুষ
নইলে সরকারী লোক, পুলিশ বিভাগে চাকরী কোরেও
পুলিশী মেজাজ কেন ছিল না ওনার বলুন, চলায় ও বলায়
চেয়ার থেকে ঘরোয়া ধুলো, হারিকেনের চিমনীগুলো মুছে
ফেলার মতোন তিনি
আস্তে কেন চাকর বাকর এই আমাদের প্রভু-নফর সম্পর্কটা
সরিয়ে দিতেন ?
থানার যত পেশাধারী, পুলিশ সেপাই অধীনস্থ কনেষ্টবল
সবার তিনি একবয়সী এমন ভাবে তাস দাবাতেন সারা বিকেল।

মায়ের সঙ্গে ব্যবহারটা ছিল যেমন ব্যর্থ প্রেমিক
কৃপা ভিক্ষা নিতে এসেছে নারীর কাছে।

(আবুল হাসান ঃ চামেলী হাতে নিম্নমানের মানুষ)

আবেগের প্রতি পরিপূর্ণ উপেক্ষার দৃষ্টিতে সিদ্ধ কবি এলিঅট **'Aunt Helen'** কবিতায় শবযাত্রার প্রস্তুতির পাশাপাশি জৈবিক আসঙ্গ লিপ্সার জান্তব ছবিটি স্বল্প-কথায় হলেও অর্থবহ ব্যঞ্জনায় ফুটিয়ে তুলেছেন ; বাধেনি তার কোথাও শুধুমাত্র কাব্যপ্রবণতার কারণেই।[১০]

Miss Helen Slingsly was my daiden aunt,
And lived in a small house near a fashionable square
cared for by servants to the number of four.
Now when she died there was silence in haeven
and silence at her end of the street.
The shutters were drawn and under taker wiped his feet—
He was a ware that this sort of things had occured before.
The dog were handsome Ty provided for,
But shortly afterwards the parrot died too,
The dresden clock continued ticking on the mantel piece,
and the footman sat upon the dining table
Holding the second housemaid on his knees—
Who had alway been so careful while her mistress lived,

এলিঅটের **'Aunt Helen'** এর আবুল হাসানীয় প্রতিকল্প খুঁজে পাওয়া যায় 'অসহ্য সুন্দর' কবিতায়--যেখানে গোর দেবার পাশাপাশি জৈবিক আসঙ্গ লিপ্সার জান্তব চিত্র নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে ; যেখানে শ্লেষও উপস্থিত।

যখন একটি মৃত সুন্দরীকে গোর দেওয়া হলো
হায় ভগবান, যখন সুন্দরী মৃত !

একটি একাকী চুল দেখলাম মুখে এসে নিয়েছে আশ্রয়
ক্লান্ত ভুরু, কাঁধের দুদিকে হাত যেনো দুটি দুঃখের প্রতীক।
কপালের সমস্তটা যেনো দুঃখ, চিবুকের সমস্তটা যেনো দুঃখ !
যখোন একটি মৃত সুন্দরীকে গোর দেওয়া হলো
হায় ভগবান, যখোন সুন্দরী মৃত !

তখোন মৃত্যুকে কী যে কোমল সুন্দর লাগছিলো !

মুখের সমস্তটা মুখ জুড়ে তার তখন করুণ এক মাথার রহস্য আর

শরীরের সবদিকে শেষ সুন্দরের অকস্মাৎ থমকে যাওয়া আভা !!
আর ঠোঁটের ও বিষন্ন তিলটি কী বিষন্ন দেখাচ্ছিল, কী বিষন্ন
দেখাচ্ছিল আহা

যখোন সুন্দরী মৃত যখোন সুন্দরী।

(আবুল হাসান ঃ অসহ্য সুন্দর, যে তুমি হরণ করো)

'শিল্প' কোনো অপরিবর্তনযোগ্য বিষয় নয়। এটি সংস্কৃতি এবং সভ্যতার মতোই গতিময়, ফলতঃ পরিবর্তনীয়। তার নির্যাসটুকু হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রায় একই, কিন্তু এর বাহিরের যে অলংকরণ, অন্তরের যে গীতপ্রবণতা তা বিভিন্নকালে ভিন্নভাবে কবি চেতনায় ধারণকৃত। শিল্প অভিনিবেশ ও গভীরতা দাবি করে। আপাতকালীন সে খোলস পাল্টে হালকা হলেও তার মর্মে ছড়িয়ে আছে তীক্ষ্ণতা, ঋজুতা। কালে কালে যে মৃত্যুচিহ্ন মানুষের চিন্তায়, চেতনায় গাঢ় হয়ে বসে আছে তার থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিপূর্ণ শিল্প। এক একটি আরম্ভের ঠিক জন্মের মতো যেমন শেষ আছে, ঠিক তেমনি আছে সম্ভাবনা। বিচ্ছিন্নভাবে হলেও প্রায় সব সচেতন কবি-পাঠকের কাছে আজ প্রশ্ন থাকা স্বাভাবিক হয়ে পড়েছে যে বাংলা কবিতা, হাজার বৎসর আগে যেটি শুরু হয়েছিলো চর্যাপদ, বৈষ্ণব কবিদের মাধ্যমে, মাঝখানে মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, এবং জীবনানন্দ দাসকে অতিক্রম করে কতোটুকু এগুতে পেরেছে ? এটি ঠিক যে কবিতা ব্যাপকভাবে নতুন কোনো শিল্প-সম্ভাবনা হয়ে ওঠে না বারবার [১১] তিরিশের দশকে যে এলিঅটিক রুগ্ন আধুনিকতা, চল্লিশ, পঞ্চাশ এবং ষাট দশকে-এর বিস্তার-প্রসারতা, তার থেকে বাংলা কবিতাকে মুক্ত করার বিষয়টি উপলব্ধি করেছিলেন আবুল হাসান।

অন্তরে বিশুষ্কতা, পরিণামহীন যৌনতা, অনিকেত চেতনা ও আত্মধ্বংসী স্বমেহনের দর্শন নিয়ে বাংলাদেশের ষাটের দশক কবিতা-নাম্নী এক রঙিণীর পেছনে ঘুরে মরছিলো। ঠিক ঐ সময় আবুল হাসান ঃ কবি চিন্তনে শিল্পময় কবিতার স্ফুলিঙ্গ জ্বেলে উঠে দাঁড়ান। আবুল হাসান তার একটি কবিতায় বলেছেন, "শিল্প তো নিরাশ্রয় করে না। কাউকে দুঃখ দেয় না।"—সেই একই কবিতায় তিনি কি লেখেন—

'শিল্প তো স্বাতীর বুকে মানবিক হৃৎপিণ্ড, তাই
আমি তার হৃৎপিণ্ড খাই চিরকাল রক্তে আমি
শান্তি আর শিল্পের মানুষ।[১২]

অন্যদিকে, শিল্পের পক্ষে ; কবিতার পক্ষে এলিঅটের কলম থেকেই বেরিয়ে আসে ঃ

And certainly poetry is something over and above and something quite different from a collection of psy chological data about minds of poets, or about the history of an epoch ; for we could not take It even as that unless we had already assighed to it a value merely as poetry.[১৩]

কবি সত্তাকে ধারণ করে যে জাগৃতি, অনপণেয় সেই সচেতনতা হচ্ছে অহংবোধ। হোর্হে লুই বোর্হেস তাই সহজেই চলতে পারেন নিজেকেই নিজের লেখায় প্রতিধ্বনিত করে চলেছিলেন তিনি। পরিভ্রমণও ঘটেছে স্বনিকেত লেখমালায়।[১৪] যে কোন কবিই—তার জীবন অন্তের শেষ পরিভ্রমণে ; শিল্পিত বিশ্বাস নিয়ে অহংবোধের মন্ত্র দিয়ে—রচনা করেন এফিটাফ—শেষ বাণী ব্যক্তি থেকে নৈর্ব্যক্তিকতায় গমনে। টি. এস. এলিঅট তাই লেখেন—

And all shall be well and
All manner of thing shall be well
When the tongues of fleme are in-folded
into the Crowned knot of fire
and the fire and the rose are one.

(Little gidding : four Quartets)

অন্যদিকে আবুল হাসান তাঁর এপিটাফের জন্যে লিখে যান—

ঝিনুক নীরবে সহো
ঝিনুক নীরবে সহো, ঝিনুক নীরবে সহে যাও
ভিতরে বিষের বালি, মুখ বুঁজে মুক্তা ফলাও !

(ঝিনুক নীরবে সহো ঃ পৃথক পালংক)

কিন্তু এলিঅট বা আবুল হাসানের মত কবির সামনে দিয়ে দুই দেশের কোনো প্রজন্মের কবি বা পাঠক—তাঁদের কাব্য-শিল্পের সুধা-অমৃত পাঠ না করে উপেক্ষাভরে চলে যেতে পারবে না, তাকে নতজানু হয়ে বসতেই হবে।

তথ্য নির্দেশ ঃ

১. জগন্নাথ চক্রবর্তী অনুবাদিত, টি, এস, এলিঅট এর 'পোড়ো জমি' (প্রথম প্রকাশ, নতুন দিল্লী, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৯১), পৃ. ৫

২. শামসুর রহমান-এর ভূমিকা সম্বলিত : আবুল হাসানের রচনা সমগ্র (প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, বিদ্যা প্রকাশ, ১৯৯৪), পৃ, ৭

৩. পূর্বোক্ত, পৃ, ৮

৪. খন্দকার আশরাফ হোসেন : টি, এস, এলিঅট এবং তিরিশের কবিতা (সমালোচনা, সম্পাদক : মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ, ১৯৯৮), পৃ, ৭

5. 'Tradition and the individual Talent. T. S. Eliot, selected prose, penguin Book ltd. Middlesex. reprinted 1965, P. 21-30-

৬. পূর্বোক্ত : খন্দকার আশরাফ হোসেন, পৃ, ১১

৭. নাসিমুল হক : কুড়িগ্রাম : অন্য আলো অন্য অন্ধকার (বগুড়া, 'নিসর্গ,' কবিতা সংখ্যা, ১৯৯৬) পৃ, ১৪৬

৮. এলিঅট, ইয়েটস ও বোদলেয়ার : বিনয় কুমার মাহাতো। (নন্দনতত্ত্ব—জিজ্ঞাসা, তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৪) পৃ, ৭৯

৯. 'The music of poetry,' T. S. Eliot, selected prose, penguin Book Ltd. P. 65.

১০, পূর্বোক্ত : এলিঅট, ইয়েটস ও বোদলেয়ার : বিনয় কুমার মাহাতো; পৃ, ৮০

১১. আবু সাইদ ওবায়দুল্লাহ : চেতনায় সুরধ্বনি অথবা পথে—পাওয়া আলো ('একবিংশ,' সম্পাদক : খন্দকার আশরাফ হোসেন, ১৯৯৫), পৃ. ১২৩

১২. পূর্বোক্ত, আবুল হাসানের রচনা সমগ্র, পৃ, ৮

১৩. পূর্বোক্ত, **The sacred wood, T. S. Eliot, selected prose, penguin Book Ltd. p. viii**

১৪. Preface to the 'Gold of tigers,' The book of sand. Torge luis Borges. penguin books Ltd, London, 1979, P. 98,

সহায়ক গ্রন্থ :

১. আবুল হাসান রচনা সমগ্র (প্রথম প্রকাশ' ঢাকা, বিদ্যাপ্রকাশ; ১৯৯৪)

২. Four Quartets, T. S. Eliot, (London, faberand faber)

আলোর স্ক্রীণ ঃ শব্দময় নৈঃশব্দ

কবিতা সনাতন শিল্প। জাগতিক—মহা-জাগতিক যা কিছু সুন্দর—সরলবোধ; মানুষের কুসুমিত মনের শিল্প-মাধুর্যকে উন্মীলিত করে—তা কবিতা। শিল্পীগণ যুগ-যুগান্তর ব্যাপী যে **Absolate soul** বা পরমাত্মার সন্ধানে গভীর পথ রচনা করেন—তার অন্তর্নিহিত শক্তিও হচ্ছে কাব্য বা কবিতা। সম্ভবতঃ সে গূঢ় কারণেই মানব মনের প্রতিটা সজীব কোষ গহ্বরে কবিতার ঐশী বীজ লুকায়িত। মানুষ সর্বদাই নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। কবিরা সেক্ষেত্রে অগ্রগামী। সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকে অদ্যাবধি যেসব কর্ম সম্পাদিত হয়েছে বা হচ্ছে—তার ভেতরের স্রষ্টাকে সহজেই একজন কবি বলে আখ্যায়িত করা যায়। কেননা—জগতের যা কিছু সুন্দর; তার সুন্দর রূপায়নই কবিতা। তাই আজো লোকশিল্প হতে শুরু করে যে কোনো শিল্পের অন্তরে বাস করে যে নিপুণ প্রেরণা—তা হচ্ছে কাব্যশক্তি। কবিতা মানুষকে নতুনকে গ্রহণের শক্তি যোগায়।

বাংলা কবিতার পূর্ববর্তী কালের হিসেব না করেও যদি বর্তমান সময়ের কবিতার গতি-বিধি; বৈশিষ্ট্য বা উৎকর্ষতা নিয়ে আলো-চনা করা হয়—তা হলে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে—বাংলা কবিতা তার নিজস্ব মহাসড়কে আরোহণ করে আছে। বিগত ৩০ থেকে ৭০ দশকীয় স্রোতের অবিচ্ছিন্ন ধারায় গড্ডালিকা প্রবাহের মত যেসব কবিতা রচিত হয়েছে-সে সবের অধিকাংশই যেন একই কারিগরের ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টি সামগ্রী। অবশ্য বর্তমান দশকে এসে

আশরাফ রোকন

কবিতা এক নতুন সম্ভাবনার দিকে Turn করেছে। আর চলতি দশকের তরুণ শক্তিগুলো একত্রিত হয়ে বিনির্মাণ করছে বাংলা কবিতার ভবিষ্যত ভুমি।

যে সব তরুণ কবি পুরনো কবিতা জালের মধ্য হতে স্বউদ্যোগে বেরিয়ে এসে নিজস্বতার মৌন শব্দ সংকেতে গৌরবময় করে তুলেছেন আমাদের কাব্যজগত—শিমুল আজাদ তাদেরই একজন। নিভৃতচারী এই কবি গোপনে গোপনে নিজেকে ভেঙেচুরে নির্মাণ করেন কবিতার পংক্তি। প্রকৃতি, আলো, অন্ধকার—তার কবিতায় রঙিন হয়। নিঃশর্তভাবে মেনে নেন কবি জয়-পরাজয়, বেদনা-হাস্য। আর পৃথিবীর ব্যস্ততম মোহনা হতে কুড়িয়ে নেন কবিতার সঠিক শব্দমালা। 'আলোর স্ক্রীণ'—শিমুলের কবিতার বই—যা ১৪টি কবিতা ধারণ করেছে তার গর্ভে। অনেকটা জীবনানন্দীয় Style-এ গড়ে উঠা কবিতাগুলির মধ্যে তবু একটা আলাদা দ্যোতনা আছে। ভাবের সুষম বিস্তার প্রায় প্রতিটি কবিতার অন্তর জুড়ে মৃদু-মন্দ হাওয়ার বেগে খেলা করে। নিজস্ব যত্নে গড়ে তুলেছেন কবি তার কবিতাগুলি। উপমার স্বাচ্ছন্দ আর চিত্রকল্পের নতুন উপস্থাপনা কবিতাগুলির শরীরকে মেদে স্ফীত না করে বরং আলাদা বৈভব দান করেছে।

যদিও অন্ধকার আমার একটি প্রিয় ফুল
একটি প্রিয় অনুভব শব্দঅনুষঙ্গে গন্ধে রঙে অনুপম
....

আস্তো আর কালোর মাঝখানে সেই অন্ধকার
অস্তিত্বের নির্মোহ পীড়নে থাকে।

(অর্জিত অন্ধকার)

একজন কবি সহজেই জগতের বাধা-বিপত্তির মাঝখানে নিজস্ব স্বপ্ন বুনন করে যান। নিভৃতের গহীন জানালায় বসে প্রত্যক্ষ করেন জগতের বিষম পার্থক্য সকল। অস্তিত্বের সাথে আমাদের (মানুষের) টিকে থাকার যে সংগ্রাম—তা একজন কবিকে সর্বক্ষণ দগ্ধ করে। পাওয়া—না পাওয়ার সরল ব্যাধি তাই বলে কবিকে কখনো পরাজিত করতে সক্ষম হয় না। হয়তো প্রেমের প্রতারণাও তাঁকে কোনোভাবে পরাস্ত করতে পারেনা। তাই বুঝি শিমুল আজাদ উচ্চকিত হয়ে উচ্চারণ করেন—

নারীর হৃদয় ভেঙে যেতে দেখে তার চোখে আলেয়ার
মুগ্ধ জাল বুনি অকৃপণ বিশ্বাসে...

(মুগ্ধজাল)

কিংবা,

কবিদের কণ্ঠ থেকে বাজে গান চাঁদের পাহাড়ে
বিশ্বাসের কাঁচা ঘ্রাণে ভালবাসার বিরল আবেগে
থর থর করে ওঠে গ্রহ গ্রহান্তর

(হলুদ হরষ মেখে সর্ষে ফুলেরা)

প্রাণ-অপ্রাণ, পাপ-নিষ্পাপ, ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকলকিছু একজন শিল্পীকে স্পর্শ করে যায়। শিমুল আজাদও সে সবের চেনা-অচেনা রূপের সন্ধানে বসে থাকেন পৃথিবীর নাগালে। হয়তো কোনো আলোকিত ডানার খোঁজে তার বিহ্বলতা কখনো কখনো তাকে স্বপ্নাচ্ছন্ন করে। ভোরের নরোম স্নিগ্ধতার মত তারও হৃদয়ে খেলে যায় পরাবাস্তব রাতের ছবি। কবি তাই বলে ওঠেন—

আজো এক ধূসর রাতের ছবি ভেসে ওঠে প্রাণে
বন্ধ দরোজার কাছে চুপচাপ দাঁড়িয়েছি...

(আতংকময় গ্রাস)

এ যেন নিজেকে ভাঙার আগের পূর্বশর্ত। যে ভাবে মহতেরা নিজেদের মনে নিজেরাই অচেনা কেউ হয়ে যান, হারিয়ে হারিয়ে খোঁজেন অমল সূতিকাগৃহ—শিমুল তাদেরই একজন। অন্তর্গত পৌরুষের টানা পোড়েনে সর্বদাই সে প্রত্যন্ত ছায়া ফেলে একাকী যাত্রার পথে—যা তাকে রত্নময়, ঐশ্বর্যময় করে তোলে। তারই ইঙ্গিত—

এভাবে সারাটা পথ নিবেদিত জ্যোৎস্নার ভীড়ে
উড়ে যাই কালাতীত আকাশের নীড়ে।

(নিবেদিত জ্যোৎস্নার ভীড়ে)

পরিবেশের অসামঞ্জস্য অন্যান্য কবিদের মত শিমুল আজাদের বোধের অ্যান্টেনাতেও আঘাত হানে। স্বপ্নময় ভবিষ্যতের আশায় আজাদ খুঁজে ফেরেন এক নতুন সুষমা; যা তাকে পুনর্বার জাগিয়ে তোলে। চারপাশে জমাট অবক্ষয় শিমুলের আত্মার বারুদকে শানিত করে। অপেক্ষার বাতাসে বসে তাই তিনি বলেন—

আফ্রিকার তেজদীপ্ত সূর্যের আশায়
চোখ মেলে ঘাস মেখে শুয়ে আছি
দিগন্ত দিশারী ছায়ার মতন

(ছায়ার মতন)

কিংবা

রেঁনেসাসের স্বপ্নময়তা ছুঁয়ে আছে চোখ
অন্ধকারের বিনাশ দেখবে বলে
(ছাব্বিশে মার্চ সাতানব্বই)

কবিতা কখনোই ভূয়োদর্শন নয়। কবিরা কখনোই অহেতুক চিন্তার ক্ষয় করেন না। 'আলোর স্ক্রীণ' আমাদের সম্ভাবনাময় কাব্য জগতের এক উজ্জ্বল সদস্য-এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। কেননা, যে সব বাজারি—সাহিত্য পণ্যে ইদানিং বাজার ছেয়ে আছে সে সবের সাথে কোনো ভাবেই এর তুলনা চলে না। কবিতা যেভাবে মানব মনের অন্তিম প্রদেশে প্রবেশ করে আলোর মাছির মত গুঞ্জরণ তোলে—'আলোর স্ক্রীণ'—সে সব গুনাবলীকে নিজ অঙ্গে ধারণ করে বেঁচে থাকবে।

চারপাশে বিরাজমান অন্ধকারকে বিদূরিত করে শব্দময় সংকেতে 'আলোর স্ক্রীণ' দাঁড়াবে এসে সকলের মাঝখানে; আরো আলোর দহনে উদ্ভাসিত হবে সকলের মুখ—এ প্রত্যাশাই যৌক্তিক।

পরিশিষ্ট

শিমুল আজাদ-এর এই সময়ের কবিতা

চোখহীন চোখে

নিজেকে ছিঁড়বার আগে আর একবার আয়নায় মুখ রাখি
দেখি চোখের গভীরে কত নীল হলুদ হয়েছে
ওষ্ঠদ্বয় গোলাপ থেকে কালোকাঠ
পুরাতন ক্ষয়ে যাওয়া দরোজার হাহা শূন্যতা

চুলের শরীর ফেটে যায়
নিরপরাধ নিঃশ্বাসগুলো রাখে ছাপ কাঁচের কুয়াশায়

নিজেকে খুড়বার আগে আর একবার নামি কবর খননে
হাতের আঙুলেরা শাবল কোদাল ছুঁয়ে ঘাসে
পায়ের পাতারা মেলে মাটির কণায়
রক্তাক্ত এই দুটি পা চলেনা ফেরেনা আর পথের পললে
প্রিয় প্রাণের স্পর্শগুলি ছোঁয় বিষন্ন বন্ধনে
প্রিয়পথ প্রিয়ঘর প্রিয়চোখ গুলি আর একবার দেখি পরপর কাঁচের আয়নায়

এখন নিজেকে নিজেই থামাই চোখহীন চোখে

অবশেষে মৃত্যুর দেহে

একটি বানর একটি বানরী নিয়ে থাকে সাথে থাকে দুই মেয়ে
সময় এবং অসময়ে লোকেরা আসে তারা দেখে অবাক এক জীবের আদল
তারা পাশে আসে হাসে গান গায় শিটি দ্যায়
কেউ বা হাতের কাছে যা পায় ছুঁড়ে মারে বিকৃত বমন
কেউ বা কুড়িয়ে ইট লাঠি ভাঙে
আঘাতে খুঁচিয়ে রাগিয়ে ওদের আনন্দ যতন ভেসে ওঠে

উদ্যানে ভ্রমণ বিলাসী মানুষেরা কী চায় কী বা পায়
সবুজ সড়ক ভেঙে পীচ ঢালা কালো পথ
কর্কশ ধাতব বোধে এ স্নিগ্ধতায় কালিমায় গড়ে
তাদের আসা আর যাওয়া যুবকের চোখ উদ্বিগ্ন থাকে
যুবতীর ঘ্রাণ যুবতীরা রঙ মেখে সুগন্ধী আতর মুড়ে
ডুবে যায় সকাল দুপুর পেরিয়ে বিকেলের পরমা ছোঁয়ায়
সন্ধ্যার নিবু নিবু রঙ এলোমেলো হাওয়ায়

বানরীর খেয়াল হলো চিমটি কাটবার
মেয়ে দুটি হলো ইচ্ছে লাফাবার
বানরটির বাদাম খাবার

আর আমার স্মরণে এলো মানুষের আদি পুরুষ কিছু অভিশপ্ত হয়েছিল
শনিবারের সীমা লঙ্ঘন করে হয়েছিল বানর প্রজাতি
অবশেষে সাতদিন অতিক্রান্ত হলে মৃত্যুর দেহে রেখেছিল পা

পবিত্র পিতার দরবারে আমরা তিনজন

একটানে খসে গ্যালো যাবতীয় ধারা
ভিতরের ভিন্নতর রূপে গড়িয়ে নিলাম মুহূর্তের উল্লাস মুকুট
প্রথমে দুজন তারপর তৃতীয় ব্যক্তির ঘরে ঝুঁকে ছুটলাম দুস্তর ব্যবধান
দ্যাখা হলো গভীরে আন্তরিক মুগ্ধতায়

ধূয়া ছাড়ছি কেবলি ধূয়া ছাড়ছি
বিবেকের তীক্ষ্ণ তরবারী ছুঁয়ে ফুসে নামি যুদ্ধক্ষেত্রে বীরযোদ্ধা
বাইবেলে হাত রেখে তৃতীয় বন্ধুটি বিস্মিত হলেন
গতানুগতিক চিন্তাধারা রেখে সম্পূর্ণ ভিন্নতা পোষণ করলেন

কি বললেন বিজ্ঞান দর্শন চলচ্চিত্র প্রসঙ্গ পলল
দর্শনের জিজ্ঞাসা খুলে দিতে প্রথম ব্যক্তিটি নতজানু
দ্বিতীয় ব্যক্তিটি নিরুত্তাপ ভঙ্গি রেখে উৎকন্ঠিত শূন্যতায়

পাতার পাতারা উড়ছে সম্মুখ দরোজা থেকে ছুটে আসছে ঋতুময়
হাওয়া
বর্ষণের বুভুক্ষতা আঁচ করতে কোন কালে এসে দাঁড়ায়নি দরোজায়
বলেনি বন্ধুরা ক্যানো বাজে কাজে মূল্যবানতা হারাচ্ছো

তৃতীয় ব্যক্তিটি পেন্সিল তুললেন আঁকলেন নিঃশব্দ যতন
ক্ষরণের ডালপালা ভেঙে আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেক পৃথিবীর কেন্দ্রে
হাঁটু গেড়ে বসে
পবিত্র পিতার দরবারে দাঁড়াতে পারছি না
উচ্চকিত কণ্ঠে জানাতে পারছিনা পিতা ক্যানো ক্যানো কী কারণ
পিতা হাসছেন পবিত্র পৃষ্ঠায় শাদা মুক্তদানা ছড়িয়ে পড়ছে
তিনি হাসছেন অদ্ভুত উদগীরণ

ঘটনারা ঘটে যাচ্ছে নিঃশব্দের নৈঃশব্দ শরীরে

তবু এগিয়েছে জ্ঞান

শেখানো বুলির কোন শক্তি নেই স্পর্ধা নেই থাকেনা সাহস
খণ্ডকালীন আওয়াজ নিয়ে যে কেবল
উচ্চকিত হতে পারে
আন্দোলিত হতে পারে
হতে পারে মূর্তমান কোন প্রকাশিত আলো

গোলাকার বৃত্তকে ঘিরেছে জ্ঞান মেধার সঞ্চার
লাখ লাখ বছরের অভিজ্ঞতা ঘিরে সভ্যতার সাজে ভিড়েছে মিথ্যের
উড়ন্ত জাহাজ
শেষ শূন্যতার নীল পারাপার

মোহর সিলের স্তব্ধতায় অন্ধজন কেবলি আগাছা হয়ে বাড়ে
সন্ধ্যার শিশির মেখে আত্মগ্লানি সামনে দাঁড়ায় একমুঠো ধূলো
তখন পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা বাড়তে থাকে আয়তনে ওজনের ঘর ভারী হয়
ফাঁকে থাকে বোধে মেধায় মননে কাজে
তবু এগিয়ে চলেছে জ্ঞান প্রজ্ঞাদের দ্রুততম সারি

স্মৃতি কাহিনী

স্মৃতি খুলে দেখি শৈশব দাঁড়িয়ে আছে ক্লান্তির কান্না জুড়ে যৌবন
স্মৃতি এভাবে দাঁড়িয়ে থাকে অনন্তময়
স্মৃতি ছোটে বিস্তির্ণ বিহ্বল সবুজ জ্যোৎস্না অবধি
স্মৃতি জমে থাকে শিশিরে ঘাসের শরীরে
সন্ধ্যা কীর্তন খোলা ধানসিঁড়ি নদীর তীরে
বনজ্যোৎস্নার নির্মল নিবেদিত ভিড়ে

স্মৃতি রূপসী নারীর চোখে উজ্জ্বল প্রভায় জড়িয়ে থাকে অদ্ভুত বিকেল
গরবিনী যুবতীর শরীর আঁকড়ে থাকে ঢেকে রাখে এক একটা সকাল
তীর্যক ভ্রূকুটি হেনে এক ঝাঁক কৌতুহলী বালিকার সীমানায়
স্বপ্ন আর জাগরণে স্নিগ্ধ বাগান হয়ে যায়

স্মৃতি নির্মম প্রহর হয়ে দাগ কাটে হারায়
চৌকাঠ পেরিয়ে সড়কের দ্রুতযান মেখে
দূরতম শহরের বাসিন্দা হয়ে দেখি শুনি বুঝি পালায়

স্মৃতি শৈশব যৌবন বার্ধক্যের চুম্বক পাহাড়
আকর্ষণে
মাদকে
শক্তিতে
কেবলই জড়িয়ে গড়িয়ে রাখে সবকটা শবাধার

শেকলে বেঁধেছে সব অদৃশ্য বন্ধন দেহে মনে পরিবেশে হীরক অদৃশ্য
জুড়ে অন্ধ করতালি
খলখলিয়ে হেসেছে ঘৃণ্য দাস ব্যবসায়ী

মোহন মাদকে ডুবে দেহ পশারীনি থরে থরে কাঁপে বুক নাভীজল যে
অলকা নন্দিনী

হাহাকারে জ্বরতপ্ত ঠোঁট মুখ ঘেমে ঘেমে জমে পিরামিড ভীত
মহামান্য ঈশ্বরের দূত প্রেরিত পুরুষ জীব্রাইল আনে নাকো বাণী
মাঝে মাঝে অনুভবে দেখি ডানাওলা পরী উড়ে উড়ে যায় নেচে নেচে
গায়
দগদগে ঘায়ে আমরা তৃতীয় বিশ্বের জীব জীবনের মহাময় আরতী
শুনিনি

নতমুখি রূপশালী নদী ঘাটে ভৈরবের তীর ঘেসে পর্তুগীজ
জলদস্যুদের ছায়া
জন্মের ঋণেতে ভিজে সব সর শিহরণে পুরুষেরা নারীগণ সূর্যরোদে
পোড়ে
রুগ্নবোধে রুগ্নপ্রাণে বন্দীত্ব দাসত্ব তীব্রতর হতে থাকে
লকলকে জিহবারা ছোঁয় প্রাণ মিশমিশে কালো রাত বাঁধে খরার দুপুর

ইহাদের বিবেক বুদ্ধের মতো সাজে ভান করে
সক্রেটিসের দর্শন জাগে তাহাদের শিল্পে বিজ্ঞানে সৃষ্টিতে
লালনের আধ্যাত্মবাদেতে ডোবে কবি রবীন্দ্র মানস
মহম্মদ যীশু বুদ্ধদেব আর মহাদেব উড়ে উড়ে ডাকে আমাদের তৃতীয়
বিশ্বের প্রাণ

শরীফ শাহরিয়ার -এর দুঃস্বপ্নের ছায়াশব্দ এবং শোয়েব শাদাব -এর অশেষস্তর প্রযুগ ঃ একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ

আলোচক
শিমুল মাহমুদ

সংস্কৃত আলঙ্কারিক আনন্দবর্ধন তাঁর ধ্বন্যালোক গ্রন্থে বলেছেনঃ সরস্বতী স্বাদু অদর্থবস্তু নিঃষ্যন্দমানা মহতাং কবীনাম্। আলোকসামান্যমভিব্যনক্তি পরিস্ফুরন্তং প্রতিভাবিশেষম্ ॥—সেই ধ্বনিরূপা ভারতী বা প্রতীয়মান অর্থ মহাকবিদের সাহিত্য কর্ম থেকে নিঃসৃত হয়ে মহাকবিদের প্রতি-ভাকে উন্মোচন করে থাকে। এ শ্রেণীর প্রতিভা হতে সৃষ্ট কাব্যকে যতবার পড়া যায়, যে সময়ে পড়া যায় সবসময়েই তা নতুন প্রতিভা নিয়ে প্রকাশ লাভ করে। কেননা কবির কবিকর্মই হচ্ছে যথার্থ রমণ-যোগ্য উপাদান। এই রমণযোগ্য উপাদান সকলের জন্য উপযুক্ত কিনা। এ প্রসঙ্গে রাজশেখর চার শ্রেণীর কাব্য রসিক, সমা-লোচক ও পাঠকের কথা বলেছেন--অরোচকী, সতৃণাভ্যবহারী, মৎসরী ও তত্ত্বাভিনিবেশী। এদের মধ্যে সতৃণাভ্যবহারী পাঠক কোন কিছু বিবেচনায় না এনে ভাল মন্দ পাঠ্য অপাঠ্য কুপাঠ্য অন্ধের মত পড়ে ফেলে। কিন্তু বাকি তিন শ্রেণীর পাঠককে তৃপ্তি দেওয়া কঠিন, তারা কিছুতেই খুশী হতে চায় না। এক সময় এই তিন শ্রেণীর পাঠক সংখ্যা ছিল বেশী এবং এদের ভাললাগা ও মন্দ লাগার ওপর সাহিত্য কর্মের ভাগ্য নির্ভর করত। মহাকবি, নাট্যকার সবার দৃষ্টি ছিল এসব বিদ্বজ্জনদের খুশী করে কবিকুলে নিজের স্থান স্থায়ি করে নেওয়া। সভ্যতার আধুনিক রূপান্তর ঘটে গেছে ইতিমধ্যে অনেকটা অথচ জ্ঞানরাজ্যে ঘটেছে এর বিপরীত ঘটনা। এখন মাত্র এক শ্রেণীর নির্বোধ পাঠকের স্থান

অর্থাৎ উল্লেখিত সতৃণাভ্যবহারী পাঠকের স্থান দখল করে নিয়েছে সংখ্যা গরিষ্ঠ পাঠক শ্রেণী, সাহিত্য রসবোদ্ধা ও সমালোচক শ্রেণী। বাদবাকি তিন শ্রেণীর বিদ্বজ্জনের সংখ্যা এখন লঘিষ্ঠ অবস্থায় বিরাজ করছে। অথচ এই শ্রেণীর বিদ্বৎপাঠক ও সমালোচকদের কথা যেমন ভাবে কবি কালিদাস চিন্তা করেছেন তেমনি কালিদাসের পরবর্তী যুগের কবিগণও এ বিষয়টির গুরুত্ব দিয়েছেন। ভট্টি মহাকাব্যের শেষে এ সম্পর্কে ভট্টিকবি বলেছেন: ব্যাখ্যাগম্যমিদং কাব্যমুৎসবঃ সুধিয়ামলম্। হতা দুর্মেধসশ্চাস্মিন্ বিদ্বৎপ্রিয়তা ময়া॥—অর্থাৎ আমার কাব্যকে ব্যাখ্যার সাহায্যে উপলব্ধিতে আনতে হবে। আমার কাব্য প্রকৃত বিদ্বানের জন্য উৎসব-স্বরূপ আর মেধাহীন নির্বোধ দুষ্টবুদ্ধিদের জন্য দুর্বোধ্য।

কাব্যার্থযোনি বা কাব্যের উদ্ভব কোন্ কোন্ বিষয়কে আশ্রয় করে হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে রাজশেখর-এর মতে: শ্রুতি, স্মৃতি ইতিহাসঃ, পুরাণং, প্রমাণবিদ্যা, সময়বিদ্যা রাজসিদ্ধান্তত্রয়ী, লোকো, বিরচনা, প্রকীর্ণকংচ কাব্যার্থানাং যোনয়ঃ ইত্যাচার্য্যাঃ। ভামহ তাঁর কাব্যালঙ্কারে যা বলেছেন তার বাংলা অর্থ করলে দাঁড়ায়, এমন কোন শব্দ, এমন কোন ন্যায় অর্থাৎ কলা নাই যা কাব্যে প্রকাশ পায় না। কাব্যের অঙ্গ হতে পারে না এমন কোন বিষয় নাই।

কবি শোয়েব শাদাব-এর কবিতার বিষয় বৈচিত্র্যে অবগাহন যেন এক পার্থিব-অপার্থিব বৈভব ও দ্বন্দ্বের উদ্ভাসন। আদিম চিত্রকলা, গুহাচিত্র, আদিম মানব সমাজ, লোকগীতি, ঈশ্বরের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব, চিতাকাঠ, অযোনিজ; নষ্ট দ্রাখিমা, দেবদূত, প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকূপ, সাপ; ময়ূর, ছায়াবান বুদ্ধের মত অশ্বত্থ বৃক্ষ, সন্ন্যাসী, নিয়তির পরাস্ত রাবণ, জন্মান্তরবাদ, বোধিবৃক্ষের ফল, হেডিসের তীরে সূর্য ডোবা, নক্ষত্র, লাভা, তুলসীতলা, প্রত্নতত্ত্ব, শ্মশান, শবগাড়ী, জলোচ্ছ্বাস, সমুদ্র-মৎস, বেড়াল, কালোবাঘ, অজগর, প্রজ্ঞা-মনীষা, সঙ্গম, এক দ্রৌপদী আর পাঁচ পাণ্ডব, নন্দনতত্ত্ব, হ্রেষা, ভাগ্যদেবী, নীল ঈগল, প্রেতচারী, অশ্বমেধ, অশ্বলিঙ্গ, মাধ্যাকর্ষণ, সূর্যগ্রহণ, জেব্রা ক্রসিং, ডাকিনী, যমদূত, পাহাড়, হিমবাহ, সিংহের ছাল, বল্লম, সমুদ্রের নীল শৈবাল, নিঃসঙ্গতা, ঈশ্বরহীনতা, সৌররাজ্য, এস্কিমো, শিকার, ক্যাকটাস অরণ্য, মন্দির, গীর্জা, আঙুর গুচ্ছ, গাণ্ডীবের তীর ও ধনুক, অতীত পরিব্রাজক, কস্তুরী-ঘ্রাণ, চার্বাক দর্শন পুরাণ, প্রস্তর যুগ, বন্দর সভ্যতা, চর্বির প্রদীপ, মৎস-শিকারীর হাড়ের হার্পুন, শিঙের

গাইতি, হাতির দাঁতের হাতিয়ার, মমি রহস্য এবং অবশেষে পরাজিত মৃত্যু রহস্য—এই সব কিছুই শোয়েব-এর কাব্যের বিষয়বস্তু। যার মধ্য দিয়ে ক্রমাগত উন্মোচিত হয়েছে সৃষ্টি রহস্য তথা সভ্যতার ক্রমাগ্রসতার রহস্য। ইতিহাস ও অধিবিদ্যা শোয়েব-এর প্রধান অবলম্বন হলেও শোয়েব ঐতিহ্যগত সত্যে স্থিতিলাভ করেছে। ফলে কবি বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে অধিবিদ্যার রহস্যে গুলিয়ে ফেলেননি।

কবি শরীফ শাহরিয়ার-এর দুঃস্বপ্নের ছায়াশব্দ কোন্ অর্থে দুঃস্বপ্ন? এই দুঃস্বপ্নের শব্দাবলী কোন্ কোন্ বিষয় ব্যাপ্তিতে এসে অর্থময় বৈচিত্র্যে বৈভব লাভ করেছে?—শাহরিয়ার-এর কবিতায় স্থান লাভ করেছে ব্যক্তিচেতনা। এই ব্যক্তিচেতনা জ্ঞানে ও প্রজ্ঞায় দ্বিধান্বিত এবং নিঃসঙ্গ। যা আধুনিক যুগযন্ত্রণার অনিবার্য ফলাফল। বেকারত্ব ও অচল টাকার বাস্তব চিত্র উন্মোচনের মধ্য দিয়ে কবি প্রতীকী তাৎপর্যের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন যা উন্মোচিত করেছে অন্তর দ্বন্দ্বের প্রকৃত রহস্যকে। কবির কবিতার বিষয়বস্তু মরা বালুপথ, মরা নদী; শামুকের কান্না যারা সকলেই ব্যক্তিক সত্তায় স্থির। রহস্যময় অচিন কাঁটার ক্রমাগত দংশন থেকে কবির মুক্তি নাই। ফলে গেরুয়া বৈষ্ণবীর সন্ধানে কবি মাতাল। পরিণতিতে কবির পাথর-প্রবণ মন বুকের পাঁজরে ত্রিশূল ধারণ করে, যাবতীয় অসঙ্গতির হোমাগ্নি জ্বেলে থিতু হয়ে বসে থাকেন কবি কোন এক কাঙ্ক্ষিত ষ্টেশনের সন্ধানে। কবি শুনতে পান দূরে কোথাও মন্দিরা বাজে একটানা, শিউলী ঝরছে নগরের পাণ্ডুর জ্যোৎস্নায়, বিচ্ছেদের গান ঠোঁটে গেঁথে দূর রূপকথার টানে ভেসে যায় পরিচিত ছায়ারা সবাই, লাল ক্ষুধা, আত্মার রক্তপাতে চন্দ্রোদয়, বিশ শতকের ভাঙ্গা আয়না, আত্মপরিচয়, সিগারেট সেবন এবং শীতের রাত, ফুলহীন শহরের রক্তাক্ত পাথর, নন্দনতত্ত্ব ও বাস্তবতা, স্তব্ধতার সঙ্গীতে মূর্তিমান বৃক্ষ, স্রোতশূন্য নদী, যুদ্ধ, পিতার ব্যর্থতা অথচ পাখিদের কি অদ্ভ উল্লাস, এ দিকে জীবিকার প্রয়োজনে রাতের আগমনে রমণীর খোঁপাখুলে দেওয়া, আর গ্লাসে জমে উঠে বিন্দু বিন্দু বিষন্ন জলের কণা, বিষন্নতার মর্মর গান, এই গান ব্যক্তিবাদী যন্ত্রণার সুরে সুরে বুকের গভীরে কম্পন তোলে, বাইরের জলবায়ু গ্রাস করবে এই সংশয়ে শামুক-এর মত প্রতিটি ব্যক্তি মানুষ সকলের কাছ থেকে বিচ্ছেদ রেখা টেনে রাখে, ডুবে থাকে আত্মগত অলংকারে অহম্-এর গভীরে—এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বোধ-এর রহস্য উন্মোচনে কবি

শরীফ শাহরিয়ার-এর কবিসত্তা জর্জরিত। বস্তুতঃ এখানেই অধুনা সভ্যতার ট্র্যাজিক সুর প্রোথিত। যা সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন কবি শরীফ শাহরিয়ার। ফলে কবির 'আত্মচরিত' পাঠে পাওয়া যায় ঃ

হে ক্লান্ত কুকুর—আমার আত্মার একমাত্র প্রতিনিধি
জানি, আরো কিছু দিন তুমি সমগ্র দায়বদ্ধতার ভিতর
জিহ্বার জিয়ন কাঠিতে চেটে নেবে
জরাবদ্ধ সময়ের অসুস্থতা—রক্ত কল্লোলে ভেসে থাকা
ছেঁড়া টুকরো গানের
উত্থান
পতন
ব্যক্তিগত বিষাদের কালো ভূমি।

নতিবাচক দৃষ্টিতে কবি পরিচিত সকালের দরজায় শুধুমাত্র টিক-টিকির কঙ্কাল দেখতে পান। দুঃস্বপ্নের অতল জল-সংসারে কবি গড়িয়ে যান নিরাশ্রয়ী মাছের মত একলা সাঁতারে। গায়ে মেঘের শার্ট জড়িয়ে কবি আত্ম-হত্যার দৃশ্য অবলোকন করেন। আবিষ্কার করেন মধ্যরাত্রির রেস্তোরাতে নিরাসক্ত চামচ, উবু হয়ে থাকা কাচের গ্লাস আর ক্যাশবাক্সের উপর ফুটে থাকা একখানা শাপলা-সিঁকি। পূর্বপুরুষের ক্ষয়িষ্ণু পদলিপি, চিতার আগুন, অষ্টাদশী চাঁদের রাতে প্রভুর গুণকীর্তন, বনৌষধির লতা, জ্যোৎস্নার জল ও কাদা, মাটির পুতুল ও কুমোরের দীনতা, খেয়া-মাঝির কঙ্কাল, যুগল ফসিল, হিমযুগ, নির্বাণ, অগ্নিমুখ, ছুটে যাওয়া দূরন্ত চিতা আর ঝিঁঝির ক্রন্দন সবকিছু শাহরিয়ার-এর প্রতীকের আড়ালে আড়ালে জীবন্ত ছবি হয়ে যেন কথা বলতে থাকে। তারপর রক্তের ভিতর বয়ে চলে শুধুই নোনা স্রোত—

তারপর জানিনা কিছুই
শুধু জানি যে অন্ধ সহিস
তার স্মৃতিময় ঘোড়ার ক্ষুর ধ্বনি
আজো শুনে যায় ঘুমাচ্ছন্ন ঘোরের পাতালে

ঋণগ্রস্ত কৃষকের অফুরন্ত গান, পাতার অন্তর্গত ক্রন্দন, টুকরো কাচের করুণ কম্পন, আত্মমগ্ন বোধের ছুঁয়ে দেয়া বিন্দু হলুদ ঘড়ি, দূর গহনের গান অথবা মৃতদেহের মধ্যে কবি সত্তার প্রজ্ঞাগত বিকাশ ঃ

তোমার সংবাদ বাহক হবে বেশ কিছু মাছি
চোখের জমিন যেন ম্লান হলুদাভ পাতা
পিঁপড়ের ঠোঁটে হেঁটে যাবে বিবরের কাছাকাছি
হৃদয়ের শব্দ-কল্প শুনবে শুধু ঝুরঝুরে মাটি।

কবি শরীফ শাহরিয়ার-এর জন্ম; ১৯৬৪-এর ৯মে; টাঙ্গাইল। কবির স্বগতোক্তি : "ভাবনাগুলি টুকরো কাচের মত ছড়িয়ে যায়। আর ভাবনার সেই খন্ড কাচের গ্রন্থণার নীরব প্রয়াস,—বোধের গহনে জাগায় রক্তাক্ত অনুরণন। বোধগুলি পাখির বিচ্ছিন্ন পালকের মতো মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে; সঙ্গে জড়িয়ে যায় সময়ের জটিল বিন্যাস—আর উন্মূল হাওয়ায় থাকে তার প্রচ্ছন্ন সম্মিলন। ক্রমাগত শব্দ আর ছায়া দিয়ে যে চেতনার নির্মাণ—তা অসম্পূর্ণের ব্যর্থতায় ক্রমশঃ গড়িয়ে যায় শুধু দুঃস্বপ্নের দিকে……"

কাব্য বিশ্লেষণ ও

জাক দেরিদা-র Deconstruction

শিল্পের সমালোচনা প্রায় ক্ষেত্রে সমালোচনার জন্যই করতে হয়, প্রকৃত সত্য তা থেকে অনেক দূরে সরে থাকে। পদ্ধতিগতভাবে অগ্রসর হতে গিয়ে তাকে কৃত্রিম অলঙ্কারে শোভনীয় করে তুলতে হয়। এক্ষেত্রে ভণিতা ও ভণ্ডামীর ঢাক-ঢোল প্রায়ই থাকে। একাডেমীক শিক্ষার প্রথাগত কেতাবী পাণ্ডিত্যের অহমিকায় বস্তুনিষ্ঠ সমসাময়িক সমালোচনা প্রায়ই সম্ভব হয় না। অথচ ফ্রানজ্ কাফকা বলতেন, শিল্প ধর্মের মত, শিল্প প্রার্থনার মত।—এই প্রার্থনা উপযুক্ত শিল্পকে আলোচনায় আনতে হলে কতখানি প্রজ্ঞা, দিব্যদৃষ্টি ও সততা থাকা উচিত তা বোধ করি একজন শিল্পীর কাছে যতটা বোধগম্য ততটা নয় সাধারণ পাঠকশ্রেণী ও পুঁথিগত বিদ্যার অহংকারে স্ফিত পণ্ডিত বর্গের নিকট। পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা বেশী যন্ত্রণা ভোগ করে থাকেন প্রথমতঃ নবীগণ, দ্বিতীয়তঃ কবিগণ। কিন্তু এই শ্রেণীর মহৎ মানুষ সভ্যতার ইতিহাসে **Old man of the sea**-এর মত কখনোই পরাজিত হন না।

প্রতিটি শিল্পীর জীবনে শিল্পের বাইরেও এমন মহৎ ঘটনা বা কাহিনীর ঐশ্বর্য থাকে যা শিল্পকে অতিক্রম করে যায়। শিল্পীর

চিরন্তন যন্ত্রণা এই শিল্প অতিরিক্ত ঘটনার মর্মার্থকে অংকন করার মধ্যেই প্রোথিত থাকে। যা থেকে একজন প্রকৃত শিল্পীর মুক্তি নাই। এই মুক্তি যন্ত্রণা কবি শোয়েব শাদাব-এর কবিতায় কিভাবে স্ফূর্তি লাভ করেছে, দেখা যেতে পারেঃ

ক) নষ্ট দ্রাঘিমায় এসে গেছি হে দেবদূত।

খ) রক্তের গভীরে যেন ঘাই মারে বিষধর শিং।

—(স্বগতোক্তি)

গ) বোধিবৃক্ষের ফল খেয়ে হলে স্বর্গ-তাড়িত—(কাঠের ঘোড়া)

ঘ) চিতার ভস্মের তলে অনন্তের উষ্ণতা পোহায়

—(বেড়াল)

ঙ) আমিও গোপন করে কদাকার দীর্ঘ এক লেজ
আড়ালে আড়ালে চলি, সম্ভবত ডানায় ডানায়

—(মাধ্যাকর্ষণ)

চ) আমি সেই রথাশ্বের নিষ্পেষিত ইতিহাস।
আমাদের মৃত্যু হবে নাস্তিকের মতো।

—(দেয়াল ছবি)

মানব জীবনের অনিবার্য ভয়ানক গ্লানিবোধ ও আত্ম-দহন থেকে অহংবোধের উন্মেষ যা প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকূপ থেকে স্তব্ধ পরাধীনতায় গিয়ে তরল মৃত্যুতে পরিণতি লাভ করে,—এখানেই শোয়েব-এর শিল্পী সত্তার চিরন্তন দহন রহস্য লুক্কায়িত। কবির স্বগতোক্তির মধ্য দিয়ে এই যে সত্তাগত অস্তিত্বের উন্মোচন যা কিনা একমাত্র প্রতিভাধর প্রজ্ঞাশীল শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। এক্ষেত্রে কবির আত্মপরিচয়ের সাথে যোগ হয়েছে কবির ঐতিহ্য চেতনা। যে ঐতিহ্য চেতনা শেষ পর্যন্ত—

হাতের কলম দড়ি ছিঁড়ে
সাপ, হয়ে যায়
সাপ, ময়ূর।

—(স্বগতোক্তি)

শৃঙ্খল মুক্তির হাতিয়ার কবির কলম প্রথমে সাপের প্রতীকের মধ্য দিয়ে ময়ূরে এসে নান্দনিক ব্যঞ্জনা ও ইতিবাচক অর্থদ্যোতনা সৃষ্টি করেছে।

মহৎ জ্ঞানই শিল্পকে বাচিয়ে রাখে। এই মহৎ জ্ঞান হচ্ছে এমন গুণ যা বর্তমান; অতীত ও ভবিষ্যৎকে একত্রে গাঁথে। মানুষের জীবনের গভীরতা থেকে উঠে আসে এই উপলব্ধি। যা প্রকৃত কাব্যের, প্রকৃত শিল্পের কৃৎকৌশলের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যা ইস্কাইলাসে দেখা যায়, আমরা থমকে দাঁড়াই। লঙ্গিনাস যাকে বলেছেন উৎর্বায়ন বা সাব্লিমিটি। যেখানে থাকে মহৎ আত্মার, মহৎ সাধনার; মহৎ প্রতিভার আলো। এই প্রতিভার উত্তাপ পাওয়া যায় হোমারে, মনে হবে যেন একটি নক্ষত্র জগতে প্রবেশ করেছি। এই নক্ষত্রের জগত সৃষ্টি করতে হলে চাই, গভীর অনুপ্রেরণা, ভালবাসা, আন্তরিকতা, প্রতিনিয়ত আত্ম-অনুসন্ধান ; অস্তিত্বের সমূলে অনুসন্ধান করতে হবে। বোদলেয়ারই প্রথম বললেন, দর্শনই সব। মহৎ দর্শনের গভীরে নিজেকে উন্মোচন করে নিজেকে পূর্ণ করে তুলতে হবে নিরন্তর সাধনার দ্বারা। অথচ কবির এই সাধনা বর্তমান যুগ প্রেক্ষাপটে প্রতিনিয়ত ব্যহত হয় ব্যক্তিবাদী চেতনার অন্ধকূপে। অস্তিত্ববাদ-এর অনিবার্য পরিণতিতে আধুনিক সভ্যতা কি ভয়ানক যন্ত্রনাদগ্ধ তা অবশ্যই বর্তমান যুগ যন্ত্রণার উল্লেখযোগ্য প্রেক্ষাপট হতে পারে। ১৯৬৬ সালে ফরাসী দার্শনিক মিশেল ফুকো যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন এমন পরিণতির কথা এবং সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, শেষ হয়ে গেছেন মার্ক্স, আর সেই সঙ্গে তাঁর যুগ—যেখানে এক দার্শনিক **Text** থেকেই শেষ পর্যন্ত জানতে হয় জীবন, মৃত্যু ও যৌনতা কি, ঈশ্বর আছেন কি নেই, মুক্তি কাকে বলে, রাজনৈতিক জীবনে কি করা উচিত, অন্যের সঙ্গে ব্যবহারের নিয়মাবলি ইত্যাদি। অথচ নব্বই-এর দশকে এসে কবি শরীফ শাহরিয়ার দুঃস্বপ্নের ছায়াশব্দে আতঙ্কিত। এই ছায়া-র কোন অস্তিত্ব আছে কিনা এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে পর্যন্ত কবি ভয় পান।

ক) দিকে দিকে বিচ্ছিন্নতা উড়িয়েছে ব্যক্তিবাদী কাল
আর আমি এত পথ পার হয়ে আজো কেন
রয়ে গেছি দ্বন্দ্বে মাতাল!

—(দ্বন্দ্বে মাতাল)

খ) সিলিকার বুকে বাড়ে অপয়া ধূ ধূ
তুমি আমি বালুপথ যেন—
ব্যক্তিবাদী বালুপথ শুধু।

—(ব্যক্তিবাদী বালুপথ)

গ) আর পাতা খসে—পাতা ঝরে
বিষন্নতার মর্মর গান—
আমাদের বুক ব্যেপে ব্যক্তিবাদী গান বেজে ওঠে।
—(বিষন্নতার গান

ইন্দ্রিয়জ ভাষা প্রতীক, উপমা, বাকরীতির সাহায্যে শিল্পের অব্যক্ত রহস্যকে উন্মোচনে সহায়তা করে। অনেকাংশেই যা ব্যাখ্যাযোগ্য নয়। যেমন ব্যাখ্যাযোগ্য নয় শাহরিয়ার-এর 'অচিন কাঁটা'-র রূপকধর্মী উপস্থাপন। কিন্তু এই উপস্থাপন মানবিক অনুষঙ্গের সাথে যুক্ত হয়ে অর্থ-ব্যঞ্জনায় স্ফূর্তি লাভ করেছে। যা শাহরিয়ার-এর সাবলীল দক্ষতা ও প্রকরণগত কৌশলে সম্ভব হয়েছে। অথচ অতিকথন, রিপিটেশন, (যদি না তা কোন নতুন মাত্রা সংযোজন করে) জটিল মেটাফর কবিতার সাবলীল গুণ বিনষ্ট করে—যা কোন কোন ক্ষেত্রে সহসাই শাহরিয়ার-এর ক্ষেত্রে কিম্বা শোয়েব-এর ক্ষেত্রেও ঘটে যায়। যেমন, শাহরিয়ার-এর 'অচিন কাঁটা' কবিতাতে শেষ পর্যায়ে—

বিঁধে আছো অচিন কাঁটা
তোমাকে খোলা দায়
ভিতর জুড়ে অষ্টপ্রহর
রক্ত গড়িয়ে যায়।

—এই 'তোমাকে খোলা দায়'—অংশটুকুর কি খুবই প্রয়োজন ছিল? যা ইতিপূর্বে বলা হয়ে গেছে। নতুন অর্থমাত্রা সংযোজন? নাকি কবিতাকে শিথিল করেছে? অথবা শোয়েব-এর 'হেমলক বৃক্ষ' জটিল মেটাফরে দায়বদ্ধ অনেকটা। ইতিহাস রচনার প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক এ জন্য দায়ী। যারা গৌণ তারা শব্দ নিয়ে খেলেন। টলস্টয় উচ্চতর শিল্পের জন্য দুটি অনিবার্য গুণের কথা বলেছেন, একটি সাবলীলতা, অপরটি স্বচ্ছতা। আজকাল জটিল শব্দের আমদানীতে বিভ্রান্তির মোহজাল সৃষ্টিতে সকলে বেশ আগ্রহী। অসংখ্য জটিল শব্দের ঝঙ্কারই কবিতা নয়। অসংখ্য ইটের স্তুপ মানে প্রসাদ নয় রুগ্ন ইমেজ, হাল্কা চিন্তা শিল্পের জন্য অপরাধ। এলিয়টের চিত্রকল্পের কথা বলা যায়। যার ভেতর রয়েছে এক ধরণের সম্মোহনী শক্তি। আমাদের চিন্ময় সত্তাকে যা বিলোড়িত করে। যা আমাদের অনুভূতিকে মূল্যবান করতে শেখায়। ভেতরে ভেতরে

পরিশ্রুত করে মানবীয় যুক্তিকে। যা সম্ভব হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের দ্বারা। তবে একথা ঠিক যে রবীন্দ্র যুগের চেয়ে শতগুণে জটিল হয়ে গেছে এখনকার সময় তথা যুগযন্ত্রণা। আবার একথাও ঠিক যে তা সত্ত্বেও বর্তমান কবিতার দিগন্ত ও প্রকরণগত বিকাশ অনেক অনেক বেশী প্রসারিত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। যে সম্ভাবনার ইঙ্গিত আভাসে প্রতিভাসে সামান্য হলেও আলোচ্য কবিদ্বয়ের কাব্যে পাওয়া যায়। যেমন ঘটেছে ছন্দের ক্ষেত্রে। ছন্দ অর্থ এখন আর অক্ষর গণনা নয়। কিংবা স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত নয়। সাম্প্রতিক কবিতার প্রকরণ-গত বিশ্লেষণে ছন্দ বুঝতে হলে বুঝতে হবে অলঙ্কার শাস্ত্রকে। সম-সাময়িক অনেক তরুণেরা বলে থাকেন অলঙ্কার শাস্ত্রের অধুনা প্রয়োগ নাই। অথচ শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের যথার্থ সমন্বয়ে ছন্দমাত্রা উচ্চারিত হবার আগেই কবির দ্বি-তলীয় মনস্তাত্ত্বিক অস্তিত্বে তা কম্পন সৃষ্টি করে। বিষয়টি খুবই জ্যামিতিক। সামান্য বিচ্যুতি ঘটলে উচ্চারিত ধ্বনি রাশি যথার্থ অর্থ, মাত্রা ও আবহ সৃষ্টিতে ব্যর্থ হবে। এমনকি পাঠক ব্যর্থ হবে তা যথার্থ উচ্চারণে পাঠ করতে। ফলে এখনকার অনেক কবিতাই কণ্ঠে যথার্থ ছন্দ মর্যাদায় উচ্চারিত হবার পর কবিতা তার যথার্থ রূপ-রস-গন্ধ-অর্থ নিয়ে শ্রোতার মননে ও প্রজ্ঞায় যথার্থ ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করতে পারে। এর জন্য কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু হয়তো ঐ কবিতাটিই নিরবে পাঠকালে দুর্বোধ্য হয়ে বারবার যন্ত্রনা দিয়েছে। যা ব্যাখ্যা করার পরও বোধগম্য হয়নি। এই রহস্যটি প্রোথিত আছে ছন্দের মধ্যে। তবে অবশ্যই ছন্দ অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নয়। আলোচ্য কবিদ্বয়ের কাব্যে ছন্দের স্বেচ্ছাচারিতা নাই বললেই চলে, যা তাদের কাব্যকে ধ্বনিক মাত্রা দানে সক্ষম হয়েছে। ফলে ছন্দমাত্রার অন্তঃস্রোতের আবহে তাদের নিজ নিজ কাব্য জগতে সাবলীল ভ্রমণ করে আসা সম্ভব। বর্তমান কবিতার ভয়াবহ বিচিত্র রকম বিষয়বস্তু ও অপরিচিত প্রকরণের মধ্যে ভ্রমণ করার জন্য ছন্দ অবশ্যই একটি যানবাহন।— এই যানবাহনে ত্রুটি থাকলে, হতে পারে তা ধ্বনিগত ত্রুটি, চিত্রকল্পগত ত্রুটি, প্রতীক বিষয়ক ত্রুটি প্রভৃতি, তবে কাব্যকাশ ভ্রমণ দুরূহ হয়ে যায়। যার জন্য পাঠক দায়ী নন, কবি দায়ী। তা হলে ছন্দ এখন শুধুমাত্র মাত্রা গণনা দাবী করে না। বরং টোটাল কাব্যগুণকে দাবী করে। যেমন যেক্ষেত্রে দুই মাত্রা প্রয়োজন সেক্ষেত্রে তিন অথবা চার মাত্রা প্রয়োগ করে যথার্থ কাব্যগুণ সৃষ্টি হতে পারে। ক্ষুন্ন হতে

পারে ধ্বনিগুণ তথাপি অন্যান্য গুণ বা ধর্ম এখানে প্রধান হয়ে দেখা দেয়, যা ধ্বনিগুণের আড়ালে চাপা পড়ে না।

শরীফ শাহরিয়ার-এর 'ঘুম' কবিতায় দেখা যেতে পারে—

ধূসর মেঘের শরীরে ডুবেছে চিল
চিলের চিৎকৃত ডানায় মেঘকণা, মেঘকণা, জল
প্রতিটি পালকের উড্ডীন মুদ্রায় বাজে
জলশব্দ, জলজ সেতার

কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে উচ্চারিত হলে প্রথম পংক্তি চৌদ্দ মাত্রা দাবী করবে। পর্ব বিন্যাস হবে ৬+৬+২, দ্বিতীয় পংক্তি ১৪+১৪+২=২০ মাত্রা দাবী করে অথচ তৃতীয় পংক্তি ৭+৮+২ এবং চতুর্থ পংক্তি ৫+৬ মাত্রায় উচ্চারিত হবে। ছন্দের তথাকথিত ধারণা অনুসারে প্রথম পংক্তি বা চরণের মত প্রতি ক্ষেত্রেই মাত্রা বিন্যাস হওয়া উচিত ছিল ৬+৬+২ কিন্তু তা রক্ষিত হয়নি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে। এখানে ছন্দের ডিসিপ্লিন রক্ষিত হয়নি? কবি কি ছন্দ বোঝেন না? একটু সতর্ক উচ্চারণে কবিতাটি পাঠ করলে দেখা যাবে কাব্যের প্রকৃত তাৎপর্য পাঠকের রক্তে রক্তে স্নায়ুতে স্নায়ুতে একটি সাবলীল মাত্রায় অর্থ ব্যঞ্জনা তৈরী করে চলেছে। তা কি করে সম্ভব হচ্ছে? এই গুণটির অনুপস্থিতিতে উপযুক্ত চিত্রকল্প ও প্রতীক ও তার উদ্দিষ্ট অর্থ দ্যোতনাকে সজিব করে তুলতে পারে না। তাহলে প্রচলিত ছন্দ বিন্যাসকে বর্তমান মেধাবী কবিগণ অনুসরণ না করেও সৃষ্টি করে চলেছেন একটি ভিন্ন মাত্রার ছন্দ বিন্যাস।

স্মরণ করা যেতে পারে ইয়েট্‌স-এর কথা। তিনি বলেছেন, ছন্দের উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি প্রলুব্ধকারী প্রবাহকারী ভাব (alluring sense of monotony) দ্বারা আমাদেরকে শান্ত করে ধ্যানাবিষ্ট মুহূর্তকে দীর্ঘায়িত করা, যে মুহূর্তে আমরা ঘুমন্ত এবং জাগরিত উভয়ই; বৈচিত্র্যের দ্বারা এটা আমাদের জাগ্রত রাখে এবং ভাবাবিশিষ্ট অবস্থায় আমাদেরকে ধরে রাখে, ইচ্ছার চাপ থেকে মুক্ত হয়ে যেখানে মন প্রতীকের মধ্যে নিজেকে মেলে ধরে।

আমি বলতে চাচ্ছি, ছন্দ হচ্ছে এক প্রকার সম্মোহনী যাদুবিদ্যা বিশেষ, যা কাব্যকে বাস্তব জগত হতে অতি-বাস্তব জগতে উন্নিত করে।

(অতি বাস্তব জগত বলতে এরিষ্টটলের অতি বাস্তব জগতের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে।) শোয়েব শাদাব-এর 'উৎসমুখ' কবিতায় দেখা যেতে পারেঃ

কেশর কেশর নামে ঐ কার অন্ধকার আজানু কেশর
বড়ো চেনা বড়ো চেনা

অনন্ত বছর যেন ছিলাম ছিলাম তার চুলে
আড়াল আড়াল করো উৎসমুখ লবণের ধার
সন্তানের চোখ, অন্ধ! দ্যাখে যদি নগ্নতা মাতার
চক্ষুদ্বয় হয় হয় অন্ধ বন্ধ দেখে ঐ নগ্নতা
আড়াল আড়াল করো উৎসমুখ লবণের ধার!

সৃষ্টি রহস্যের সবটুকু দর্শন করতে নাই, উপলব্ধিতেও বুঝতে নেই। ভয়ানক রকম সফল এই কবিতা। সফলতার কৃৎকৌশলে রয়েছে, বিষয়বস্তু, দার্শনিক প্রজ্ঞা ও প্রতীক ব্যবহারের অর্থবহ দক্ষতা। মাতার সৃষ্টিমুখ অর্থাৎ যোনীমুখ দর্শন সন্তানের চোখকে অন্ধ করে দেয়। এই সৃষ্ট জগত ঈশ্বরের সৃষ্টি উৎস অর্থাৎ উৎসমুখ দর্শনে অক্ষম। যদি বা ইচ্ছে জাগে তা হলে অন্ধ হবে সে। এমনই এক অর্থবহ জ্ঞান-প্রজ্ঞা দর্শনের তৃষ্ণায় ও দ্বিধায় এই কবিতার দার্শনিক আবহ আবর্তিত। যা উন্মোচিত হয়েছে নান্দনিক মাত্রা জ্ঞানে। এই নান্দনিক মাত্রা অবশ্যই ছন্দ মাত্রা হতে পরিণত রূপ লাভে সক্ষম হয়েছে। এখন যদি কবিতাটির বিষয় বক্তব্য এভাবে সাজানো যায়ঃ বিশাল চুল দিয়ে মাতার নগ্নতা আড়াল করো। মাতার নগ্নতা সন্তানের দেখতে নেই।—এক্ষেত্রে, 'অনন্ত বছর যেন ছিলাম ছিলাম তার চুলে'—চরণটির অর্থদ্যোতনাসহ অন্যান্য অর্থ মাত্রা বিলুপ্ত হয়ে কথাগুলি অশ্লিল রূপ লাভ করেছে। বিষয়টি নির্ভর করছে কবিতাটির সুর ও ছন্দের উপর। অর্থাৎ পদ সাজানোর কৌশলের উপর। অবশ্য ছন্দ কোন কৌশল নয়। বরং রক্ত হতে উৎসারিত প্রবাহ ক্ষমতা বিশেষ। জর্জ টমসন-এর মত অনুসারে বলা চলে, ব্যাপক অর্থে ছন্দকে বলা যেতে পারে ধ্বনির মাত্রা (Pitch) ও সময় বন্ধনের নিয়মিত পরম্পরায় ক্রমিক বিন্যাস। এর চূড়ান্ত উৎস নিঃসন্দেহে শারীরিক, সম্ভবত হৃৎস্পন্দনের সাথে এর যোগ। টমসনের মতে হাতিয়ার ব্যবহার থেকেই মানুষের ছন্দজ্ঞানের উদ্ভব। এবং তিনি এ সিদ্ধান্তের সপক্ষে যথেষ্ট উদাহরণসহ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন।

শোয়েব শাদাব-এর অশেষ প্রস্তরযুগ-এর উদাহরণ নেয়া যেতে পারে ঃ

ক) লোমশ শরীর যেন দেবতার বলিষ্ঠ প্রতীক
সৌর-প্রতিভার প্রজ্ঞায় ভাস্বর।

খ) আখের পাতার মতো ধারালো শরীর
দুলিয়ে দুলিয়ে নাচে পাহাড়িয়া নারী
পুড়িয়ে পশুর মাংস পুড়িয়ে আগুনে

গ) বাতাস আনছে বয়ে
ভয়ংকর যৌবনের গন্ধ
ধূপের গন্ধের মতো মর্মভেদী

ঘ) পরাহ্ন-বেলার পাখি
খোঁজো সমাধির মর্মির মর্মার্থ
আদি-পৃথিবীর হীনতা।

উল্লেখিত কবিতাংশগুলির ছন্দ তাৎপর্য অনুধাবনের জন্য কবিতার টোটাল নান্দনিক তাৎপর্য অনুধ্যান আবশ্যক। সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে ছন্দ প্রতীকের মতই অনুন্মোচিত রহস্যকে তাৎপর্য দান করে। পার্থক্য শুধু প্রতীক চিত্রকল্প তৈরী করে আর ছন্দ তৈরী করে অর্থময় ধ্বনিক গুণ। যা শব্দের আপাত অর্থকে অতিক্রম করে অর্থময়তার এক সম্ভবনার জগৎ উন্মোচন করে। অর্থাৎ এই ধ্বনিক গুণ আধুনিক কবিতায় শুধু ধ্বনি ব্যঞ্জনাই সৃষ্টি করে না বরং সেই সাথে সৃষ্টি করে অর্থগত মাত্রা, যে মাত্রা কবিতার অন্যান্য আঙ্গিকমানকে উপযুক্ততা দান করতে অনিবার্য ভূমিকা পালন করে। কিভাবে—? বিষয়টি দৃষ্টিগ্রাহ্য নয় বরং শ্রুতিগ্রাহ্য, এই ছন্দময় শ্রুতিপ্রবাহ গোটা কবিতার অর্থগত ঐক্য নির্মাণ করে। ব্যাখ্যাতীত বিষয় যা প্রায়শই ভাষা থেকে বাদ পরে যায় সেই বিষয়টিকে ভাষিক চেতনার সাথে সংযোজন করে ছন্দ। মুখে উচ্চারিত না হলে এই ছন্দকে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় না লেখাতে। হয় ভাষিক চেতনায়, নয়তো উচ্চারিত হবে কণ্ঠে। ফলে সঙ্গত কারণেই প্লেটোর অনুসরণে ফার্দিনান্দ দ্যা সোসুর বলেন, 'লেখা' আসলে 'কথা' অপেক্ষা নিকৃষ্ট। ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায়, 'কথা'-র মধ্য দিয়ে মানব মননের অনুভূতিগুলির 'ধ্বনি-প্রতিমা' (**Sound Image**) ফুটে ওঠে ; আর 'লেখা'-র ভেতর দিয়ে

প্রকাশ পায় সেই 'কথা'-র 'রেখা-প্রতিমা' (**Graphic Image**)। সুতরাং 'কথা' হচ্ছে 'অনুভূতি' বা 'ধারণা'-র চিহ্নক (**Signifier**) এবং 'লেখা' সেই 'কথা' নামক 'চিহ্নকের চিহ্নক' (**Signifier of Signifier**)। ছন্দ হচ্ছে উচ্চারিত ধ্বনিক সমষ্টির প্রবাহিত মাত্রা ; যা কথার-ই অংশ কিন্তু লেখার অংশ নয়। কবিতার লিখিত রূপ দুর্বোধ্য হতে পারে। কিন্তু উচ্চারিত হলেই যখন তাতে ছন্দ যোগ হয়,—তখনই—তা লেখা অপেক্ষা অধিক তাৎপর্য বহনে সক্ষম হয়ে ওঠে। যা ছন্দেরই কারিশ্মা। বিষয়টিকে জাক দারিদার **Deconstruction** দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

জাক দেরিদা 'বিনির্মাণ' তত্ত্বের ব্যাখ্যায় সর্বদা নেতিবাচক প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন কোন্ কোন্ বিষয় 'বিনির্মাণ' নয়। তিনি সরাসরি বলেননি যে, এই বিষয়টি বিনির্মাণ। যে কোনো ভাষিক উপস্থাপনা বা বয়ান-এর অভ্যন্তরে কিছু কিছু যৌক্তিক স্ববিরোধিতা সৃষ্টি হয়। দেরিদা একে বলেছেন ; **Aporia**। যার গ্রিক ভাষায় অর্থ হচ্ছে, 'সমাধানের অযোগ্য যুক্তিগত সমস্যা'। হ্যামলেট-এর বিখ্যাত স্বগত ভাষণ **'To be or not to be'**—**Aporia**-র একটি চমৎকার নমুনা। দেরিদা অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যঞ্জনায় **Aporia** শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যার কাছাকাছি বাংলা শব্দ 'অন্ধবিন্দু' ব্যবহার করা যেতে পারে। এই 'অন্ধবিন্দু' বা **Aporia** বা **Blindspot**-গুলি কোনো বয়ান বা **Text**-এর অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকে। দেরিদা এই **Text**-এর অভ্যন্তরে প্রোথিত পরস্পর বিরোধিতা, টানাপোড়েন ও মিলমিশের আয়াসকে প্রধানত মানব মস্তিষ্কের একটি চেতনাগত প্রক্রিয়া বলে ধরে নিচ্ছেন। যা প্রথমত রূপ নেয় প্রত্নলেখার মধ্যে। অর্থাৎ কি লেখা হবে তা কাগজে বর্ণ অক্ষরে রূপ লাভের পূর্বেই মস্তিষ্কে প্রত্নলেখ সৃষ্টি করবে এবং যা লিখিত আকার লাভের জন্য মস্তিষ্ক হতে লেখার কাগজ এর মাঝখানে যে প্রকৃয়া বা পথ অতিক্রম করবে তাতে করে মূল প্রত্নলেখ তার মৌলিক তাৎপর্য কিছুটা হলেও হারাবে এবং সেক্ষেত্রে সৃষ্টি হবে অন্ধবিন্দু বা **Aporia**। সুতরাং লিখিত রূপ বা **Text** জ্ঞান ও চিন্তনকে সম্পূর্ণ ভাবে লেখাতে রূপান্তর করতে পারে না। ফলে লিখিত জ্ঞান আংশিক সত্যকে উপস্থাপন করে। কাব্যের ক্ষেত্রে এই আংশিক জ্ঞান আরো ভয়াবহ এবং ব্যাখ্যাতীত। কাব্যের ছন্দও ঠিক এই অন্ধবিন্দু বা

Aporia-র মতই স্ববিরোধী বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে সক্ষম এবং যা সৃষ্টিশীল প্রকৃয়ায় বিনির্মাণ কর্মটি ক্রমাগত পরিচালনা করে থাকে। জাক দেরিদার 'বিনির্মাণ' তত্ত্বকে নিট্শে-র একটি অনুচ্ছেদ দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে ঃ

Ultimately, man finds in things nothing but what he himself has imported into them : the finding is called science, the importing art, religion, love, pride. Even if this should be a piece of childishness, one should carry on with both and be well disposed toward both—Some should find ; others—we—others ! —should import !

—তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে **Text** বা বয়ান বা লেখাটি যিনি পড়বেন, তিনিই হবেন তার নতুন অর্থকার এবং সেই পাঠক 'ভাষাসত্তা' স্বয়ং ওই প্রথম পাঠ-কে দ্বিতীয় পাঠে সম্পূর্ণ নিয়ে যেতে বা পূর্ব পাঠকে দমিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় পাঠ-কে তৃতীয় পর্বে—এই ভাবে চতুর্থ পাঠে—এই ভাবে ক্রমাগত অনন্ত পাঠ-প্রক্রিয়ার নামই বিনির্মাণ। যা কাব্যের ক্ষেত্রে উন্মোচন করে থাকে কাব্য-সৌন্দর্য তথা জ্ঞান-এর জগতের এক বিশাল ক্রমসৃষ্টিশীল এক জগৎকে। এই জগৎ নির্মাণ প্রকৃয়াটি শিল্পের অনিবার্য একটি ভয়ানক গুণ। যদিও জাক দারিদা স্পষ্টত বলেছেন, 'বিনির্মাণ' কোনো পাঠরীতি নয়, কোনো সাহিত্য সমালোচনার প্রণালী নয়, এমনকি সমালোচনা সাহিত্যের কোনো নতুন ধরনও নয়। বিশেষ করে অষ্টাদশ শতক থেকে প্রধানত স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ-এর লেখালেখির সূত্র ধরে টি, এস, এলিয়ট পর্যন্ত ইউরোপিয় সাহিত্যে **Textual Criticism**-র যে একটি সূক্ষ্ম ও মনোগ্রাহী ধারা গড়ে উঠেছিল; তার কোনো অংশ 'বিনির্মাণ' প্রক্রিয়ার প্রসঙ্গে আলোচ্যও নয়। বিশেষভাবে ভাষা ও ভাষা নির্মাতার সম্পর্কের মধ্যে ফাঁক-ফোকরগুলি সনাক্ত করতে গিয়েই বিনির্মাণ-এর ধারণা ও তত্ত্ব জাক দারিদা উপস্থাপন করেন। এই ভাষা নির্মাতার মস্তিষ্কে সৃষ্ট প্রত্নলেখ, প্রত্নলেখ থেকে সাহিত্য বা কাব্যের লিখিত রূপটি শেষ পর্যন্ত বিনির্মাণ তত্ত্বকে অবলম্বন করে চলেছে। বিষয় বস্তুর জটিলতা ও চিন্তা ও প্রজ্ঞার ভয়াবহতা আমাদের প্রচলিত রোগার্ত পুরোনো স্বল্পমাত্রা বহনকারী সীমিত ব্যঞ্জনা বহনকারী শব্দরাশি উন্মোচন করতে বা ধারণ করতে ব্যর্থ। ফলে সৃষ্টি হয় নোতুন ধ্বনি, আর ধ্বনিকে কেন্দ্র করে ছন্দ, পরবর্তিতে অপরাপর নান্দনিক আধার সমূহ। ফলে বলা চলে ছন্দ তার কাঠামোগত সীমানাকে অতিক্রম করবে

অনিবার্য কারণেই। ছন্দের বিশেষ বিধি-বিধানসমূহ যদি সৃষ্টিশীল কিংবা পরিবর্তনযোগ্য না হয় তবে তা নিত্য নোতুন যুগ যন্ত্রণাকে সৃষ্টিশীল ভাষায় চিত্রিত করতে অক্ষম বরং তা কাব্যের জন্য বাঁধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই বাঁধাকে অতিক্রম করতে গিয়ে জন্ম নেয় নোতুন ছন্দ। তবে এই নোতুন ছন্দ সৃষ্টি অবশ্যই ছন্দহীনতা বা স্বেচ্ছাচারিতা নয়। বরং ছন্দের ডিসিপ্লিনকে আত্মস্থ করে নিয়ে ছন্দের হৃৎপিণ্ডের কম্পনের সন্ধান করার মাধ্যমেই সৃষ্টিশীল ছন্দের আবিষ্কার সম্ভব। সৃষ্টিশীল অবশ্যই। কেননা ছন্দ কাব্যের জন্য আরোপিত কোনো বিষয় নয় বরং ছন্দ থেকেই কাব্যের উৎপত্তি। আজকাল কবিতা লেখা হয়ে যাবার পর ছন্দ ঠিক আছে কিনা গণনা করা হয়। যা হাস্যকর। শক্তিশালী কবির কলমে ছন্দ আগে আসে তারপর ভাষিক ব্যঞ্জনা। যার হৃদয়ে ছন্দ নাই তার হৃদয়ে কাব্য অনুপস্থিত। ছন্দ ভাঙ্গা কিংবা নোতুন ছন্দ সৃষ্টির নামে তিনি ভণ্ডামী করেন মাত্র।

শোয়েব শাদাব-এর 'আবহমান' কবিতায়ঃ

> তবু আমি আমিময় জীবনে যৌবনে
> সৃজনে সত্তায়

অথবা 'চিতাকাঠ' কবিতায়ঃ

> অদ্ভুত খোলস খুলে নারী শুধু ঢালে উষ্ণতাই
> ভেনাসের দীপ্ত স্তন ইচ্ছার আবেগে ভারানত

কবি অসীম আগুন, চিতা, সূর্য, চাঁদ, শীত, প্রাকৃতিক ওলট পালটের মাঝে প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতায় নিজ সত্তায় নিজেকে আবিষ্কার করেন। অথচ প্রকৃতি ও নিজেকে আবিষ্কারের বয়ান বা **Text**-এর মধ্যে রয়েছে দেরিদা-র 'অন্ধবিন্দু'। ফলে সৃষ্টি হয় স্ববিরোধি একাধিক প্রশ্ন ও ভাষিক ব্যঞ্জনা। অর্থাৎ ভাষাসত্তা (**Langue**)-র সঙ্গে সংশ্লেষের ফলে ক্রমে বিভিন্ন মাত্রায় **Literature** হয়ে উঠতে শুরু করেছে। বিধাতাই একমাত্র অমোঘ শত্রু তবু আমি আমিময় জীবনে যৌবনে সৃজনে সত্তায়। ভণ্ড সাধু সন্ন্যাসীর আলখেল্লায় শ্বাশত মাটিকে প্রণাম, ফলে প্রকৃতির প্রাকৃতিক নিয়ম ওলট পালট হয়। এই ওলট পালট দৃশ্য একমাত্র কবির দিব্য দৃষ্টিতেই দর্শন সম্ভব। যা কবিতার প্রত্নসত্তায় প্রোথিত ভাষামাত্রা ও ছন্দমাত্রার সমন্বয়ে সৃষ্টিশীল

বিনির্মাণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভাসিত। এবং বাদবাকী সত্য ও অর্থময়তা এই কাব্যগুণের কারণে পাঠক সত্তায় সৃষ্টি হতে থাকবে। পাঠক সত্তায় সৃষ্টি হবার অবকাশ আছে এই কারণে যে শাদাবের কবিতার ক্যানভাস যেন পৃথিবীর সমান বয়স ব্যাপী বিস্তৃত। শাদাব বাক-সংযত। ফলে কবিতার অন্তর্বয়নে সৃষ্টি হয় জটিল মেটাফর। যা সাধারণ পাঠকের জন্য অনতিক্রান্ত। আরো এক ধাপ মেধাবী কবি এক্ষেত্রে উৎরে যান, যখন কবি দিব্য দৃষ্টিতে স্পষ্ট দেখতে পান যে তিনি কি বলতে চাচ্ছেন। যেমন এলিয়টের ওয়েস্ট ল্যাণ্ড-এর ক্ষেত্রে ঘটেছে। অথচ শাদাব যেন এ সমস্যায় হাবুডুবু খেতে খেতে এক বক্তব্য থেকে আরেক বক্তব্যে এসে স্ফূর্তি লাভ করেন? এই কাব্য কৌশল কি কবির আত্ম প্রতারণা নাকি কবি তার নিজেস্ব দর্শনে দ্বিধাগ্রস্থ? অদ্ভুত খোলস খুলে নারী শুধু ঢালে উষ্ণতাই। শোয়েবও কি তার কাব্যে এ জাতিয় উষ্ণতাই শুধু পরিবেশন করেন?—অবশ্যই উষ্ণতার পাশাপাশি উপস্থাপন করেন বিবিধ খণ্ড চিত্র কিন্তু এই খণ্ড চিত্র অনেকাংশেই কার্যকরণ সূত্র মানতে রাজি নয়। ফলে কাব্য বক্তব্য প্রবেশ করে রহস্যময় জগতে। যা কাব্যের জন্য হয়তো ইতিবাচক গুণ। পাশাপাশি শরীফ শাহরিয়ার-এর কবিতায় পাওয়া যায় বক্তব্যের সামঞ্জস্য ও চেতনায় ধারাবাহিক ছবি, যা কার্যকরণ সূত্রের অধীন।

ক) তোমার গ্রীবার মালা ধরে আছে সময়ের ভার
আর আমি এত পথ পার হয়ে কেন যে
বিভাজন করতে পারিনি ফেলে আসা
বেতফল এবং নামতা খাতার

(—দ্বন্দ্বে মাতাল)

খ) একেকটি গীতল ঢেউ
একেকটি মাছরাঙা নদী
তাদের কণ্ঠের ভাঁজে
বয়ে যেতো জলজ সিম্ফনী।

(—ব্যক্তিবাদী বালুপথ)

গ) কান পেতে শোনো
কোথাও দূরে
মন্দিরা বাজে একটানা

(—ছায়াসত্তা/এক)

কবির শিল্পীসত্তা ঠিকই মন্দিরার একটানা সুর শুনতে পান। শুনতে শুনতে বুঝতে বুঝতে পারেন,

মৃত্যু এক স্থির শান্তিজল—
গূঢ় ঘুম-গল্পের অন্তহীন পাঠ।

এই গূঢ় ঘুমের অন্তহীন গল্প পাঠের মধ্যে প্রোথিত থাকে Aporia। এই অন্ধবিন্দুগুলি জীবিত জীবন ও মৃত জীবনের তাৎপর্য উদ্ধারে ক্রিয়াশীল। দুই জীবনের মধ্যে যোগসূত্র নির্মাণে আগ্রহী। শাহরিয়ার-এর 'বিনির্মাণ' যন্ত্রণা নান্দনিক চেতনায় সৃষ্টি করে চলে একটি শব্দ-ছবির সাথে আরেকটি শব্দ-ছবির সম্মিলন এবং নোতুন অর্থানুভূতি সম্পন্ন শব্দ-ছবি। যেমন, গীতল ঢেউ, মাছরাঙা নদী, জলঘুম, মাথার কোষে কারা যেন বুনে গেছে বরফের বীজ, প্রজ্বলিত মোমের কান্নাজল —এই সব কিছুই বহন করে চলেছে কবির কাব্য সত্তার প্রতিভাকে। এভাবে কবি তার প্রত্নভাষার সাথে লেখ্য ভাষার দূরত্বকে কমিয়ে আনেন ফলে শিক্ষিত পাঠকদের কাছে উন্মোচিত হয় কাব্যের প্রকৃত জগৎটি। যাকে নিত্য নোতুন আঙ্গিকে উন্মোচিত করা হচ্ছে। কিন্তু অশিক্ষিত পাঠকের কাছে এমন ভাষা দুর্বোধ্য এবং অর্থহীন। আবার অনেক ক্ষেত্রে কবিও এমন অর্থহীনতা জন্ম দিতে পারেন। যেমন শোয়েব কখনো কখনো দুর্বল ভাষার অনুষঙ্গে অর্থহীনতায় ভুগেছেন। কাঠের ঘোড়া কবিতার শুরু অংশ ঃ

ঘোড়াটি হঠাৎ তাকালো পেছনে
দুটি চোখ তার আগুনের থালা
এবং বড়োই রহস্যময়
ঘোড়াটি অমন তাকালো কেন মধ্য পথে ?

চিত্রকল্পের সাথে বক্তব্য পরিস্কার এবং ইঙ্গিত ধর্মীতা ও নাটকীয় পরিবেশ নির্মাণের চেষ্টা আছে। তারপরও এই অংশটুকু কাব্য হিসাবে কাছে টানে না। মনে হয় গদ্যে লেখা। তা হলে কি যে ছন্দ কাব্যে, প্রত্নসত্তায় লুক্কায়িত থাকে তার যথার্থ কম্পন এক্ষেত্রে নেই। লোরকা হলে হয়তো বলতেন 'দুয়েন্দে' এর অভাব ঘটেছে এক্ষেত্রে। আমি বলবো কবিতা নির্মাণ প্রচেষ্টা মাত্র। যা কাব্যের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়! যা সৃষ্টি হয় কবির কাব্য ক্লান্তি থেকে। এভাবে অনেক বক্তব্য-ধর্মী কবিতা শেষ পর্যন্ত তরল দর্শনে পর্যবসিত হয়। যদিও এই তরলতার আড়ালে থাকে জীবন জিজ্ঞাসা ও জীবন যন্ত্রণা। কিন্তু এই

জীবন যন্ত্রণার উন্মোচন কিভাবে শেষ পর্যন্ত কাব্য হয়ে উঠলো সেটাই বিবেচ্য বিষয়। জীবনের সবটুকুই শিল্প নয়। শিল্পীকে তা শিল্পে রূপান্তর করে নিতে হয়। যেমন; কাফকার 'রূপান্তর'। যা প্রতীকায়িত হয়েছে সফল মাত্রাজ্ঞানে। অথচ ফ্রানজ কাফকার বিষয়বস্তু ছিল নগর কেন্দ্রিক ; নীরেট বাস্তবতা। শোয়েব-এর 'কাঠের ঘোড়া' প্রতারণার প্রতীকে মীথ-এর ব্যঞ্জনায় সরাসরি বক্তব্য উপস্থাপন করে মাত্র কিন্তু তা উল্লেখিত ব্যাখ্যা অনুসারে শেষ পর্যন্ত শিল্প হতে পেরেছে কি ? যেমন সফল চিত্রকল্প হয়ে উঠতে পেরেছে 'পরস্পর' কবিতাটি। যার মধ্যে 'পিঁপড়ে' প্রতীক প্রাচীন কোনো সম্রাজ্ঞীর কথা-র মধ্য দিয়ে নিজের চরিত্রকে পরিস্ফুট করেছে। উন্মোচন করেছে মন-জগতের অব্যক্ত ভাষাকে।

অনুষঙ্গের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারা শোয়েব এবং শরীফ শাহরিয়ার উভয়ের কাব্যের প্রকরণগত কৌশল, যা তাদের কাব্যে সফল। অথচ অনেক ক্ষেত্রে বক্তব্য ধর্মীতায় পর্যবসিত হয়ে তা কাব্যের টানটান উত্তেজনাকে করেছে ম্লান। যেমন শোয়েব-এর 'শবগাড়ী' কবিতাটি। অথচ বিষয়বস্তু ও উপলব্ধিগত বিকাশ কি ভয়ানক সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচনের অপেক্ষা রাখে। এখানে মহাজাগতিক শবগাড়ি চিরন্তন মর্যাদায় শ্বাশত রূপ নিতে পারত।

চিত্রকল্প নির্মাণের মধ্য দিয়ে গল্প কথন কৌশল শোয়েব-এর কাব্যের আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য। যা ভাষিক মর্যাদা লাভ করে বাস্তব মানব সংসারের খণ্ডিত চিত্রের মধ্য দিয়ে। ফলে পরিবেশ সচেতন কবির রক্তে নেচে ওঠে অবিনাশী দ্বন্দ্ব, আর আয়ুতে স্নায়ুতে চলে ভৌতিক শৃঙ্গার।

কবি শোয়েব শাদাব-এর কাব্য পাঠ বিবেচনায় আনতে হলে ব্যক্তি শোয়েবকে আংশিক হলেও জানা আবশ্যক। ওর সাথে পরিচয় শাহবাগে। এর পর কবি কফিল আহমেদ-এর সাথে ওকে অবকাশ যাপন করতে দেখেছি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে। ওর পৈত্রিক নাম শাহ গোলাম কিবরিয়া। জগন্নাথ কলেজে বাংলা ১ম বর্ষ সম্মানের ছাত্র তখন। বাড়ি নেত্রকোণা। গাঁয়ের নাম বিষ্ণুপুর, ত্রিশালের সুতিয়া নদীর তীরে। ইত্তেফাকের সাহিত্য সম্পাদক আল মুজাহিদী-র প্ররোচনায় ওর নাম হয়েছে শোয়েব

শাদাব। অথচ স্বঘোষিত পণ্ডিত কবি আল মুজাহিদী শোয়েব-এর কবিতা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তাচ্ছিল্যের সাথে। তখন প্রাতিষ্ঠানিক পণ্ডিতগণের ধারণা ছোট কাগজ বা লিটল ম্যাগাজিনের কম বয়েসি ছোকরারা মূর্খ, তারা বড়দের সম্মান করতে জানে না এবং তারা শিল্প সাহিত্যের অ-আ না বুঝেই দুর্বোধ্য অর্থহীন কীর্তিকলাপ করে চলেছে। এবং কাব্য বলতে পদ্য রচনা ছাড়া আর কোন বিষয় তখন পর্যন্ত আমাদের অগ্রজগণ ভাবতে পারেননি। অথচ বিষ্ণু দে, সুধীন, জীবনানন্দ বহু পূর্বেই সে ধারণার অবসান ঘটিয়েছেন। যাই হোক, শোয়েব মানসিক রোগে শেষ পর্যন্ত পাবনা মানসিক হাসপাতালে স্থান নিল। বর্তমানে পাবনা থেকে গাঁয়ের বাড়ীতে শেকলবন্দী। একজন কবির ৫/৭ বৎসরের ফসলকে গ্রন্থে রূপ দিয়ে 'নিত্য প্রকাশ'-এর বাহার রহমান যে দায়িত্ব পালন করেছেন তা শিল্প ও সভ্যতার ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত। তিনি শুধু দায়িত্বই পালন করেন না, তিনি একে একে শরীফ শাহরিয়ার, শোয়েব শাদাব সহ আশির দশক ও নব্বই-এর দশকের সম্ভবনাময়ী কাব্য শিল্পী-দেরকে চিহ্নিত করেন ও তাঁদের শিল্পকর্ম প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই উদ্যোগ তাঁর রক্তে মিশে আছে এক শিল্প চেতনার অহংকারী দাবী নিয়ে। এ প্রসঙ্গে 'গাণ্ডীব' পত্রিকার 'তপন বড়ুয়া'-র নামও স্মরণযোগ্য। যিনি শোয়েব-এর কবি সত্তাকে পূর্বাহ্নেই সনাক্ত করতে পেরেছিলেন।

সভ্যতার বিষাক্ত বিষফল ভক্ষণের পর অবচেতন মনের সুপ্ত যন্ত্রণাকে ছুঁয়ে দিতে চান কবি শাহরিয়ার তার কাব্য সুরের যাদুতে। সভ্যতার চূড়ান্ত উৎসব লগ্নে কবি দেখতে পান ক্রমাগত পরিচিত মানব পরিবার ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। এই টানাপোড়েনের মাঝে কবি সর্বদা নান্দনিক স্পর্শে সচেতন। সম্ভবত একখানা কবিতাও তিনি খেয়ালি আবেগে ছাপেননি। তিনি প্রতিনিয়ত দৈনন্দিন চেনা-জানা অনুষঙ্গের ভিতর পরিচিত গন্ধ শুকে শুকে পৌঁছে যান কাব্যের নাচঘরে। ছুঁয়ে দিতে চান প্রকৃত কাব্যের প্রকৃত সঙ্গীতকে। কবির 'দূর গহনের গান'—কবিতাটিতে কবি কিভাবে সেই গান শুনতে পান তার চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যা কবির যন্ত্রণাকাতর অথচ শান্ত আত্মার চিরন্তন দহন। কবির চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা ও আহ্বান সেই গানকে ক্রমাগত উপলব্ধিতে নিয়ে আসবার। কবি স্পষ্টত বলেন ঃ

বস্তুতঃ এরকম কিছু গান অনুভূতির গূঢ় ভাঁজে
কখনো ব্যাপক অর্থময়তায় জেগে ওঠে।

এই অর্থময়তাই শেষ পর্যন্ত কাব্যকে চিরন্তন মর্যাদায় জীবিত রাখে। আলোচিত কবিদ্বয় কাব্যের বিষয়বস্তু, ভাব, ভাষা ও ছন্দে সম্পূর্ণ পৃথক হলেও তারা বেঁচে থাকুক নান্দনিক বিশ্বে অর্থময় রহস্য নিয়ে। আগামীতে তাদের আরো কবিতা আরো ভিন্নতর কাব্য সৌন্দর্য সৃষ্টি করবে, যা আমাদের সকলের প্রার্থনা।

পরিশিষ্ট

শরীফ শাহরিয়ার-এর এই সময়ের কবিতা

প্রেতান্ধ শব্দের ময়ূরী

তবে কোথায় প্রাজ্ঞ পুরোহিতগণ
আষাঢ়-বৃষ্টি কি পদচ্ছাপ ধুয়ে নিয়ে গ্যাছে!
ডানাহীন হাওয়ায় ভর দিয়ে
মন্ত্র জপে ফাঁকা বনভূমি

পূর্ব শব্দের বাজিকর
অব্যর্থ ধনুকের ছিলায়
নিজেকে টান টান বেঁধে
এখন কি ব্যর্থতার বালু গুজে মুখে
খোঁজে নিজের প্রতিবিম্ব
আলো-ছায়ার ভাঙা আরশিতে

তবে কোথায় উজ্জ্বল উদ্ধার!
নক্ষত্র-নিয়তির নিচে
স্থির হাওয়ার মুখোশ পড়ে
ঘিরে ঘিরে নাচে
প্রেতান্ধ শব্দের ময়ূরী!

মুদ্রা

কিশোরীর আর্দ্র ত্বকের সুষমা ছিঁড়তে ছিঁড়তে
আর শিশুর ঘুম-রহস্য ভেদ করে
উজ্জ্বল ঝঙ্কার তুলেছো পৃথিবী প্রব্রজ্যায়
তোমা বিহনে একদণ্ড স্বস্তি নাই মগজে, সঙ্গমে।
তোমার প্রতিভায় বিকশিত চারিদিক
ঘুম, গান, আড্ডা, হাসি
তব সিঁড়ি বেয়ে নামে
সব গৃহে আলো জ্বলে তোমার কৃপায়।

প্রথামাফিক গল্পের হাওয়ায়

প্রথামাফিক খুব সহজেই গল্পটা বলা যায়
অন্তিমে মীমাংসা দেয়া যায় জটিল ধূলো ঝড়ের
আর দীর্ঘ রহস্যের ডালগুলো অবলীলায়
কাটা যায়, যা মূলতঃ বিভ্রমের ছায়ানাচ
অথচ এভাবে ঠিক গল্পটা মেলেনা
মীমাংসার নম্র হাওয়া পারিপার্শ্বিক চাপে
বেঁকে বেঁকে অজস্র প্রেক্ষাপটে ডুব দ্যায়
যেখানে গল্পটা প্রথাবদ্ধ শব্দের খোলে
এগুতে গিয়ে পাঠককে ফ্যালে গোলক ধাঁধায়
আর রহস্যের ডালগুলো ক্রমশঃ
জট পাঁকিয়ে বেড়ে ওঠে গভীর বক্রতায়
অবশেষে প্রকৃত প্রস্তাবনায় ব্যর্থতার
ঝড় বয় প্রথামাফিক গল্পের হাওয়ায়।

আদ্য আর অন্তের দ্বন্দ্ব

আদ্য রেখা ভেঙে গ্যাছে
সময়ের কালো ছাপে,
মধ্যরেখা, ভাঙা পথটা
সেঁতুতে বাঁধতে গিয়ে
আদ্য আর অন্তের দ্বন্দ্বে ডুবে

ক্ষয়িষ্ণু চন্দ্রদোয়ে
দেখছে নিজের ছায়া।
আর অন্ত, সে এক অদৃশ্য ঘোড়া
স্বপ্নের সবুজ মাঠ
রহস্যের ধ্বনিতে গেঁথে কোথায় যাবে!
এই প্রশ্নে মুখর হয়েছে হাওয়া।

পুণর্মুদ্রণ

শোয়েব শাদাব-এর সাম্প্রতিক কবিতা সংগ্রহে না থাকায় তার 'অশেষ প্রস্তর যুগ' কবিতাটি প্রকাশকের অনুমতি সাপেক্ষে পুনর্মুদ্রিত হলো।

শোয়েব শাদাব

অশেষ প্রস্তর যুগ

১

জলকাচ
আচ্ছন্ন বিকেলে, স্তব্ধতায়।
গুহা-পুরুষের ছায়া বিস্ময়ের মুদ্রায় স্তম্ভিত
বিপুল আবেশে ক্রমে জাগে জলে-ফোটা প্রতিকৃতি দেখে।
লোমশ শরীর যেন দেবতার বলিষ্ঠ প্রতীক
সৌর-প্রতিভার প্রজ্ঞায় ভাস্বর।

হিমরাত্রি
আসে গুটিগুটি ভল্লুকের মতো
ডিমের কুসুম ধীরে জলে ডুবে যায়
বরফের টুকরো পড়ে
পাথরের, শিলার টুকরো।
ছায়া লুপ্ত ভেঙে ভেঙে পাতালের দেশে
পুরুষ, সে তবু স্থির স্তম্ভের ভাস্কর্য
হাত থেকে খসে পড়ে ক্ষুরধার বল্লম
প্রাচীন প্রস্তর হাতিয়ার।
বন্য স্বভাবের আড়ালে দুর্বিনীত ঢেউ

রক্তকে নাচায় সিংহের কেশরে
যেখানে পর্বত
পর্বতের শিরে লাল সূর্যের মুকুট
অন্তহীন।
আর রৌদ্রময় সবুজ বন্দর
তার তীরে অপরূপ চিত্রিত শহর
আগামীর।
অথচ সমুদ্র টানে বিরুদ্ধ পাতালে।
জন্মান্ধ ঈগল তার স্বয়ংক্রিয় ডানার আগুনে
চিতার লাশের মতো দৃশ্যকে পোড়ায়
ধ্বংসের পাহাড় গড়ে
কালো কালো কয়লার বিক্ষিপ্ত পাহাড়
এবং পাহাড়ে মৃত্যু, অপেক্ষমান।

বিপন্ন পুরুষ
ফিরে গিয়ে গুহার দেয়ালে
বিচিত্র রঙে আঁকে ছবি অপূর্ব পশুর
কল্প-শিকারীর
সেই শহরের উঁচু উঁচু আশ্চর্য দালানের।
চর্বির প্রদীপের আলোয়
বোবা জীবনের শিল্প ফোটে শক্ত তুলির আঁচড়ে,
নারী তার ছায়া
রাত্রিভর জেগে থাকে পাশে
হাতে নিয়ে মৃত্তিকার রঙে ভরা পট।
গলায় তার বাঘের দাঁতের মালা
পাখির পালক কালো চুলের খোঁপায়।
দৃষ্টির আঁচল তার মুছে নেয় ঘাম, দুবিনেয়
ক্ষুধা হিমায়িত শ্বেত বর্বরতা
গত বিকেলের ক্লান্তি।

মনে হলো এই নারী রৌদ্রের বন্দর
দুরন্ত ঢেউ ভেঙে চলে উমিয়াক।

২

জীবনের আধখানা এপারে
সূর্যের নিচে গলছে
বাকিটা ওপার করেছে দখল
স্বত্বহীন।
জলের আয়নায় ভেঙে ভেঙে
টুকরো টুকরো আমি
রোমকূপে পর্যটক সমুদ্রের বালি।

আবার জ্বলেছে উৎসব
জুম পোড়ানোর বাজি
মুহুর্মুহু করতালি
আর আর্তনাদ
আবার জ্বলেছে উৎসব।
আখের পাতার মতো ধারালো শরীর
দুলিয়ে দুলিয়ে নাচে পাহাড়িয়া নারী
পুড়িয়ে পশুর মাংস পুড়িয়ে আগুনে
অবিরাম ঘুরে ঘুরে উড়ে উড়ে
অরণ্যের অতল জ্যোৎস্নায়।
মিলিত পায়ের শব্দে
ধমনীর হুলুস্থুল আছাড়ে পিছাড়ে
কবরের ঘুম ভেঙে যায়।
বাতাস আনছে বয়ে
ভয়ংকর যৌবনের গন্ধ
ধূপের গন্ধের মতো মর্মভেদী
আর বিষাক্ত বর্বর!
মাথার ওপর বানরের ভীষণ আওয়াজ
মাথার ওপর পাখিদের করুণ কীর্তন
মুখরিত আখবন; শেয়ালের শীৎকার
আত্মার চুল্লিতে ছারখার ধ্বংসের আঙার।

সবই আছে ঠিকঠাক প্রস্তরীয় যুগেও যেমন
শুধু সেই পৃথিবীর স্বপ্নময় মানবী কোথায়

অনার্য দর্পিত স্তন যার
ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব।

৩
সমুদ-তীরে কম্পিত সিডার
পিপ্পলি অরণ্য
শবর ও কিরাতের বসতি
মাইল মাইল আক্রান্ত বরফে।

দেখা যায়
মৎস্য-শিকারীর হাড়ের হার্পুন
শিঙের গাইতি
হাতির দাঁতের সুপ্রাচীন হাতিয়ার
নক্ষত্র চূর্ণিত।

ঢেউ
উত্থিত ঢেউয়ের ফণায় ভাসে উমিয়াক
আদিবাসী এস্কিমোর।
নক্ষত্রের গান-শোনা পাখি, পাখির চেতনা
শূন্যে হারায়।
আরো দূরে
ধূসর মৃত্তিকার গুহার দেয়ালে
ব্রন্টোসরাস, বাইসন
সিংহের ছবি
প্রস্তরযুগের বর্শায় বিদ্ধ।
রক্তে যে প্রস্তুতি ছিলো
এপ-প্রতীতির বিদ্রোহ
ক্রমেই স্তিমিত
রক্তক্ষরা জল ও জড়ের সংঘাতে।

পাখি, পরাজিত আমি
এই যজ্ঞে।
পরিতাপ নেই?
গর্জে ভারি ভারি হাতিয়ার

আরক্ত পাথরে
ডানার শব্দ তবু শব্দেও থামে না।

ধ্বংস জরায়ুর ফাঁদ
সৃষ্টিকে টানে দৃষ্টির ওপারে।

৪
ঘৃতাহুতি
মরুদ্যান অন্তর্হিত ঝঞ্ঝায়
মার্কেণ্ডেয়, মরেও পাবে না
এই বৃষ্টি
ক্রেসিডার রক্ত-বৃষ্টি ছিলো কিনা।
পরাহ্ন-বেলার পাখি
খোঁজো সমাধির মমির মর্মার্থ
আদি-পৃথিবীর হীনতা।
পাতায় যে জমা থাকে তুষারের কণা
বিন্দু বিন্দু জল
রৌদ্রতৃষ্ণাকাম তাকে পায়।
তবু একদিন
বরফ-মিশ্রিত বাতাসের ব্লেড
মাংসগ্রন্থি কেটে
ওড়াবে পালকরাশি শূন্যে
আরও দূরে নক্ষত্রের ওপারে।

তারপর
পৃথিবী আড়াল হবে। সূর্যনাশা
নৈরাজ্য প্রেত বাজাবে ডুগডুগি
পাখি-প্রজাতির কঙ্কালে।

৫
হার্পুন ছুঁড়েছো নীল সমুদ্রের জলে
অবেলায়।
বিদ্ধ হলো কিছু ?
তুমি পরাজিত।

প্রাচীন পুরুষ
তুমি পরাজিত সমুদ্রের কাছে।

তুষার রাত্রি।
চারপাশে কালো কালো কয়লার পাহাড়
বরফের হিমবাহ
আর ছিন্ন কঙ্কালরাশি
হাড়ের পর্বত।
এখন কোথায় যাবে?
কে নেবে তিক্ততা?
অরণ্যে দাবাগ্নি
হোমাগ্নির হোলি খেলা শান্ত
শিকারীরা বরফের নিচে চাপা
চাপা, পাথরের নিচে
পাথরে স্তব্ধতা
পাথরের গায়ে বর্শাবিদ্ধ ভালুকের ছবি
ছবির স্তব্ধতা
স্তব্ধতা লেহন করে বিলুপ্ত চিন্তার কাটা-জিহ্বা
জিহ্বার শিকার তুমি
কে নেবে তিক্ততা?
পাখিও পুড়েছে স্বয়ংক্রিয় পাখার আগুনে
আগুনের বিশ্বাসহন্তায়।

কোথায় নকশাময় চিত্রিত শহর?
রৌদ্রের বন্দর
তা কি সেই অমালোক সমুদ্রের পাড়ে?

সূর্যদেবতার শক্তি ছিলো তোমার বাহুতে
রোমশ শরীরে।
আজ নিঃশেষ
আজ পরাজয়।

বাউল কবি কালু শাহ ঃ একটি প্রাথমিক আলোচনা

আলোচক
তারেক মাহমুদ

একটি দেশের মেজাজ ঐতিহ্য, ইতিহাস নির্ভর করে সে দেশের লোক সাহিত্যের উপর। বলা উচিত লোক সাহিত্য একটি দেশের শেকড়। শেকড় ছাড়া যেমন জীবন্ত বৃক্ষকে কল্পনা করা যায় না, লোক সাহিত্য তেমনি।

এদেশেও রয়েছে লোক সাহিত্যের এক বিশাল ঐতিহ্য। কালের প্রবাহে আমরা যতই নাগরিক হয়ে উঠি না কেনো লোক-কথা বা লোক সাহিত্যের বাইরে যেতে আমরা কখনোই পারবো না। লোক কবিতা, লোক গান-গীতি, জারি, সারি এসব আমাদের শেকড়ের কথা। যদিও নাগরিক জীবন আমাদের ঠেলে দিচ্ছে যান্ত্রিকতার দিকে নন ফিলোসফির দিকে তবুও ফোক ট্রাডি-শনকে অতিক্রম করা আমাদের অসম্ভব এবং অনুচিত। লোক-এর সঙ্গে নাগরিক জীবন মিশিয়ে এক ধরণের কালচার এদেশে শুরু হয়ে গেছে কিন্তু তা কেবল ক্ষণ স্থায়িত্বের দিকেই যাবে।

লালন পরবর্তী সময়ের লোক কবি কালু শাহ। কালু শাহ-এর দর্শন বাউলতত্ব নিয়ে নতুন করে ভাবনা চিন্তা চলছে। কালু শাহ ১৮১০ সালে জন্মগ্রহণ করেন উল্লাপাড়ায়। উল্লাপাড়া হলো সিরাজগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি থানা। এর আগে সিরাজগঞ্জ ছিলো বৃহত্তর পাবনা জেলার মধ্যে। লালন শাহ, শীতালং শাহ, পাগলা কানাই-এর পরই কালু শাহ-এর নাম বেশ প্রসিদ্ধ ছিলো। কালু শাহ-এর বাল্য নাম ছিলো আছিমুদ্দিন। পিতার নাম নিতাই বেপারী আর মা হলেন নুরজাহান বেগম। অছিমুদ্দিনের গাঁয়ের রং ছিলো কালো। তাঁর মা তাঁকে আদর করে ডাকতেন কালু। অছিমুদ্দিন তাঁর মাকে খুব ভালোবাসতেন। সে কারণে মায়ের দেয়া আদরের ডাক নামটিই তিনি গ্রহণ করলেন, হয়ে গেলেন কালু শাহ।

কিশোর বেলা থেকে কালু শাহ মুখে মুখে ছড়া বানাতেন। যে ছড়াগুলো ছিলো গভীরতায় ভরা। কালু শাহ-এর স্ত্রী ছিলো চার জন। চার স্ত্রীর মধ্যে দুজন সাটুরিয়া থানার কাউন্নারা গ্রামের এবং অন্য দুজন ছিলেন টাঙ্গাইল জেলার। কাউন্নারা গ্রাম ছিলো কালু শাহ-এর নানার বাড়ী। কালু শাহ-এর বয়স যখন দশ বছর তখন তার পিতা মাতা বালক কালু শাহ-কে নিয়ে তার নানা বাড়ী কাউন্নারাতে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন। কাউন্নারা হলো মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া থানার একটি গ্রাম।

তাঁর প্রথম স্ত্রীর নাম আমেনা খাতুন (সাটুরিয়া)। আমিনা খাতুনের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন সদ্দিক শাহ এবং নেধু শাহ। বিবি আমির জানের (সাটুরিয়া) গর্ভে আইনুদ্দীন, সাতিলা খাতুন (টাঙ্গাইল)-এর গর্ভে টুকু শাহ, ফতেহ জান (টাঙ্গাইল)-এর গর্ভে হাবিবা খাতুন জন্মগ্রহণ করেন। কালু শাহ-এর পাঁচ সন্তানের মধ্যে নেধু শাহ ছাড়া আর কেউ আধ্যাত্ব সাধনায় নিমগ্ন হোননি।

কালু শাহ-এর গানগুলো গভীর আধ্যাত্ব সাধনার কথা বলে। তাঁর একটি গান হলো ঃ

প্রেমের ভাব জানে কয় জনা
যে যন প্রেম যানে প্রেম কর তার সনে
সরমিকের সঙ্গে প্রেম কইর না ॥

কেহ হয় টাকার পাগল, কেহ হয় ভাবের পাগল
কেহ হয় রূপের পাগল, আল্লাহর প্রেমে হয় কয়জনা
যেমন মুছা পয়গাম্বর প্রেমে মইজা, আল্লাহকে দেখতে যায় সাজিয়া
কহতুর পাহাড় যায় জ্বলিয়া মুছা তবু টের পাইল না ॥
সে পিরিতের এতো জ্বালা মনপ্রাণ সদাই থাকে উতালা
কত রসিকে সেই প্রেমে মজে কালু শা'র বুঝি
সেই প্রেম হইল না।

(সম্পূর্ণ গান)

লোক সাহিত্য জীবনের মৌলিক একটি দিক। রবীন্দ্রনাথও অনুপ্রাণীত হয়েছিলেন সে দিকে। তার বিভিন্ন রচনাবলী সে সাক্ষ বহন করে। আমাদের পল্লীকবি জসিমউদ্দীনের প্রধান উপাদান ছিলো 'লোক''। লণ্ডনে অনুষ্ঠিত এক সাহিত্য সম্মেলন প্রসঙ্গে তিনি

বলেছিলেন, "নিজের দেশের আসল জিনিস দিয়াই অন্যের মন ভুলানো যায়। নকল জিনিস দিয়া নহে। ইহার পর শুরু করিলাম পল্লী বাংলার ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালী, বাউল গানের কথা। জারী, সারি, মারফতি, মুর্শিদী, বাইদ্যার গানের কথা। আসর যেন মাত হইয়া গেলো। বক্তৃতা শেষ করিলাম। সকল শ্রোতা উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমাকে সম্মান দেখাইল। আমি তো নিমিত্ত মাত্র। এ সম্মান দেখাইল তাঁরা পল্লী বাংলার মানুষকে, তাদের গানকে। আমাদের লোক ঐতিহ্যের মহান সম্পদকে!"

লোকজ উপাদান, লোকজ শিল্প, লোকজ সম্মান সবই আমাদের নিজস্বতা বহন করে। জসীমউদ্দীনের ভাষায় বলতে গেলে বলা যায় সেগুলো আমাদের আসল জিনিস।

কালু শাহ-এর গানের অন্যতম গায়ক ছিলেন পাগলা শামসু। পাগলা শামসুর গাওয়া কালু শাহ-এর আরো দুটো গান নীচে দেয়া হলো ঃ

(১)

কি রূপ হেরিলাম আমি এই নয়নে
আমার দুই নয়নে বহে ধারা, পাষরি আমি রূপ কেমনে ।।
যখন আমি ঘুমে পরি, ঐ রূপ আমি তখন হেরি
আমার দুই নয়নে বহে বারি, সারা রাত্রি যায় কান্দনে ।।
প্রেম পিরিতি ভালো বাসা, আমার কোনটা নাই ভরসা
আমি হইলাম সর্বনাসা, হারাইলাম আমি অভিমানে ।।
যখন দেখি সেই রূপের ঝলক, আমার চোখে না পরে পলক
কালু শা তাই পরল গোলক, সৈয়দ আমার নাই সামনে ।।

(২)

রাধার ভাব কৃষ্ণ প্রেম আছে যার অন্তরে
 সে কি ঘরে রইতে পারে হে
কৃষ্ণ প্রেমের প্রেমিক যে জন হয়,
কথা হোক না হোক বল সখি
তারে দেখলে চিনা যায়
ও তার আঁখি দুইটি ঢুল ঢুলছে,
ধারা বহে তার দুই নয়নে ।।

কৃষ্ণ প্রেমে যে জন মইজাছে, কৃষ্ণচরণ নিয়ে যে রত্ন পাইয়াছে
যে পায় রত্ন করে যত্ন হে
তার সারা অঙ্গে সাঁতার খেলতেছে, কালু শা তা বইলাছে হে।

এই দুটি গানের মধ্যে প্রথম গানের শেষ লাইনে লেখা আছে "সৈয়দ আমার নাই সামনে।" এই সৈয়দ অর্থাৎ সৈয়দ আতাউর রহমান। সৈয়দ রহমান ছিলেন একজন মস্তবড় পীর। এই পীরের মুরীদ ছিলেন কালু শাহ আর তাঁর মামাতো ভাই হাজী আশরাফ আলী। পীর সৈয়দ আতাউর রহমান পরিচিত ছিলেন সৈয়দ শাহ নামে। ধামরাইতে সৈয়দ শাহ-এর মাজার রয়েছে।

কালু শাহ প্রায় দু' হাজার গান রচনা করেছেন। তার প্রায় পাঁচ শত গান উদ্ধার করা গেছে এ পর্যন্ত (মানিকগঞ্জ জেলার লোক সাহিত্য, নূরুল আলম খান, সৈয়দ আসগর সম্পাদিত গ্রন্থের তথ্য অনুযায়ী। এ লেখাটির তথ্য সংগ্রহে এই গ্রন্থটির অবদান রয়েছে)। তত্ত্বগত দিক থেকে উদ্ধারকৃত গানগুলোকে খোদাতত্ত্ব, নবীতত্ত্ব, রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব, দেহতত্ত্ব বা বাউল তত্ত্ব, মানব তত্ত্ব, মুর্শিদী বা গুরুতত্ত্ব; নামাজ তত্ত্ব, হজ্ব তত্ত্ব, মেরাজ তত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, তরীকা তত্ত্ব, সাধন তত্ত্ব প্রভৃতি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। গানের নামগত দিক থেকে কালু শাহ'র গানে হামদ-নাত, বাউল, মারেফতী, মুর্শিদী, বিচার গান, আঞ্চলিক গান, কৃষ্ণ বিষয়ক গান, নাম গান; ফকিরালী গান, লোক-সঙ্গীত, শব্দ গান, ভাব সঙ্গীত প্রভৃতি বিভাগ প্রযুক্ত হতে পারে।

কালু শাহর মৃত্যুর বহু বছর পর তাঁর জীবন ও সাহিত্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আলোচিত হয়। কালু শাহ সম্পর্কে আমেরিকার পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিশ্ববিশ্রুত ফোকলোরিস্ট ডঃ হেনরী গ্লাসি বলেছেন, "কালু শাহর গান লোক সাহিত্যে একটি ঐশ্বর্য সম্পদ। এই সম্পদ উদ্ধার করতে হবে। ছড়িয়ে দিতে হবে কালু শাহর দর্শন। কালু শাহর আদর্শ ও তাঁর চিন্তাধারাকে অনুসরণ করা হলে মানব সমাজে হানা হানি দূর হবে। অপর দিকে মানুষে মানুষে ভালবাসা ও স্নেহ বাড়বে।"

বাংলাদেশের বিখ্যাত লোক গবেষক ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী কালু শাহ সম্পর্কে বলেছেন। "কালু শাহ সম্বন্ধে যা পড়েছি এবং জানতে পেরেছি

তাতে তাঁকে লালন, পাঞ্জু শাহ, পাগলা কানাই, হাসন রাজা, ভোলা শাহ, শীতালং শাহের মতই উঁচু দরের সাধক বলে মনে হয়েছে।"

নবী তত্ত্বের উপরে লেখা কালু শাহর একটি গান এখানে উল্লেখ করছি ঃ

"রাসুল মানুষ চিনতে পাইলে, পুল পার হইতে পারবি
ও তুই না চিনিয়া কারে ধরবি ও তুই কুলে ডুইবা মরবি ॥
চুলের চেয়ে মিহিন পুলরে পুলে পাওনা রাখা যায়রে
রাসুল নামের চেরাক ধরিলে অনায়াসে পুল পার হবি
ঝিকিমিকি করে পুলরে, হিরা চাইতে বেশী ধার

যে হইয়াছে নবির উম্মত সে পার হইতে পারবি।
কালু শা ফকিরে বলেরে অমাব্যাইশার হইতে অন্ধকার
নবিজির নুরের যোতে তোরা পার হইতে পারবি ॥

(সম্পূর্ণ গান)

এই মহান সাধক, বাউল, লোক কবি কালু শাহ প্রায় ছিয়ানব্বই বছর বেঁচে ছিলেন। ১৯০৬ সালে (বাংলা ১৩১১ সালের ১১ অগ্রহায়ণ) মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া থানার কাউন্নারা গ্রামে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কাউন্নারাতেই তার মাজার আছে। প্রতি বছর মাঘ মাসের চাঁদের ১০ ও ১১ তারিখে তাঁর মাজারে ওরস অনুষ্ঠিত হয়।

দেবাশীষ ভট্টাচার্য-এর জলের দহন এবং চন্দন কুমার ভট্টাচার্য-এর অরণ্যে চন্দনের ঘ্রাণ ঃ একটি নেতিবাচক আলোচনা

এক

"সাহিত্যের প্রাণধারা বয় ভাষার নাড়ীতে, তাকে নাড়া দিলে মূল রচনার হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়। এরকম সাহিত্যে বিষয়বস্তুটা নিশ্চেষ্ট হয় পড়ে, যদি তার সজীবতা না থাকে।"—বাঙলা ১৩৪১ সালের মাঘে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "সাহিত্যে আধুনিকতা'য় উল্লেখিত প্রারম্ভিক ভাষ্য। বিংশ শতাব্দীর অস্তাকালে ১৪০৫-এসে ব্রেনকে আরেক-বার নাড়া দিয়ে যায়, মেধা ও মননে, স্বাধ্যায়ী প্রগাঢ়তায়। কবি দেবাশীষ ভট্টাচার্যের "জলের দহন"—আমাদের প্রাপ্তির অপূর্ণতা। পাওয়ার মাঝে না পাওয়ার লুপ্ত বেদনা প্রতিটি সংবেদনশীল মানুষকেই ছুঁয়ে যায়। আমি মনে করি দেবাশীষ ভট্টাচার্য-এর উর্ধ্বে নন। তবু কোথায় যেন একটা শৈল্পিক সৌন্দর্যতার আড়ালে কৃত্রিম শূন্যতার আধার গ্রাস করে। মনের ভেজানো পাতায় বারবার ফিরে যেতে হয় রবীন্দ্রনাথের সেই পঙক্তিমালার কাছে।—"হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়, নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে"—বৃত্তানুপ্রাস ঘটে, বৃত্তানুপ্রাস ঘটে, বৃত্তানুপ্রাস ঘটে এবং জিজ্ঞাসা! "জলের দহন" কবি দেবাশীষ ভট্টাচার্যের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। কবিতা সংখ্যা—বাইশ। প্রকাশকাল—নজরুল জন্মদিবস ১৪০৩। প্রচ্ছদ—বিষ্ণু সামন্ত। প্রকাশ করেছেন—সাহিত্যপত্র প্রকাশন, কলকাতা ৯১। লেটার প্রিন্টে ঝকঝকে ছাপা, মুদ্রণ প্রমাদ নেই বললেই চলে। দাম দশ টাকা।

দেবাশীষের আর্টিস্ট মনোভঙ্গি অনেকখানি বাঁধা পড়েছে—তার শব্দ-গাঠনিক কৌশলতার গভীরে। ফলে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে উপমা-রূপকের পরিবর্তে এসেছে বিভিন্ন আঞ্চলিক শব্দ, পুরোনো শব্দ ও শব্দ-পঙক্তি। সেক্ষেত্রে তিনি কিছু কিছু বিষয়ে উৎরিয়ে গেলেও পুরোপুরি সফল হননি।

আলোচক
ফিরোজ আহমেদ

তার লেখায় অগ্রজদের ধারাবাহিকতা পুরোপুরি লক্ষ্যযোগ্য না হলেও, শব্দ ও ভাষা ব্যবহারে এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। মোট কথা চমক লাগানোর একটা চেষ্টা দেবাশীষে প্রোথিত। শব্দ-ব্যবহারে তার চাতুর্যতা আধুনিকতাকে ছুঁতে পারেনি, বরং আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে কিছুটা হলেও বিভ্রান্ত করেছে। এর পরেও যে সুকৌশলে শব্দের আঁট বেঁধেছেন তা চমৎকারিত্ব।

আমার পাঁজর খুঁড়ে প্রতিদিন
খেয়ে যাচ্ছে জল
ফাঁক পেলেই আমি
আবাহনের বাজনা বাজাই
যেতে চাই বসন্ত রাগের কাছে

—উৎসর্গ পর্বের খণ্ড কবিতা-সৃষ্টি উদ্ধৃতি অংশ। কাব্যগ্রন্থের নাম-করণের একটা মৌলিক উপাদান সংগ্রহ—আমরা এ ক'টি লাইনের মধ্যেই লক্ষ্য করবো।

কবি দেবাশীষ ভট্টাচার্যের 'জলের দহন'-এর একটি সামগ্রিক খণ্ড চিত্রকল্প নিম্নরূপ—

শরীরে রোগ নেই
তবু কেন সারে না
শরীর
আমাকে করে দাও
অন্ধ, বধির

(পশ্চিমবঙ্গ)

এইভাবে কোমর বেঁধে আজকাল কেউ লুঙ্গি পরে না
উন্নত উরু সব লুঙ্গির কল্যাণে ঢাকাঢুকি থাকে

(মনে রেখো, কলির মনসা)

বিলাসপুরে লেখা হবে মাখন মাখন শরীরী কবিতা।
তা হতেই পারে—
রামপ্রসাদপুরে সেই কবিতা চাওয়া কেন!

(বিলাসপুর বনাম রামপ্রসাদপুর)

কাকে ভজবে মন
অবতার লাখ
বরং চল
কলমী শাক
তুলিগে!

(রামকৃষ্ণ বলেছিলেন—২)

আমার ঘরের তিনটি দেওয়াল
এক দেওয়ালে—কৃষ্ণ লেলিন সীতা এবং হেলেন
আমার ঘরের তিনটি দেওয়াল
এক দেওয়ালে জিয়া, রেগন, গান্ধী এবং ম্যাণ্ডেলা

(আমার ঘরের তিনটি দেওয়াল)

পদ্ম আর প্রজাপতির কথা আর বলবেন না!
যদি বলতেই হয় সতী সাবিত্রীর দেশে
হে আমার মাননীয় শালা ও শালীকাবৃন্দ!

(নকল সাংবাদিক)

সময়োচিত তাজা মাংসে যখন সাজানো হল প্লেট
অতঃপর বেজে উঠবে মধ্যজীবী বাবুর ক্যাসেট

(বিবাহ)

রাস্তায় কলার ধরে আমাকে একজন মারলো সজোরে ঘুষি
হঠাৎ ঘুষি খেয়ে পড়েছি যার পায়ে সে দেখি আমাকে নিয়ে
মেতে উঠলো আরো তীব্র রসিকতায়
বল্লো ঃ তক্ষুনি বলেছিলাম তোকে নিজের খেয়াল খুশীতে
হাঁটতে নেই।......................

(অবাধ গণতন্ত্র)

মাত্র পঞ্চাশ। ব্যাস্ কেল্লাফতে
বল্লাম স্যার' এইখানে সাইন করুন
এইখানে দিন ক্রশ
তিনি আমার বস্ চেয়ারের অহঙ্কারে
আমাকে মুর্গী নাচ নাচন

(উচ্ছন্ন সিরিজের কবিতা—২)

ধর্মের পত্নী। ধর্মপত্নী। সাফ করেছেন তিনি পতিদেবতার বমন।
গতকাল খুউব অ্যালকোহল রমন তাহার কোমর উর্ধ্বে তুলতে
দিচ্ছে না আর
দুর্বোধ্য লিপির মতন অই সুখে সুখ কিম্বা দুঃখের ছবি খোঁজা
বাতুলতা।
ধর্মের বাহিরে চৌকাঠের বাহিরে তিনি রাখেন না পা। ধর্ম
খুব ভাগ্যবান, ওরে, তোরা ধর্মের গান গা।

(বাজে কথা)

পুরলিয়ার ছেলে, তুমি দেখ নাই ছৌ
কলকাতা তিনশ নিয়ে করেছ বিস্তর পড়াশুনা

(ক্ষতি নেই)

আকাশের সীমা আছে পৃথিবীর শেষ
জীবনের যতি আছে শোন্ নিখিলেশ

(রাত্রির প্রান্তিকে)

আমাদের চারিপাশে আছে
সার্থক প্রবাদ যতো
আটাত্তরের নদী
বিজ্ঞাপনের নারী
বিষাক্ত সরীসৃপ
ভেদবুদ্ধির ছুরি

(আমাদের ঝুলিতে)

মেঘ জানে, জলের দহন
মেঘবরণ কন্যা
তুমি কি জানো না জলের মত সহজ—
সরল মানুষের ভাষা?
অথচ তোমাকে নিয়ে আমার উচ্চাশা
অনেক!

(তৃষ্ণা—১)

ঝিন্‌চাক মিউজিক বাজছে গাঁয়ের বটতলায়
বাউল পবনদাসের বেটা আমাদের ঘরের দাওয়ায়

মাসিক কিস্তিতে পৌঁছে দিচ্ছে—
রঙীন টি, ভি, ভি, ডি, ও, ফ্রিজ

(ঠাণ্ডা-গরম)

স্খল

দুগ্‌গাকে দ্যায়নি ছুঁতে
এখন তা তা থৈ থৈ জলে
সাঁতার কাটতে কাটতে
দুগ্‌গাকে তুলে আনছে
দুলে বাগ্‌দি

(পরিণতি)

মাচান থেকে লাঙ্গল এলো বলরামের কাঁধে
বহুদিনপর পরস্পর ছাড়পত্র জড়াজড়ির
এয়োতি ডালিম মধুর স্মৃতি লজ্জায় কামরাঙা
শিল্পীর তুলি বাইদ জমিতে আজ লাঙ্গলের ফলা

(কৃষি কথা—১)

লালবল গড়িয়ে পড়লো সবুজ গালিচায়
হলুদ ব্যাট হাতে আমাদের আদুরে বালগোপাল
উদোম ছুটে এসে থমকে দাঁড়ায় কয়েক প্রহর

(অনুভব)

অবশেষে শরীরকেই দায়ী করলো সে,
ভাসান হলো মেয়েরা।

(লজ্জা)

মোটামুটিভাবে "জলের দহন"-এ, কবির যন্ত্রণা বা কষ্ট এখানে, যেখানে কবি বাঁধা পড়েছেন। কবি দেবাশীষ ভট্টাচার্য একদিকে আধুনিকতা ছুঁতে চেয়েছেন, অন্যদিকে তিনি আটকা পড়েছেন প্রচলিত ধারাবাহিকতায়। তিনি একদিকে 'ছোট কাগজ', সাহিত্য আন্দোলনের স্রষ্টা ও কর্মীদের সঙ্গে সুর মিলিয়েছেন, অন্যদিকে ভাষাশৈলী, বাক্য ও শব্দ ব্যবহারের নাজুকতায় পিছিয়ে পড়েছেন পূর্বজনদের কাতারে। সেক্ষেত্রে উত্তরণের সম্ভাবনা ক্ষয়ে যায়নি এমন বলা যায় না। তারপরেও দেবাশীষের কাছে আমাদের আশা অনেক। তিনি আমাদের

নতুন একটা কিছু বলতে চেয়েছেন—এখানেই আমাদের সবচেয়ে বড়ো আশা।

"কবিতার জন্য কবিতা" ; 'জীবনের জন্য জীবন'—ইহা সত্য নয়।" "শিল্পের জন্য শিল্প.' 'মানুষের জন্য জীবন'—ইহাই দিব্য সত্য।"—সেক্ষেত্রে আর্টকে চার্ট করা কখনোই ঠিক হবে না। আলোচ্য কাব্য-গ্রন্থের কবি দেবাশীষ ভট্টাচার্য সমাজ সচেতন, শিল্পমনা ও আধুনিক। তিনি কুসংস্কারকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, সংস্কারকে মূল্যায়ন। স্বকীয় সৃষ্ট মতবাদ ঠেসে দেবার চেষ্টা করেননি. তবে স্বকীয় মতবাদ-ও সুস্পষ্ট নয়। তিনি কাব্যের মধ্যে কবিতার বক্তব্যকে প্রধান করে তুলতে চেয়েছেন। সেক্ষেত্রে তিনি হয়েছেন বক্তব্য প্রধান কবি। শ্লোগানের মতোন বিষয়াবলী তাঁর কবিতাতে লক্ষনীয় না হলেও, বক্তব্য দানা বেঁধেছে পলে পলে। তিনি শব্দচয়নে কিছুটা হলেও অলস, পুরোনোপন্থী ও ধারাবাহিকতায় বিশ্বাসী। কখনো কখনো তা হয়েছে শিল্পোত্তীর্ণ। তিনি অবেগাশ্রিত হয়েছেন, কুন্ঠিত হয়েছেন, লজ্জিত হয়েছেন। 'লজ্জা' কবিতায় দেবাশীষের লজ্জা আমাদের আকর্ষণ করে—"লজ্জা শুধু তাদেরই জন্য যারা এখনও পণ্য এবং/ পণ্যার মানে জানে না।" কবি মানেই একজন সমাজমনস্ক মানুষ (তথাকথিত বাক)। দেবাশীষও সমাজের পরতে পরতে ঢুকতে চেয়েছেন। সার্থকতা বিচার্য।

বিশ্বসাহিত্য—ইংরেজী, গ্রীক, আইরিশ. জার্মানী এমনকি আমাদের বাংলা সাহিত্যেও দেখা যায় যে, কবিতা জন্ম-উৎসবকালে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে গীত হয়েছে, আবার কখনো বা নৃত্যের সঙ্গে। আধুনিক কালে কবিতা শুধুমাত্র পাঠের যোগ্য করেই লেখা হচ্ছে। এক্ষেত্রে দেবাশীষ সফলকাম হয়েছেন। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থে এসেও দেবাশীষের কাব্যিক সফলতা প্রশ্নাতীত। তবে তার সীমাবদ্ধতা এবং মূলে ফিরে যাবার একটা প্রবণতা আলোচনার বিষয়। প্রকাশিত কবিতাগুলি অনেকাংশে অবশ্যই কবিতা হয়েছে! এবং কতটুকু হয়নি অথবা হওয়া উচিত ছিলো—তাও আলোচনার বিষয়। আমরা শুধু-মাত্র-এর সামগ্রিক আলোচনার উপর একটা সূত্রপাত করলাম। অনেকটা এ রকমই। দেবাশীষের মধ্যে শৈল্পিক প্রখরতা আছে, আছে ধীশক্তি। আমরা তার কাছ থেকে আরো উত্তম কাব্য ও কাব্যগ্রন্থ আশা করছি।

দেবাশীষ ভট্টাচার্য-এর এই সময়ের কবিতা

উপনিবেশ

১

কালাহাণ্ডি বাঁয়ে একটু ডাইনে
মুভ করলেই বৃকোদরের কাটআউট
সেইখানে একদল মাধুরীর ডামি
আপনাকে দীক্ষিত কোরে নিয়ে যাবেন
ভেতরে—রসগোল্লা উৎসব
স্যার! ফিরতিপথে যাওয়ার সময়
রসগোল্লার সাইজ আমায় জানাবেন!

২

একটি পিঁপড়েও পাবে না প্রবেশ অধিকার
আসবেন সংস্কৃতি মন্ত্রী বিদেশী টি-ভি-র জোকার
এ নগর মেতে উঠবেন যৌন কর্মীর চেহারায়
এই উৎসবে বৎস-রা পাবে না মায়ের দুধ
মাসীদের গল্প নেই বহুদিন তারা ফেরার জন্ম নিয়ন্ত্রণে
আগামীতে গাভীরা যাবেন শৃগাল শকুনের আড্ডায়
প্রার্থনায়—চোখের জল ছাড়া তাদের পকেটে কোন রেস্ত নেই
তৃতীয় বিশ্বের বাঁচা রসগোল্লার মতন

৩

উৎসব প্রাঙ্গণের অনতিদূরে শিল্প প্রদর্শনী
বন্ধ কারখানার তালাগুলির চমৎকার ড্রয়িং
জমি দিতে অনিচ্ছুক সেকালের মানুষের ছবি
হয়তো আপনার কোন পূর্বপুরুষের মুখ
পুরাতন শেরশাহের পথ পথের দুধারে বৃক্ষ
গোয়াল ভরা গরু মোষ পুকুর ভরা মাছ
আপনি দেখতে পাবেন......দেখতে পাবেন

অজস্র প্রধানমন্ত্রীর মুখ সহস্র দলের নামধাম
রসগোল্লার রসের মতো সে সব উপাদেয় জানবেন

৪

মুঠোয় কী আছে সময় ?   মন্থরা মুখে শুনি
রমণের সময়েও আজকাল বাঁধা থাকে ঘড়ি
থাকলে হৃদয় নাচান একটু এগিয়ে যান
মনভুল ফিদা হুসেনের একক চিত্র প্রদর্শনী
জ্ঞানের দেবীকে দেখুন রসবতী নগ্নরতি
জানু ছুঁয়ে লক্ষ্মী আসে ঐপথে প্রগতি
নাচে বিকিনি ভাঁড় ও মাতাল
বাজার বিশাল তর্কে বিতর্কে প্রতিষ্ঠান
প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠান বিরোধীতা এই দুই
কী চমৎকার ছুঁই ছুঁই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ
যেমন ব্যালট পেপার জনগণেশের রায় হাং পার্লামেন্ট

৫

যে যার ঘোড়ার চানা চিনে নিতে ব্যালট পেপারে
ছোঁড়ে ফলের আগুন বড়ো ঝাণ্ডা কোং ছোট ঝাণ্ডার প্রভুটিরে
কিনে নিতে—ছোটরা জেনে নিতে তাহাদের বাজার দর
মেতে ওঠে এই উপবনে।   সবাই স্বার্থপতির বউ
নবাবের হারেমে খোজার প্রহরায় বিশ্বস্ত থাকে
অন্য কোন উপপতির ধার ধারে না

গাঁটছড়া বাঁধাবাঁধির পরবপর্ব শেষে
অসফল মৈথুনের খিটখিটে মেজাজ টমটম টমটম
ওড়ে শব্দের জুড়িগাড়ী প্রগলভ বাতাসে
ব্রহ্মের গুড়ো ঝরে ঋর্ণানুসারী মগজনিধন গল্প উপন্যাসে
আহা কত কীর্তি স্বচ্ছলতা নিত্য নোতুন পোষাকে
ক্ষোভ দমন অপেক্ষাকৃত-র নির্বাচন ব্যালট বাক্সের ভোরে....

কার্পণ্য নেইত কিছুর
অকাশ নিটোল চাঁদ, চাঁচর সম্মোহ
উৎসায় আপ্লুত কিংশুকের
অরিনা বিদ্রোহ

আবেগ কাব্যের জন্য অপরিহার্য বিষয়-বিশেষ না হলেও, কাব্যের জন্য আবেগের তাৎপর্য উপেক্ষণীয় নয়। সংযমিত আবেগ এবং মনের মাধুর্যমণ্ডিত সুষম প্রকাশ কবিতাকে অনেকাংশে উত্তীর্ণ করে। এদিক দিয়ে মর্যাদার দাবীদার চন্দন কুমার ভট্টাচার্য। কাব্যগ্রন্থের নাম : অরণ্যে চন্দনের ঘ্রাণ, কবি : চন্দন কুমার ভট্টাচার্য। জাদু জান তুমি কি বালিকা, ঝরা পাতার সন্ধিক্ষণে; আর কত সর্বনাশ চাও, সে এক সময় ছিল, ভালোবাসার ঘ্রাণ, যুবক বয়স—কবিতাগুলি উল্লেখযোগ্য বইয়ের সংখ্যা। বইটি প্রকাশিত হয়েছে কলকাতা থেকে। এটি কবির প্রথম একক কাব্যগ্রন্থ। লেটার প্রিন্টে ছাপা। মুদ্রণ ত্রুটি লক্ষ্যযোগ্য নয়। লিটল কাগজের আইডিয়ায় বইটির মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন হলেও, স্বল্প পরিসরের মধ্যেও বইটির তাৎপর্য ও গুণগত মান বৈচিত্র্যপূর্ণ।

'নিরপত্তা' এবং 'দূরবীণ' নাম দিয়ে বইটিকে দু'টি পর্বে বিভক্ত করলেও কবিতাগুলি সামঞ্জস্য সৌন্দর্যমণ্ডিত। কবিতা সংখ্যা—২৮।

> হৃদয় হলুদ এখন
> বনানীর রুক্ষ চলে ধূসর ধুলো
> অথচ এ অরণ্যে একদিন চন্দনের সুবাস ছিল
>
> (অরণ্যে চন্দনের ঘ্রাণ)

অকথিত ভালোবাসার গণ্ডি পেরিয়ে একটি আত্মকেন্দ্রিক বা আত্ম-নির্ভর ভালোবাসার কবিতা দিয়ে কাব্যগ্রন্থের শুরুটা লক্ষণীয় হলেও শেষ পর্যন্ত কাব্যের মধ্যে এসে ধরা পড়েছে ট্রাজিক পরিণতি। আইডেনটিটি ক্রাইসিজ বা ব্যক্তিক দ্বন্দ্ব কবিকে বিমুগ্ধ করলেও বিপন্ন করেনি। তিনি কাটিয়ে উঠেছেন ব্যক্তিক দ্বন্দ্ব এবং রূপায়ন করেছেন শৈল্পিক মাধুর্য। কবিতাগুলোতে শিল্পিত সৌন্দর্য লুণ্ঠিত না করে কবি ব্যাকরণিক কলা কৌশল বা ছন্দের মতোন পাই পাই

হিসেবগুলোকে এড়িয়ে গেছেন সচেতন ভাবেই। তবে কিছু ছন্দ অনেকাংশে রক্ষিতও হয়েছে। অলঙ্কারিক গুণটি মর্যাদাহীন হয়নি ফলে কবিতাগুলো সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করলে জীবনানন্দ দাশের একটা নীরব উপস্থিতি লক্ষণীয়—

ধূলোয় ধূসর হৃদয়খানি পড়েছিল অবহেলার অন্তরালে
ভালোবাসার গোলাপজলে তাকে তুমি স্নান করালে
অন্যমনা স্বভাবটাকে চোখের টানে বাঁধলে ভালো
এখন আমার হৃদয় জুড়ে ফুল পরাগের নম্র আলো
কোমল কালো চোখের ভেতর ডানা ওড়ায় প্রজাপতি
ঝরা পাতার সন্ধিক্ষণে দিলে বৃন্ত খোলার অনুমতি।

(ঝরা পাতার সন্ধিক্ষণে

চন্দন কুমার এখানে উতরিয়েছেন জীবনানন্দকে। তিনি আবির্ভূত হয়েছেন—স্বয়ং অন্য এক জীবনানন্দে। এখানের চন্দন কুমার ভট্টাচার্যের সার্থকতা এবং তিনি নির্মাণ কৌশল ও শব্দ চাতুর্যে ফুটিয়ে তুলেছেন নতুন শিল্প মাধুর্য—যা আমাদের আরেক আধুনিক ও প্রধান কবির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

চন্দন কুমার ভট্টাচার্যের লেখায় একদিকে যেমন উচ্ছ্বাস, আনন্দ ভালোবাসা ফুটে উঠেছে, অন্যদিকে তেমনি ফুটে উঠেছে ক্ষোভ 'কমরেড'—কবিতা তার প্রতিফলন—

পাঁচগজ লাল শালু মুফতে পেয়ে যেতে
শীতের দাঁত থেকে ছাড়া পেয়ে গেলাম
অথচ লোকে বুঝল আমি খাঁটি কমরেড

তাঁর লেখায় কমিউনিজমের একটা গন্ধ লক্ষ্যযোগ্য হলেও, স্পষ্ট নয়

শস্যের খামারে সিঁদ কাটে
তস্কর ইঁদুর
ঘুষের প্রকোপে অন্ধ পেচকের চৌকিদার চোখ

লাইনগুলি এসেছে প্রগতি কবিতা থেকে। আবার—

শয়তান নয় মাঝে মধ্যে ইচ্ছা হয় ঈশ্বরের টুঁটি চেপে ধরি
সহিষ্ণু বাতাসে লাগাই তুলাকালাম আগুন
এই আমি

আর এই আমার স্বভাব—
মন্দির ভাঙতে গিয়ে ফিরে আসি ধূপের সুবাসে
(মন্দির ভাঙতে গিয়ে)

[illegible] যে বিদ্রোহ—তা লক্ষ্যযোগ্য চন্দন কুমার ভট্টাচার্যে। তিনি [illegible] চোখে কিছু বিষয়কে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চেয়েছেন, [illegible] কিছু বিষয় চেপে গেছেন। এদিক দিয়ে আমরা তাকে পলায়নপর [illegible] বলবো না, বরং স্বপ্রতিমতা প্রকাশে তিনি কিছুটা সংযমিত [illegible] এটা স্পষ্ট বলা যায়। তবে দ্রোহের একটা চাপা আগুন তিনি [illegible] পারেননি। এদিক দিয়ে তিনি সফলকাম।

[illegible] বেদনাজাত উপলব্ধি অথবা অহংকার অথবা অলঙ্কার—এরই [illegible] স্বপ্রতিম প্রস্ফুটিত 'অরণ্যে চন্দনের ঘ্রাণ'। প্রণয়িনী অরুনিমার [illegible] প্রার্থনা—ভালোবাসার, মায়ের কাছে, দেশের কাছে,। প্রাণ [illegible] বস্তুতে প্রেমকে রূপায়িত করেছেন দক্ষ আর্টিষ্টের স্বাক্ষরতায়! [illegible] ক্রুশবিদ্ধ যাত্রায় হেসে ওঠেন চন্দন। পারিবারিক এবং [illegible] ট্রাজেডি কিংবা লৌকিক ভালো লাগা, না লাগা অথবা [illegible] জীবনের ব্যক্তিক অধ্যায়ের ধারা বর্ণনা অথবা বাউণ্ডেলে [illegible] বাইরের ও ভেতরের দু'টি দিকের স্বাচ্ছন্দ উপস্থিতি [illegible]।

[illegible] নীলাতঙ্ক গ্রাস করছে আকাশ জমি
[illegible] তোমার আমার বুকে শ্বেত শতদল সূর্য মুখিন
(শ্বেত পদ্মের গান)

[illegible] আশা ছাড়েননি কবি চন্দন কুমার ভট্টাচার্য। তিনি তারুণ্যের [illegible] উৎরিয়েছেন শৈল্পিক কুশলতায়—নিখুঁত শব্দ চাতুর্যের [illegible] ভাববাদীতার মধ্য দিয়ে ভালোবাসা মিশিয়ে। তিনি ধ্বংসের [illegible] সৃষ্টি এবং নিরাশার বুকে জাগিয়েছেন আশা। স্পষ্টবাদী [illegible] আমরা বলবো তাঁকে।

[illegible]! কিশোরে যদি থামাতে পারিস ভালো
[illegible] বয়স হারায় শুধু সোনার মোহরগুলো!

[illegible] ব্যক্তিক দ্বান্দ্বিকতার স্পষ্ট প্রকাশ। তারপরেও তিনি [illegible] সংযমিত করতে পেরেছেন। সমন্বয় করতে পেরেছেন [illegible] বিষয়াবলীকে এদিক দিয়ে সার্বিক ভাবে বিচার [illegible] তিনি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থেই উৎরিয়েছেন—কবিতায় এবং [illegible]

সৈয়দ হায়দার এর নোতুন কাব্যগ্রন্থ আগদুয়ারী একটি প্রাথমিক বিবেচনা

কবি সৈয়দ হায়দার। অনেকেই [illegible] মাকিদ হায়দার অথবা দাউদ হায়দার [illegible] মনে করে বিভ্রান্ত হতে পারেন। কিন্তু [illegible] হায়দার নিজেই একজন মৃদু কণ্ঠ কবি [illegible] সুখবর নেই, ভুলগুলো নাড়া দেয়, [illegible] আছি, ভাঙলে মাটির মতো, কে [illegible] তর্কাতীত, পরমার্থ অন্ধকার, পাতা [illegible] কাছে থেকে প্রবাসিনী, নেহাই, গাছপালা, [illegible] বয়স যখন দিচ্ছে তাড়া, প্রতি পদে সী[illegible], [illegible] দু'জন দু'জনে গ্রন্থগুলির পর ১৯৯৮-এর [illegible] মেলায় প্রকাশ পেল 'আগদুয়ারী'। [illegible] দরজার ইশারায় কবির আহ্বান :

চাঁদ জেগেছে উচ্চাকাশে, নিচের ঘাসে জ্যো[illegible]
[illegible]
চাঁদের কথা নারীর কাছে, নারীর কথা জ্যো[illegible]
[illegible]

এই জ্যোৎস্নার বনভূমি অতিক্রম করে করে [illegible] জিজ্ঞাসা :

মাটি কখনও ইচ্ছাকৃত মূল ছিঁড়েছে কেউ দে[illegible]

সৈয়দ হায়দার-এর কবিতা সম্পর্কে বলা সম্ভব :

(ক) শব্দের মেকী অহংবোধ ও শব্দের দুর্ব[illegible] থেকে মুক্ত।

(খ) কাব্য স্বভাবে আমিত্ব প্রকাশের মোহ নেই

(গ) পরিচিত প্রতিদিনের শব্দের প্রতি মমত্ব[illegible]

(ঘ) কবিতার মধ্য দিয়ে কাঙ্ক্ষিত বক্তব্যে প্র[illegible] প্রচেষ্টা ও বক্তব্যের প্রতি মমতা প্রকাশ।

(ঙ) দেশজ চেতনার প্রতি দায়বদ্ধতা।

(চ) দ্রোহ এবং অভিমান-এর আশ্চর্য সংমিশ্রণ.

আলাউদ্দিন মোল্লা

[illegible]মি' কবিতাতে দেখা যেতে পারে ঃ

[illegible]কে জঙ্গলবাসী বলে বলুক ও
[illegible] মুখে বেঁচে যাই, বলতে পারবো—
মানুষের হাতে মরা লাগেনি অন্তত।

[illegible] পরিপূর্ণ রাত, সারারাত জাগি
[illegible] মনে হয়, চাঁদ ভীষণ একাকী ?
[illegible] চাঁদের কোনো ভাই মারা গেছে।

অথবা 'বীরের চেহারা' কবিতায় দেখা যেতে পারে ঃ

[illegible] জমেছে বালি, চর ফেটে উলঙ্গ বন্দর
[illegible]ও কঠিন মাটি, কর্কশ ও ক্ষুধার্ত ভীষণ
[illegible] তলায় আগুনের চুলো, না হলে উত্তপ্ত কেন ধুলো ?
[illegible] সময় নামে অঝোর ধারায় বৃষ্টি
[illegible]কে মুক্তিযুদ্ধ বলি
আর বলি, মুক্তিযোদ্ধা মেঘের বিশ্বস্ত সহচর।

[illegible] পাখির কাকলী শুনতে পান না কবি। শুনতে পান শুধু পাখির [illegible] কান্না। ফলে—

[illegible] প্রত্যুষ ছিলো সূর্যাস্তের কাল
[illegible] মাঠ পড়েছিলো, কৃষক গরুর কাঁধে বাঁধেনি জোয়াল
[illegible]বিহীন খেয়াতরী গাঙে ভাসমান
[illegible] নৌকাগুলির ছিঁড়েছে পাল।

অথচ বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা কবিকে করে তুলেছে আরো মেধাবী। [illegible] অহঙ্কারী দৃষ্টি আটপৌরে পরিবারের কাছে, সমাজের কাছে [illegible] ভিতরে পরমাত্মীয় হয়ে ওঠে। 'কুসংস্কার' কবিতাতে—

ক সূর্যাস্তের পর সুঁই বেচা অমঙ্গল বয়ে আনে
[illegible]নিহারী দোকানীরা এ নিয়ম আজও মেনে চলে

খ কী পুরুষ, সামান্য লোহার কণা কিনতে পারি না।
আমি মনে মনে অহঙ্কারী হয়ে উঠি ; জাতি তবু
কিছু কিছু কুসংস্কার আজও মানে।

দেশজ চেতনা জাত কবি সৈয়দ হায়দার। দৈশিক ইমেজের মোড়কে মোড়ানো তার কবিতার শরীর। মিথের ব্যবহার আর আধুনিকতার সংমিশ্রণে রূপায়ন করেন প্রতীকী কাব্যলোক। যা কখনো নেতিবাচক আবার কখনো শ্লেষ, **wit** ও তীব্র কটাক্ষে রূপ নেয়। শুধু আঙ্গিক নয় বরং অন্তর্নিহিত ভাব গভীরতা তার কোনো কোনো কবিতায় প্রবাহিত হয় গতিময় কম্পনে। এই ভাব গভীরতার অন্তর আত্মায় রয়েছে ইঙ্গিতময় রূপক আর উপমা যা কবিতাকে নির্দিষ্ট আবহের মধ্যে আটকে না রেখে ছড়িয়ে দিয়েছে এক জগৎ থেকে আরো রহস্যঘন ভিন্ন জগতে।

(ক)

গাড়ি থেমে যায়, চারপাশে নক্ষত্রেরা ঘিরে ফ্যালে
পারলে গাড়ির ভিতরে সদলবলে ঢুকে পড়ে
নক্ষত্র সমাজ। ওরা একসঙ্গে এতো জড়ো হলো?
এতো বড়ো নক্ষত্রের ঝাঁক আগে কখনো দেখিনি
গাইবান্ধা ছাড়া নক্ষত্রেরা কি কারো দখলে যায়?

(খ)

এই নক্ষত্রেরা একেকটি অদৃশ্য ডানার পরী
ওরা নেমে এসে গাইবান্ধার এখানে খেলা করে
গাইবান্ধা ছাড়া নক্ষত্রেরা এতো নিচে নামে কিনা—
....
গাছে ফুল ফোটার মতন গাইবান্ধার আকাশ

(গ)

ছোটবেলায় জোনাকি ধরে
হাতের মুঠোয় রাখলে ঐ জোনাকিও সাধারণ
সামান্য একটি পোকা হয়ে যেতো; শীতল, নিভন্ত।

(গাইবান্ধার আকাশ)

(ঘ)

আমিও প্রস্তুত, ধরা দেবো চাঁদের নিষ্কম্প ফাঁদে
তবে জ্যোৎস্নার মতো অকর্মণ্য ও নিরুৎসুক
এক কুরঙ্গিনী সারামাঠ জুড়ে নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে
আমি তার হাতে ধরা দেবো কেন? সে শুধু জ্যোৎস্না।

[illegible] [illegible] বাঁধা, চোখ বাঁধা. পা দুটো রেখেছো কেন খুলে ?
[illegible] [illegible]ধ দাও, হাঁটতে পারবো না কারো হুকুমে
[illegible] [illegible]ধ দাও, বলতে পারবো না মিথ্যা আখ্যান
[illegible] কোথায় যেতে হবে ?   যাবো. চন্দ্রকে পাঠাও।
(হাঁটতে পারবো না কারো হুকুমে)

[illegible]

[illegible] ময়ূর প্রাণ দিয়ে পেয়েছিলে কেকা রব ?
[illegible] কি বৃংহিতের কারণে শহীদ হওয়া লাগে ?
[illegible] কি মিছিল করে হ্রেষার দাবীতে ?
[illegible]র জন্যে কটা সিংহ গুলি খায় ?

[illegible]

[illegible] মা বলার জন্যে কি নিহত হবো ?
[illegible]র নাম ধরে ডাকি বলে কারাগারে যাবো ?
(তার চে' বোবাই ভালো)

[illegible]

[illegible] নারীরা সমূহ সুন্দরী। যতো পারি প্রাণ ভরে দেখি—
[illegible] দেখতে কাছে ডাকতেও থাকি। ভুলে যাই. ওরা শুধু
[illegible] [illegible]ক, স্বপ্নের নারীরা বাস্তবতা খুব বেশী মেনে চলে।
[illegible] [illegible]রী এসে বলে. 'ভালোবাসি।' অন্য এক নারী শুনে হাসে
[illegible] ভালোবাসার আশ্বাস মিথ্যা ভাবতে পারি না—তাই বুঝি
[illegible] রমণী আমাকে ভীষণ বোকা লোক ভাবে ?   স্বপ্নে আছি
[illegible] ভালো আছি।   ঘুম ভেঙে দেখি—কেউ ভালোবাসতে আসেনি।
(জাগরণে বাস্তবতা বেশি)

[illegible] হায়দার মূলত দেশ কাল সমাজ সচেতন কবি।   সরলতা তার [illegible]র বৈশিষ্ট্য।   মানবতার উদ্ভাসন ও ভোগবাদের সংমিশ্রণ কবির [illegible] লোকে আলোড়ন সৃষ্টি করে।   স্ববিরোধিতা শিল্পীর মনস্তাত্ত্বিক [illegible] জন্ম দেয়।   অথচ এ থেকে পরিত্রাণ নেই।   যেহেতু শিল্পী [illegible]র অসামঞ্জস্য বিষয়কে কল্যাণকামী চেতনায় ফিরিয়ে আনতে [illegible] [illegible]চেষ্ট।   ফলে কবি একে একে নির্মাণ করেন ঃ

[illegible] [illegible]রের পক্ষে উপযুক্ত কাহিনী ও পরিবেশ।

(খ) বাস্তব দৃশ্যপট।
(গ) গতিময় সাবলিল বাচন কৌশল।
(ঘ) গ্রামীণ সৌকর্ষতা।
(ঙ) সহজ অথচ গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিষয়।
(চ) জীবন সত্ত্বার কাঙ্ক্ষিত কামনা।—

এসব কিছুই সৈয়দ হায়দারের আরাধ্য। ফলে কবির শিল্প সত্ত্বা প্রতিনিয়ত কৌতুহলপ্রিয় অনুসন্ধান প্রিয়তা কবিকে পৌঁছে দেয়ঃ

(ক)

আজকে সন্ধ্যায় ঝড়ের সময় গাছেরই পাতায় চেয়ে থাকি
কান পাতি—গাছ করে কিনা চিৎকার, রাত পোহাতেও বাকি।
(রাত পোহাতেও বাকি)

(খ)

মাটি কি চৌচির হয়ে তারপর নদ-নদী হয়?
তবে জল? জলের প্রবাহ? সে কি মেঘ প্রেপ্সু নয়?
এতো মেঘ এখন কোথায়—ওখানে কি বৃক্ষ বাঁচে?
(জোয়ান পুত্রের হাঁক ছাড়া)

(গ)

বৃষ্টির পরেই মাটি পোড়া গন্ধ পাই—এ বছর খরা
মাটিকে ঈশ্বর ভেবে মাটির কাছেই থাকি—মাটির দুটি হাত কোথায়
খুঁজতে থাকি—আমি তার হাত ধরে চলে যেতে চাই
পাহাড়ে পর্বতে অথবা পাহাড়ের আড়ালে অথবা গুহায়
(যাওয়া ও বিরতি)

(ঘ)

নদী থেকে উঠে আসা লোক কোন্ কোন্ পথে আসে
কোন্ কোন্ পথে নদীতে ভাসতে যায় লোকজন?

(ঙ)

নদী বয়ে চলে—চলার পথেও মরে পড়ে থাকে
মাটির আশ্রয়ে নদী জোয়ার-ভাটার জাদুকর।
(ঝড় শুধু ফলের বাগানে)

[illegible] নিজের কথা কী বলবো' কবিতায় অতি সহজেই উঠে [illegible] নীচু তলার খেটে খাওয়া ছিন্নমূল মানুষের কথা। তাদের চাওয়া [illegible], ভাল লাগার কথা কবি কর্মমুখর শ্রমিক জীবনের আবর্তনে [illegible] করেছেন আশ্চর্য মমত্ববোধে। ওরাও কবিতা পড়ে, ওরাও [illegible] কেনে; ওরাও শিশুদের কোলে তুলে নেয়। আর পাশাপাশি সৃষ্টি [illegible] অসীমের কাছে সসীমের বিনাশ অনিবার্য, চিরন্তন। তবুও [illegible] আর পাখিরা অনন্ত আকাশে অসীমের আকাঙ্ক্ষায় অনুসন্ধান [illegible] নতুন ঠিকানা। অবশেষে মৃত্যুর সীমানায় এসে অসহায় জীবন [illegible] পড়ে। যন্ত্রণাদগ্ধ কবি-মানস দ্রোহ থেকে দ্রোহে বিবর্তিত। [illegible] দ্রোহ থেকে পুনর্জন্ম হয় একজন কবির, একজন শিল্পীর, একজন [illegible] বিজ্ঞানীর।

[illegible] সৈয়দ হায়দার অগ্রজদের গতানুগতিকতার প্রতি শ্রদ্ধাকাতর। [illegible] কিছু কিছু কবিতার ক্ষেত্রে আরোপিত কষ্টার্জিত সৃষ্টি, কখনো বা [illegible] নয় পদ-প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে। তবে জীবন জিজ্ঞাসা কবির [illegible] দুর্বলতাকে কখনো কখনো পৌঁছে দিয়েছে সফলতার [illegible]।

[illegible] 'ক্রমশ যুবতী' কবিতার মত কবির সাথে আমাদেরও [illegible]:

[illegible] ফিরে যাই কোনো ছোট্ট নদীর নিকট
[illegible] ফিরে আসবো না হোক যুগল পশথ
[illegible] নদী হও আমিও কূলের বট
[illegible] রক্ষা করি কূল ভাঙ্গার বিপদ।

সিতাংশু গোস্বামী এর কাব্যগ্রন্থ ঠাকুর গোপাল ওঠ

"এক গভীর নিভৃতির ভিতর নিজেকে প্রোথিত করে কবিতা লেখেন সিতাংশু গোস্বামী। নৈঃশব্দের অনুরনন সত্ত্বেও তাঁর কবিতা দেশজ, লোকায়ত এবং তাৎপর্যপূর্ণ সামাজিক। এযাবৎ তাঁর প্রকাশিত কবিতা গ্রন্থগুলির মধ্যে একজন মানুষের হাঁটা পথের চিহ্নরেখা, সেই রেখাকেই প্রসারিত করলো 'ঠাকুর গোপাল ওঠ'-র সাম্প্রতিক প্রকাশনা।"

—কথাগুলি আলোচ্য গ্রন্থের শেষ প্রচ্ছদে লিখা হয়েছে। হ্যাঁ আলোচ্য কবি যথার্থ অর্থেই ভারতীয় ঐহিত্যকাতর। তাঁর কবিতায় সনাক্ত করা সম্ভব ঃ

ক) লোকজ শব্দ সৌকর্য।

খ) লোকজ ব্যবহারিক চিত্রকল্প তথা প্রতীক।

গ) লোকায়ত থীম ও পৌরাণিক আবহে নির্মিত শ্লেষ প্রবণতা।

ঘ) অভিমান ও যন্ত্রণার পাশাপাশি দ্রোহের সজিবতা।

ঙ) কবিতাগুলি শুরু হয় সামাজিক অবক্ষয় প্রকাশক ঋণাত্মক চিত্রকল্প দিয়ে। আর শেষ হয় দ্বিধান্বিত আহ্বান দিয়ে।

চ) প্রশ্ন উত্থাপনের কৌশলের সাথে কবি সংযুক্ত করেন ইঙ্গিতময়তা, রহস্য ও প্রতীক।

ছ) নস্টালজিয়ার আবহে কবিতার শরীরে নির্মিত হয় একটি অব্যক্ত বেদনালোক।

জ) শব্দের বহুমাত্রিকতাকে যাচাই করার প্রতি সংযম। ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কবি গতানুগতিকতাকে উৎরিয়ে যেতে সাহস পাননি।

শাফিক আনাম

'ঠাকুর গোপাল ওঠ'-এর কবি কবিতার মসৃণ পথে কবিতার কাঠামো নির্মাণ করে শব্দের মালা গাঁথেন

নৈঃশব্দে। নিজের অলক্ষ্যেই শব্দে ধ্বনিগত বাগময় অর্থকে অতিক্রম করে তিনি প্রবেশ করেন ইঙ্গিতময় চিত্রকল্পে। সেই সাথে ছন্দের বাণীবদ্ধ পথে চলতে গিয়ে তিনি কখনও ক্লান্ত হন না। যেমন কবির ক্লান্তি নেই লোকজ উপাদান সংগ্রহে। সাবিক উদাহরণে আসা যেতে পারে ঃ

১

মাথি কেটে নিয়ে গেছে কপট রাখাল
কিছুই যায়নি ফেলে, নিরবধি খাঁ খাঁ
বউ কথা কও ডাকে বড় ব্যথা মাখা
....
উজানে নদীর ঢেউ উথাল-পাথাল
সোঁতে ভাসমান নীড়—পাখি ঝাড়ে পাখা
....
ফসল তোলার গান বেসুরো বেতাল
কবে যে উঠোন ছোঁবে বতোরের কাল!

২

আমের বোলের পোকা মধু খেয়ে যায়
মধু খায়, মধু খায়, খায় মধু যত
কুঁড়ি ভরা সহকারে ক্ষরণ নিয়ত
....
সাত সুরে সাধা দিন মাটিতে গড়ায়
ঠাকুর গোপাল ওঠ—সে ডাক কোথায়!

৩

গুয়া-পান বিয়োজিত গোলক ধাঁধায়
চাঁদিনী লুকায় মুখ মেঘে চাপা প'ড়ে।

৪

ডাকে না কুটুম পাখি—বিবাগী পরব
পাটের জাগের ঘ্রাণ জীবন বিহারে।

হারিয়েছে কড়ি খেলা সুদুর পাথারে
মিলিত ত্রিগুণ গুয়ে—চিরায়ত শব

তাকে ছুঁয়ে বসে থাকা বোবা অনুভব
এও কি সাধনা এক নিখিল আগারে ?
যুগ যুগ সে কারণ আকাশের পারে
কপালে রাখাল ফোঁটা জ্বলে সোমাধারে !

৫

পুরাতন নীতি হাঁটে উলট ধারায়
বেহুলা, কোথায় তুমি ! বেহুলা কোথায় !

৬

মরসা ধরেছে কাঠে, ক্ষয়ে যায় খালি
পীড়িত বিষম্ খেদ ঝুর-ঝুর ঝুরে
....
মালা তো গিয়েছে ছিঁড়ে, ফাঁকা কুঁড়োজালি।
খামোকা পৃথিবীময় দীন জোড়াতালি
কে জ্বালাবে, বলো বলো—মোহন দীপালি !

৭

মরা-কটালের টানে দুপুর পোহালে
ভাঙনের গান নদী কেবলই শোনায়
ধুলোটের ধুলো আহা নিভৃতে হারায়
মমি ঠায় জাগরিত কারও মায়াজালে।
প্রতিমা গিয়েছে ডুবে কোন সে পাতালে
কোথায় জীয়ন কাঠি ? আসুক নাগালে।

৮

সুবচনী ব্রতকথা কে শোনাবে তাকে
কোলকুঁজো হয়ে আছে সকল ভুবন
বীজের পাতোতে সদা বিষিত দূষণ
প্রপা'র তালাশ তাই মাটি ঘিরে রাখে।
ছায়া নেই, শুধু মায়া—টিটিভেরা ডাকে
জল চাই, জল দাও—আনো মধুরাকে।

অতিক্রান্ত দিনগুলোর জন্য চাপা কষ্ট বুকে গোপন রেখে কবি সিতাংশু গোস্বামী পথ চলেন। কবির চেতনা এই কষ্টবোধের দায়ভারে ক্ষয়ে যেতে যেতে ঐতিহ্য, ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস আর খুটিনাটি সংস্কারবোধ,

...ক্ষারের গোপন বিশ্বাস সব কিছু মিলেমিশে ভাষা প্রকাশ যন্ত্রণায় ...রিল সুর ও ছন্দ খুঁজে পায়। বিষন্নতার নিয়ত ক্ষরণের মধ্যে ...ই গভীর কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে সমাজকে প্রত্যক্ষ করেন। তিনি ভেঙ্গে ...তে ভয় পান, মাকড়শার জালের মত তিনি শুধু বুননে বিশ্বাসী। ...স্ন আক্রান্ত অথচ জীবনবাদী কবি সমাজের অসঙ্গতিকে সনাক্ত ...তে গিয়ে আবিষ্কার করে ফেলেন শিল্পের যাদুঘর। শব্দের পর ...বসিয়ে তিনি তৈরী করেন স্বল্পায়ু চিত্রকল্প তথা অর্থের বহুমাত্রিক ...বনা। এই সম্ভাবনা আবর্তিত হতে থাকে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের সুর ...ত্রা। কবি একই ছন্দ এবং অন্তমিলে প্রতিষ্ঠিত করেন কবিতার ...র যেন একই চোর এসে রোজ রাতে একই সিঁধ খুঁড়ে চলেছে। ... কাঠামোই কবিতা নয়, ফলে কবি সাত রঙের আশ্চর্য সুরের ...ঠসে দেন উপমা, রূপক, প্রতীক। আর এই উপমা, রূপকের ... উকি দেয় কবির সমাজ দর্শন তথা কবির লোকজ বিশ্বাস। ...ই সৃষ্টি করেন এক দ্বিধাগ্রস্ত পরিবেশ। রহস্য জন্ম নিতেই কবিতা ...ন গতিতে অগ্রসর হতে থাকে। এই গতির ভিতর থাকে ...বতে, কুটুম পাখি, পাটের জাগের ঘ্রাণ, কড়ি খেলা, মাদারের ডাল, ...কা, টেরাকোটা রোদ, ডাঁইয়ের বাসা, খেজুরের রস, বেহুলার ... সুর ও স্মৃতি, খড়হীন চাল, মরা-কটাল, প্রতিমার মায়াজাল ...য়ন কাঠি। এর মধ্য দিয়েই কবি দেখে ফেলেন স্বজাতির ... অতীত চারিতায় আমরা সুখ খুঁজে ক্লান্ত আর 'ঠাকুর ...কে জাগাতে গিয়ে কবি স্মৃতি রোমন্থন করে করে চেতনা ...র প্রত্যক্ষ করেন চিৎপাত প্রতিবেশ কালি লেপে গায়। তারপরও ... শুধুমাত্র স্বপ্ন বিলাসী কাব্যিক ঠাকুর নন। ফলে পুরাতন রীতি ...কে তিনি উলটো পথে হাঁটতে দেখেন, কবির বুকের পাঁজরে ...র কম্পন ওঠে, বেহুলা, কোথায় তুমি! বেহুলা কোথায়!— ...র এই স্বগত হাহাকার প্রকাশে কবিতার শরীর তত্ত্ব অথবা তথ্যের ... কবি বিশ্বাসী নন। কবি সচেতন নান্দনিক মাত্রাগুণে। ... কবির ব্যক্তিক বিষন্নতা রূপ লাভ করে সমষ্টিগত ক্ষোভে! ...ই কবির কাব্য কুশলতা। কবির মেধা ও কৃৎকৌশলের সমন্বয় ...কে প্রথাগত পথে চলতে শিখিয়ে পৌঁছে দেয় কবিতার নাচঘরে। ... কবিতার উপাদান সাবলিল ভঙ্গিমায় পরিচিত লোকজ গন্ধে ঠাসা ...র গোয়ালঘর থেকে সংগ্রহ করে সুধীজনের উপযুক্ত করে ... করতে অভ্যস্থ। শিল্পের প্রতিষ্ঠিত সড়কে কবি বিলাসী

চলনে বিশ্বাসী। ছন্দ ও শব্দ প্রয়োগে সামাজিক। লোকায়ত থীম ব্যবহার করে তিনি নিজেল জলের বুকে জাগান উর্মিমালা। হৃদি উর্মিমালা কবিতার প্রতিবেশ জুড়ে সৃষ্টি করে চিত্রকল্প। চিত্রকল্পগুলি পথ চলতে চলতে তৈরী করে তাৎপর্যপূর্ণ চিত্রপট। একজন কবি সমাজকে প্রত্যক্ষ করেন একাধিক মাত্রাবোধ থেকে। গ্রহণ করেন পঞ্চ ইন্দ্রিয়বোধ থেকে, ছুঁয়ে দেন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের চেতনা অথচ অভিজ্ঞতার প্রকাশ ও বিশ্লেষণ ঘটান সমাজের বুক চিড়ে। কবির এ বিশ্লেষণ আত্মপরিচয়ের, আত্মশুদ্ধির, আত্ম উপলব্ধির যা তিনি সঞ্চালন করেন তার পাঠক আত্মায়।

কবি সিতাংশু-র বিষন্নতা ও জীবনানন্দের বিষন্নতার মধ্যে রয়েছে অভিজ্ঞতাগত ও মাত্রাগত পার্থক্য। ফলে কবি জীবনানন্দ যে বিষন্নতার নান্দনিক যাদুঘর নির্মাণে সক্ষম হয়েছেন সিতাংশু সে যাদুঘরে প্রবেশ না করলেও প্রবেশ করেছেন উপন্যাসিক তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়-এর উপন্যাসলোকে। যেখানে রয়েছে অতীত আর আধুনিকতার প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব সিতাংশুকে আক্রান্ত করেছে। একই সাথে সিতাংশুর কবিতায় বিষন্নতা আছে কিন্তু তা বস্তু জগতের বাস্তবতাকে পর্যবেক্ষণ মাত্র। চারিদিকে শুধুই ভাঙ্গনের গান, প্রতিনিয়ত চলছে ভাঙ্গাগড়া, সমাজ থেকে শুরু করে সংস্কৃতি পর্যন্ত ; কিন্তু তা কবি কিভাবে কতটুকু পর্যবেক্ষণ করেন তার 'ঠাকুর গোপাল ওঠ'-র আলোকে, এই প্রশ্ন জীবন জিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অবশ্যই সকলের।

এক-এ চন্দ্র, দুই-এ পক্ষ, তিন-এ নেত্র। একজন কবি সম্ভাব্য সকল পক্ষ অবলম্বন করেন। তার তৃতীয় নয়ন অর্থাৎ মানসপটে বেদনার চাষ করেন আর সৃষ্টি করেন তার নান্দনিক সৃষ্টিকে। এক্ষেত্রে তিনি অপর কারো প্রতিদ্বন্দ্বি নন, তিনি প্রতিপক্ষ হন স্বয়ং স্রষ্টার। আর এক্ষেত্রে সিতাংশুর প্রার্থনা দেবতার কাছে আত্ম সমর্পন ঠিক নয় বরং সামাজিক বাস্তবতাকে স্বীকার করে আত্ম-উপলব্ধি ও আত্মসচেতনতার জন্য বেদনার্ত আহ্বান মাত্র। ফলে সিতাংশুর কবিতা ক্রমেই উৎসব থেকে উৎস অনুসন্ধানী হয়ে ওঠে। এই অনুসন্ধান আর রহস্যঘন প্রশ্ন পাঠককে শেষ পর্যন্ত প্রলুব্ধ করে নিজ ঐতিহ্য আবিষ্কারে। এই উৎস আবিষ্কারের নেশাই আলোচ্য কবিকে করে তুলে স্বপ্রতিভ। কখনো বা দ্বিধান্বিত। এই দ্বিধা কবিতার আধুনিক কৃৎকৌশল

থেকে দূরে সরে থাকা অথবা কাব্যের অপ্রতিরোধ্য দুর্বোধ্য আঙ্গিকের কাছে পরাজিত হয়ে এক শৈল্পিক অভিমান পুষে রাখা। ফলে সঙ্গত কারণেই কবির কবিতার দুর্বল বিষয় বর্তমান আলোচনায় স্থান পেল না। বরং পাঠক আপাতত কবির কবিতার অভিমানকে ছুঁয়ে দিক সযতনে।

ঠাকুর গোপাল ওঠ-গ্রন্থের প্রকাশকাল রথযাত্রা ১৪০৪, জুলাই ১৯৯৭। স্বত্ব, চিরঞ্জীব প্রকাশনী। মুদ্রণ-সৌকর্য্য, মানবেন্দু রায়। প্রকাশক —দেবাশীষ ভট্টাচার্য, রামপ্রসাদপুর, অণ্ডাল, বর্ধমান। শুভেচ্ছা বিনিময়—পাঁচ টাকা। প্রচ্ছদ শিল্পীর নাম লিখা নেই কোথাও। তবে মৃৎ শিল্পের পট অবলম্বনে প্রচ্ছদে একটা মায়া জড়ানো ভাব প্রকাশ পায়। সিতাংশু গোস্বামীর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ ঃ কতদূর সমুদ্র মন্থন; অসম্ভব ধূলোবালি, নিষ্ক্রমন নেই, প্রিয় পরাজয়, ছায়ায় ছায়ায় আর্ত, একটা বদল আয়, বুকে পাথর মনে আতর, অনিকেত ব্যথা, সপ্তমের ঘরে রাহু এবং নষ্ট হরফ।

চৈতন্যচরিতামৃত এবং গৌড়ীয়দর্শন

চৈতন্যদেব [১৪৮৬-১৫৩৩] নবদ্বীপ থেকে গিয়ে যখন পুরীতে থাকতে শুরু করেন তখন তাঁর বয়স ছিল চব্বিশ। বাঙ্গালী পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌমের কথায় তিনি দাক্ষিণাত্য যাত্রার সময় ওড়িশ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের রাজ্যপাল রামানন্দ রায়ের সঙ্গে তত্ত্বকথা আলোচনা করেন। রামানন্দ রায়কে চৈতন্যদেব বলেন,—পুরীতে সার্বভৌম তোমার মহত্ত্বের কথা আমাকে বলেছেন, তোমার সঙ্গে দেখা করতেই আমি এখানে এসেছি।

চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে এ-কথার উল্লেখ আছে। আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে, চৈতন্যচরিতামৃত—মহৎ জীবন সম্পর্কে মহৎ পাঠকের জন্য মহান লেখকের মহৎ রচনা। হুসেন শাহ্ বাঙলার বাদশা থাকার সময় তাঁর উৎসাহে বাংলা সাহিত্য পরিপুষ্ট হয়েছে, এ কথা ঐতিহাসিকগণ সকলেই বলেছেন। চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থও তারই ফলশ্রুতি।

সার্বভৌম কেন চৈতন্যদেবকে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে আলাপ করতে বলেছিলেন তা পরে জানা গেল। মূলতঃ এই আলোচনাতেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মূলতত্ত্ব প্রতিফলিত।

পৃথিবীর অনেক স্থানেই 'রস-সাধনা' বা 'মিষ্টিক সাধনা' প্রচলিত আছে কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে যে জীবনচর্যা তা কোথাও দেখা যায় না। এই বিষয়ের সম্পর্কে এমন বিস্তারিত আলোচনামূলক রচনাও পৃথিবীর অন্য কোন প্রান্তে হয়নি। সেদিক থেকে, আমাদের—যাদের মাতৃভাষা বাংলা তাদের গর্বিত হবার অনেক কারণ আছে।

শ্রীপ্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী

কারুজ/৪৮৬

সাধনার সেই দার্শনিক তত্ত্ব নিয়েই কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রচেষ্টা এই নিবন্ধে। রামানন্দ রায় চৈতন্যদেবকে ভক্তিতত্ত্ব বিষয়ে বলতে শুরু করলে চৈতন্য আরো বিস্তারিত করার জন্য রামানন্দকে বারবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তিনি কেবলই বলছেন,—'এহো হয় আগে কহ আর।'

সমন্বয়ে ভক্তির প্রকার ভেদ হয়। যেমন,—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। ভগবানের সঙ্গে জীবের এই সকল সম্পর্ক হতে পারে। সাধকের অধিকার অনুসারে এসব ভাব জীবনে আসে। সাধক ভগবানের কাছে কিছু প্রার্থনা না করে যে সেবাদি কার্য করেন সেটা তাঁর শান্ত ভাব। দাস বা চাকরের ভাবে ভগবানের যে সেবা তাই দাস্য। সখ্য হচ্ছে বন্ধুত্ব। পুরাণে তার অনেক উদাহরণ আছে। শ্রীদাম, সুদাম এঁদের ছিল সখ্য ভাব। নন্দরাজ এবং যশোদার বাৎসল্য ভাব। গোপীগণের সাধনা ছিল মধুর ভাবে। ভক্তের সঙ্গে ভগবানে সম্পর্ক নিয়েই ধর্ম। স্রষ্টার সঙ্গে তাঁর সৃষ্টির সম্পর্কই ধর্ম। ধর্ম আর কিছু নয়। আমরা যাকে ধর্ম বলি তা আসলে সম্প্রদায়। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ এগুলো সম্প্রদায়। এদের আবার উপসম্প্রদায় আছে। খৃস্টানের প্রোটেস্ট্যান্ট্-ক্যাথলিক। বৌদ্ধদের হীনযান-মহাযান। মুসলমানদের শিয়া-সুন্নি। আর হিন্দুদের তো কথাই নেই। তাদের আছে—সৌর, গাণপত্য, শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব আরো কত কি। ধর্ম মূলতঃ একটাই। তাকে মানবধর্ম, সনাতন ধর্ম বা আদি ধর্ম—যে যেনামে ইচ্ছা ডাকতে পারে।

ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে যে সাধনা পুষ্টি ও পক্কতা লাভ করেছে তার নাম গৌড়ীয় দর্শন। এর মূল গ্রন্থ 'চৈতন্যচরিতামৃত'। ভগবানের সঙ্গে মানুষের যে প্রেমভক্তির সম্পর্ক তাই এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য। ভগবানকে ভক্ত স্বামীরূপে প্রেমিকরূপে আরাধনা করেন। বৈষ্ণব বলছেন, রাধা ভগবানের শ্রেষ্ঠ প্রেমিকা। গোপীগণ কৃষ্ণের সঙ্গে রাধাকে বিহার করিয়ে আনন্দ পান। তাঁরা নিজেরা বিহার করতে চান না। এই ভাবই গোপীপ্রেম নামে কথিত।

আমি যাকে ভালবাসি তাঁর আনন্দবিধানই আমার কাম্য, আমার আনন্দ আমার কাম্য নয়। আমি তাঁর আনন্দেই আনন্দিত। ভগবানের সঙ্গে জীবের এই যে সম্পর্ক তাকেই বলে গোষ্ঠীপ্রেম। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের বক্তব্য এই প্রেমভক্তি।

চারশো বছর আগেকার প্রাচীন ভাষায় পয়ারে রচিত এবং অনেক সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করা হয়েছে বলে এর মধ্যে প্রবেশ করা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। গ্রন্থকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিজেই বলেছেন, —এই গ্রন্থ পুনঃ পুনঃ পাঠ করতে করতে এর রসোপলব্ধি করা যাবে। অর্থাৎ একবার পাঠেই যে তা হবে না, তা তিনি তখনই বুঝে নিয়েছিলেন। এখনকার লোকের পক্ষে যে আরো বিশেষ মনোযোগের প্রয়োজন তা বলাই বাহুল্য। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যলীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদে এই ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। আমাদের মাতৃভাষার আদিকালের গ্রন্থদের অন্যতম এটি। আমরা ইচ্ছা করলেই সময়-সুযোগ মত নিজেরা পড়ে নিতে পারি।

চৈতন্যদেব জিজ্ঞাসা করলেন,—কাম ও প্রেমে কি পার্থক্য? গোপী-প্রেম কামগন্ধহীন কেন?

রামানন্দ উত্তরে বললেন,—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

মানুষ তার নিজের আনন্দের জন্যে যে কাজ করে তা হচ্ছে কাম, আর ভগবানের প্রীতির জন্যে কাজ করাই হচ্ছে প্রেম। কাম আর প্রেমের মধ্যে তফাৎ শুধু এইটুকু।

এই প্রেমধর্ম বিষয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তব্যটি অতীব প্রণিধানযোগ্য। কবি বলেছেন,—

চৈতন্যদেব একদিন বাংলাদেশে প্রেমের ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কাম জিনিষটা অতি সহজেই প্রেমের ছদ্মবেশ ধরিয়া দলে ভিড়িয়া পড়ে; এই জন্য চৈতন্য কিরূপ সতর্ক ছিলেন তাহা তাঁহার অনুগত শিষ্য হরিদাসের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ব্যবহারে প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় চৈতন্যের মনে যে প্রেমধর্মের আদর্শ ছিল তাহা কত উচ্চ, তাহা কিরূপ নিষ্কলঙ্ক। তাহার কোথাও লেশমাত্র কালিমাপাতের আশঙ্কায় তাঁহাকে কিরূপ অসহিষ্ণু ও কঠিন করিয়াছিল। নিজের দলের লোকের প্রতি দুর্বল মমতাকে মনে স্থান দেন নাই—ধর্মের উজ্জ্বলতাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করার প্রতিই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন,—জগতে যত বড় বড় ভক্তির আচার্য আসিয়াছেন, সেই প্রেমোন্মাদ ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবই তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলো। মহাত্মা গান্ধীর কথায়,—জনজীবনে মহৎ ভাবনা সঞ্চারিত করবার যোগ্যতায় ও নেতৃত্বে শ্রীচৈতন্যের তুলনায় রামমোহন রায়ের মত একজন বিরাট কৃতিত্বের লোকও বস্তুত একজন খর্বকায় মানুষ, আমি তো কোন্ ছার।

চৈতন্যদেবের ব্যক্তিত্বের বিষয় এখানে আমাদের আলোচ্য নয়। কথা প্রসঙ্গে মাত্র একটু উল্লেখ করা হল। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে চৈতন্যদেব এবং রামানন্দ রায়ের আলোচ্য প্রসঙ্গ থেকেই কিঞ্চিৎ পরিবেশিত হল। পৃথিবীর দর্শনের ইতিহাসে বাঙ্গালীর এই দান আজ দুনিয়াজোড়া স্বীকৃতি আদায় করেছে। বাঙ্গালী হিসেবে, বাংলাভাষা যেহেতু আমাদের মাতৃভাষা, সেকারণে আমরা অবশ্যই মনের অজান্তে হলেও এ ব্যাপারে কিছুটা শ্লাষা বোধ করে থাকি। সেই দিব্য শ্লাঘনীয় বিষয়টি নিয়েই এখানে নামমাত্র আলোচনা করা গেল।

বিপ্লবী কবি কাজী নজরুল ইসলামের একটি গানের চরণও সর্বদা সুরের দোলায় আমাদের কানে বাজে ঃ

বর্ণচোরা ঠাকুর এল
রসের নদীয়ায়
তোরা দেখবি যদি আয়।

সেই রসবস্তুটি কি, তা জানতে হলে চৈতন্যচরিতামৃত পুরো না পাড়লেও অন্ততঃ এই মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদটি ডবল করে পড়ে নিতে হবে। শুভায় ভবতু॥

কবি ওমর আলী : স্মৃতিকথা অবজ্ঞা আর দ্রোহের পাঁচালী

প্রকৃতপক্ষে কবি ওমর আলী যাত্রা শুরু করেছিলেন জন্মলগ্ন থেকেই। কবির পারিবারিক পরিবেশ সে অবস্থারই সাক্ষ্য বহন করে। ১৯৩৯ সালের ২০শে অক্টোবরে পাবনার চরশিবরামপুরের মাতুলালয়ে জন্মের দেড় বৎসর বয়সে মা-কে হারিয়ে কবির যাত্রা শুরু হয় প্রকৃতির সীমাহীন রহস্যের মধ্য দিয়ে। ফুপুর বাড়ী, তারপর নদী ভাঙন; আবার ভাসতে ভাসতে চারণ কবি চাচা তজীর উদ্দীনের সাহচর্যে পদ্য রচনার মধ্য দিয়ে নিজেকে ভুলিয়ে রাখলেন কবি ওমর আলী। ৫ম শ্রেণীতে থাকা অবস্থাতে শিক্ষক মওলানা আবদুল লতিফ রাজী-র উৎসাহে তিনি গোলাম মোস্তফা, রবীন্দ্রনাথ, বন্দে আলী মিয়া, জসিম উদ্দীন প্রমুখ কবিদের লেখার সাথে পরিচিত হতে থাকেন এবং 'একটি ইঁদুরের মৃত্যু' নামে প্রথম কবিতা লিখেন। যার ফলশ্রুতিতে ত্রিশ বৎসর পর রচনা করেন 'বাছুর', 'আমার কালো বেড়াল'। কবিতা দুটির বীজ কিন্তু লুকিয়েছিল 'একটি ইঁদুরের মৃত্যু'-র মধ্যেই।

এ সময় কবি ওমর আলীর সহযাত্রী ছিলেন কবি জিয়া হায়দার ও কবি আবু হেনা মস্তফা কামাল। এই তিনজন কবির কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয় মরহুম আজিজুল হক সম্পাদিত 'পাক হিতৈষী' নামক পত্রিকায়; যেটি প্রকাশ পেতো পাবনার 'সায়াহ্ন নীড়' হতে। এক সময়ের পরিত্যক্ত সোনালী ব্যাংক ভবন। কবির দ্বিতীয় কবিতা কাশ্মির যুদ্ধের উপর 'জেহাদে করিনা ভয়'। যা তিনি উর্দু শিক্ষকই রাজী সাহেবের অনুরোধে ও উৎসাহে রচনা করেছিলেন এবং ৭ম শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালীন এই উর্দু শিক্ষকই কবির প্রথম বই 'জেহাদে করিনা ভয়' প্রকাশ করেন এবং কবির ছদ্ম নাম দেন 'ওমর আলী আনসারী।'

সাক্ষাৎকার গ্রহণ
শিমুল মাহমুদ

কবি ওমর আলী কবিতার স্বপ্ন বুকে নিয়ে প্রথম ১৯৫৩ সালে চৌদ্দ বৎসর বয়সে একা একা ঢাকাতে পালিয়ে এসে সোজাসুজি সংবাদ অফিসে উপস্থিত হন। সেখানে পরিচয় হয় আব্দুল গণি হাজারী, সরদার জয়েন উদ্দীন, হাবিবুর রহমান ও ফয়েজ আহমদ-এর সাথে। ঐ সময় হতে সংবাদ-এর খেলাঘর-এ কবির লেখা ছাপা হতে থাকে এবং প্রতিটি ছড়ার জন্য তিনি পাঁচ টাকা করে পেতে থাকেন। পাশা-পাশি 'মিল্লাত'-এর কিশোর দুনিয়াতেও তিনি নিজের জন্য জায়গা করে নিলেন। ক্রমে কিশোর দুনিয়া-র দাদাভাই রোকনুজ্জামান সেই সাথে ফয়েজ আহমদ-এর সাথে সখ্যতা বৃদ্ধি পায়। এবং তাদের স্নেহ ও পরামর্শে পাবনাতে ফিরে এসে চব্বিশ পরগণা হতে আগত নাসির উদ্দীনের পরিবাররে গৃহ শিক্ষক হিসাবে বসবাস করতে থাকেন এবং পুনরায় এই পরিবারে সাথেই ১৯৫৪ সালে ঢাকাতে ফিরে আসেন। ফিরে এসে দেখা করেন মিল্লাত-এর রোকনুজ্জামান খান-এর সাথে। এরপর পরিচিত হন নাসির আলী-র সাথে এবং শেষ পর্যন্ত আহসান হাবিব-এর বাসায় থাকবার ব্যবস্থা হয়। এবং আহসান হাবিব-এর মেয়ে কেয়া-র গৃহশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। এ অবস্থাতেই কবি ওমর আলী হামিদিয়া স্কুল হতে তৃতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হন এবং জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হন ১৯৫৫ সালে। কবি আহসান হাবিব-এর বাসায় ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত থাকা অবস্থাতেই পরিচয় হয় আল মাহমুদ, দিলওয়ার, শহীদ কাদরী, ফজল শাহবুদ্দীন, আব্দুর রশীদ ওয়াছেকপুরী, মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহ প্রমুখের সাথে। এবং পুরান ঢাকার পটুয়াটুলির বিউটি বোর্ডিং-এ 'কাফেলা' পত্রি-কাকে কেন্দ্র করে জমে উঠে তাঁদের আড্ডা। আড্ডার সাথে সাথে লেখা ছড়াতে থাকে মাহে নাও, মোহাম্মদী, সওগাদ প্রভৃতি পত্রিকা থেকে পত্রিকাতে।

— আপনার 'এ দেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি' কাব্য-গ্রন্থের প্রকাশক তথা প্রচ্ছদ শিল্পী সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করুন।

— বাংলা ১৩৬৭ ও ইংরেজী ১৯৬০ সালে গ্রন্থটি অধুনালুপ্ত কোহিনূর লাইব্রেরী থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায় এবং প্রকাশক ঢাকা-খুলনা গামী কয়লা লঞ্চের কারবার শুরু করেন। নাম দেন কোহিনূর

ট্রান্সপোর্ট। অর্থাৎ পাঠকের বদলে যাত্রী সংগ্রহের ব্যবসা কিংবা রোগীর জন্য ওরিয়ন ঔষধ কোম্পানীও খোলা হলো। প্রকাশক ছিলেন আজিজুর রহমান চৌধুরী। ৩৫ আওলাদ হোসেন ঢাকা—১১০০ (পুরাতন ঢাকা), চৌধুরী সাহেবের বাড়ীতে লাইব্রেরী ও প্রেস ছিল। তার বড় ছেলে ঢাকা কলেজের প্রাক্তন ভিপি লুৎফুর রহমান চৌধুরীর সাথে বন্ধুত্ব হলে কোহিনূর প্রেস থেকে ছাপা ও কোহিনূর লাইব্রেরী থেকে আমার বইটি প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। প্রচ্ছদ শিল্পী ছিলেন কাইয়ুম চৌধুরী। কালীঘাটের পট অবলম্বনে তিনি প্রচ্ছদটি আঁকেন, 'কলসী কাঁখে রমণী'; পরনে ছাপা শাড়ি।

☐ আপনার প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ প্রাক্কালে কষ্টঘন স্মৃতিসহ প্রকাশনার সাথে সম্পর্কযুক্ত বন্ধুদের কথা বলুন।

☐ কবির প্রথম কাজ স্বতঃস্ফূর্ত অনুপ্রেরনাবশতঃ কবিতা লেখা। তারপর তিনি সেই কবিতা কাউকে শুনান কিংবা ছাপার অক্ষরে পাঠক পাঠিকাদের সামনে হাজির করতে আগ্রহী হন। প্রথমে একাজটা পত্র পত্রিকার মাধ্যমে সম্পন্ন হলেও তাঁর আগ্রহ দেখা দেয় পুস্তক আকারে কবিতাগুলোকে পাঠকদের হাতে তুলে দিতে। আমার পরলোকগত বন্ধু দেওয়ান আব্দুল কাদের ওরফে মোস্তফা কামাল যার প্রকাশনা ৩৮ বাংলা বাজারের বুক সোসাইটি থেকে আমার আট খানা কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সে-ই প্রথমে আমাকে সাহায্য করে আমার প্রথম কাব্য গ্রন্থটি ছাপতে। প্রথমে অন্য একটি নাম দিয়েছিলাম এবং সেকেলে ছোট এক ট্রেডল মেশিনে বইটির কয়েক পাতা ছাপাও হয়। আমার অন্যতম বন্ধু লুৎফুর রহমান চৌধুরী ছাপা পাতাগুলি দেখে আমাকে আর মোস্তফা কামালকে তিরস্কার করলেন। তিনি বললেন, দেশে কি কোন প্রকাশক নেই, কবি নিজেই প্রকাশক; আর ছাপাও যাচ্ছে তাই। কি ভেবে তিনি নিজেই ছাপার দায়িত্ব নিলেন এবং নিজের পছন্দমতো নাম দিলেন 'এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি'। বইটির সৌন্দর্য আর দ্রব্যগুণে কবির সুনামও মনে হয় শেষে ছড়িয়ে পড়ল। যে বইটির খোঁজ আজও অনেকেই করে থাকেন।

একথা ঠিক যে কবিতার বই প্রকাশ করার জন্য সে সময় বহু

লাইব্রেরীতে ঘুরে ছিলাম। কেউ রাজি হয়নি। কারণ নজরুল, জসীম উদ্দিন, বন্দে আলি মিয়া ইনাদের বই-ই বিক্রি হয় না। প্রথমে ছোটদের ছড়ার বই প্রকাশ করতে যাই। এক লোকের কাছে কতগুলো ছবি বিভিন্ন ইংরাজী ও বাংলা বই থেকে কেটে নিয়ে জমা দিয়েছিলাম ব্লক বানাতে। সে সব ছবিতে আমার কবিতা ছিল। সে লোক আমার টাকাগুলো নিয়ে আর ফেরত দেয়নি। ব্লকও দেয়নি। বলা বাহুল্য তখন বহু পত্র পত্রিকা থেকে আমি সম্মানী পেতাম এবং তা জমিয়ে ব্লক করতে চেয়েছিলাম। স্বীকার করি ব্লকের খরচ ও বই ছাপার খরচ সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল না। লোকটাও আমাকে সরল পেয়ে ঠকিয়েছিল। এর প্রায় ছয় বছর পর আমার প্রথম কাব্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

☐ 'এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি'—গ্রন্থটি আদমজি পুরস্কারের জন্য জমা দিতে গিয়ে আপনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। কারণ ব্যাখ্যা করুন।

☐ একথা এখন বলতে গেলে একজন অতি পরিচিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতে হবে। তখন তিনি ছিলেন বয়সে তরুণ এবং একাডেমীর ছোট মাপের একজন কর্মচারী। আমি 'এ দেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি' জমা দিতে গেলে তিনি বাংলা একাডেমীর ফরম আমাকে দেননি। অত সুন্দর একটা কবিতার বইয়ের কবি আমার মত একজন কিশোর হতে পারে তা তিনি বিশ্বাস করেননি। কিংবা তিনি ঈর্ষাপরায়ন হয়ে আমাকে চোখ রাঙিয়ে বাংলা একাডেমী অফিস থেকে বের করে দেন। আমার পোশাকও মার্জিত ছিল না। সম্ভবত ময়লা জামা পায়জামা ও ছেঁড়া চটি জুতা পড়েছিলাম। পরে জেনেছিলাম তিনি কবিতা লেখার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। নাম মাহমুদ শাহ কোরেশী। তিনি শেষ পর্যন্ত বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক পর্যন্ত হয়েছিলেন। কাজেই আমার মত কিশোর বয়সে আমি যার ছোটই হব। তাকে তিনি সহ্য করবেন না এটাই স্বাভাবিক। বাংলা একাডেমী থেকে বের হয়ে আসার সময় ক্ষোভে দুঃখে আমার চোখে পানি আসে। তাছাড়া প্রতিবাদ করার ভাষা বা সাহস তখন আমার ছিল না। আমি আসলেই খুব লাজুক ছিলাম। এ যুগের মত তরুণ হলে মনে হয় যেখানে একটা তুলকালাম ঘটনা ঘটে যেত। আদমজী পুরস্কারের পাঁচ হাজার টাকা তখন ছিল

পাকিস্তানের নোবেল পুরস্কার। এই টাকা পেলে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অনার্স পড়ে ভালো রেজাল্ট করে বের হয়ে আসতে পারতাম। তার আগে আই, এ, পরীক্ষাতেও আমার রেজাল্ট ভালো হতো। আমার প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ আমি তখনই ঘটাতে পারতাম। আরও অনেক কিছুই গৌরবময় ও সুখের জিনিস আমি হারিয়েছি এই পুরস্কারের টাকা না পাওয়ার দরুন। বিচারকদের অনেকেই আফসোস করেছিলেন এ কবিতার বই পুরস্কারের জন্যে জমা না হওয়ার কারণে। কারণ কবিতার বদলে দুটি উপন্যাসকেই পুরস্কার দিতে হয়েছিল। একটি রশীদ করিম-এর উত্তম পুরুষ। অপরটি ছিল একটি মামুলি ধরণের উপন্যাস। যার নাম নিশানা এখন আর নেই। দৈনিক সংবাদ অফিসে বসে আবদুর রাজ্জাক (মৃত) উপন্যাসটির নাম আমার কাছ থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন। নাম দিয়েছিলাম 'কন্যাকুমারী'।

☐ 'এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি'—কাব্য গ্রন্থটিকে ঘিরে স্মৃতিচারণ করবেন কি?

☐ 'এ দেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি' এক সময় সারা বাংলাদেশে ও কোলকাতায় একমাত্র আধুনিক কাব্যগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। আমার প্রবেশিকা ও আই এ পরীক্ষা দুটিতেই তৃতীয় বিভাগ থাকা সত্ত্বেও মুনীর চৌধুরী ও আহমদ শরীফ আমাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা অনার্স শ্রেণীতে ভর্তি করে নিতে আগ্রহী হয়েছিলেন। মুনীর চৌধুরী আমার জন্য ১৫ দিন ফরম রেখেছিলেন। আর্থিক অনটনের জন্য শেষ পর্যন্ত আমিই ভর্তি হতে যাইনি। আসলে আমার কাব্যগ্রন্থই আমাকে সুযোগ করে দিয়েছিল অনার্স ক্লাসে ভর্তি হবার। যদিও আমার রেজাল্ট প্রবেশিকা ও আই. এ কোনোটাতেই ভালো ছিলো না। এ গ্রন্থের মাধ্যমে পরিচিতির জন্যেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে এম, এ, প্রিভিয়াস ক্লাশে ভর্তি হতে পেরেছিলাম, বি, এ,-তে কমপার্টমেন্টাল পাওয়া সত্ত্বেও। কারণ বিভাগীয় প্রধান ডঃ মযহারুল ইসলাম তাঁর 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে আমার নাম অনেক আগেই উল্লেখ করেছিলেন। তৎকালীন শিক্ষক আবু হেনা মোস্তফা কামাল বলেছিলেন "ওমর আলী বন্দে আলী মিয়ার চাইতে বেশী শক্তিশালী কবি"। তিনি মৃত্যুর কয়েকমাস আগেও টেলিফোনে টেলিভিশনের খ, ম. হারুনকে একথা

বলেছিলেন। ডঃ মযহারুল ইসলাম এম.এ প্রিভিয়াস ক্লাশে আমার ভর্তির দরখাস্তে সুপারিশে লিখেছিলেন তিনি একজন খেলোয়াড় অপেক্ষা একজন কবিকে প্রেফার করেন।

আমি তরুণতম কবি কিংবা কিশোর কবি অথচ আমার 'এ দেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি' অনেক বয়োজেষ্ঠ কবির কাব্য-গ্রন্থকে তখন ম্লান করে দেয়। সেসব বইতে তখনও কোলকাতার ছাপাখানার গন্ধ অর্থাৎ পাকিস্তান হবার আগে কোলকাতায় ছাপা হত। স্বভাবতই এসব কবি আমাকে সহ্য করতে পারেননি। তারাই বিভিন্ন পত্র পত্রিকা দখল করেছিলেন এবং সদ্য প্রাপ্ত পাকিস্তানে তারাই তখন বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক। এক তরুণতম কবির প্রতি ঈর্ষা পরায়ন হয়েই এরা এ কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা ছাপাটা ভালো মনে করেননি। কেবলমাত্র মুক্ত বুদ্ধির মানুষ অধ্যাপক আবদুল হাই বেতারে অকুন্ঠ প্রশংসাসহ গ্রন্থের কবিতা প্রচার করেন ও কবিকে আশীর্বাদও মনে হয় করেছিলেন। ভয়েস অব আমেরিকা থেকে প্রশ্নোত্তর বিভাগে বলা হয় এটা বাংলা সাহিত্যের একমাত্র দীর্ঘতম নামের সফল কাব্যগ্রন্থ।

☐ গ্রন্থটির দ্বিতীয় প্রকাশ সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

☐ ১৯৬০ সালেই এ বইটি প্রকাশিত হয় দ্বিতীয়বারের মত। এত সুন্দর ও সুশোভন ভাবে বের হবার সাথে সাথে প্রচুর সংখ্যক কপি বিক্রি হয়ে যায়। শুধু সুন্দর ছাপার গুণেই নয়, এর ভেতরে কাব্যগুণও ছিল। কারণ কবিতাগুলো আসলে নতুন ঢঙে লেখা, ফলে পাঠক পাঠিকাদের মুগ্ধ করেছিল সহজেই। এ বইটি বিয়ে বাড়িতে উপহার হিসেবে নিয়ে যেতেন অনেকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী তার রুমের আলমারীতে এ বইটি রেখেছিলেন সযত্নে। আমার মত তরুণতম কবির 'এ দেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি' কবিতাটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলের ছাত্রদের সাহিত্য সাংস্কৃতিক সপ্তাহে আবৃত্তির জন্য নির্বাচিত হয়। সে আমলে কলকাতার গ্রন্থমেলায় বইটি স্থান লাভ করে। প্রথম সংস্করণের 'এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি' দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে যাবার পর দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয় বাংলাদেশ সংস্করণ হিসেবে। তাও নিঃশেষিত। বইটি পাঠক পাঠিকাদের কাছে যে সমাদর পেয়েছে তাতে

আমি গৌরব বোধ করি এবং আমাকে এ ঘটনা যথেষ্ট প্রেরণা দিয়েছে। বইটির এত সমাদর আমার জীবনে এক অবিস্মরণীয় ও সাফল্যজনক ঘটনা। তবে একথা ঠিক যে প্রকাশকগণ বইটি দিয়ে ব্যবসা করলেও আমাকে কোনরকম টাকা পয়সা দিয়ে সহযোগিতা করেননি। বন্ধু দেওয়ান আবদুল কাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও দেননি তবে মাঝে মধ্যে বিশ ত্রিশ টাকা হাত খরচ দিতেন। এভাবে মোট হাজার খানেক টাকা দিয়ে থাকবেন হয়তো।

☐ এ গ্রন্থের বিষয় বস্তুকে আপনি কবি হিসাবে কিভাবে দেখে থাকেন ?

☐ আমার আবহমান কালের বাংলাদেশ আর তার নর নারীকে সাজানো গোছানো সংসারে দেখতে আমার ভালো লেগেছিল। আসলে বাংলাদেশের নারীকে আমি লতা পাতার শাড়িতে সবুজ পটভূমিতে নদীর মত সুস্বাস্থ্য যৌবনবতী দেখেছিলাম। সুখী হতে দেখেছিলাম। যৌতুক ও পুরুষের নিষ্ঠুরতার কথা তখন আমি মোটেও ভাবিনি। পুরুষ ছিল সরল, কর্মঠ এবং নারী ছিল পুরুষের প্রতি আস্থাবান, মমতাময়ী! ক্ষুধা ছিল না, জন্মশাসন ছিল না। নারী ছিল প্রকৃতই নারী। সে ভালোবাসার উপহার চেয়েছিল সন্তানের মুখ। সে কর্ম-সংস্থানের জন্য ঘরের বাইরে জটিল জীবনে প্রবেশ করেনি। সে আঁতুরে শিশু কোলে নিয়ে স্বামীর জন্যে ভাত রাঁধতো। স্বামী বাইরে থেকে ঘরে ফিরতো। সেবাময়ী নারী তার জন্যে..............উদ্বিগ্ন থাকতো। দরিদ্র ও সমস্যাপীড়িত বর্তমান বাংলাদেশ আমার কবিতার বাংলাদেশ হবে কি ?.................আমার বাংলাদেশের নারীদের সুনাম আমি শুনেছি...............এখনও শুনতে চাই............ আজীবন আমরণ............... ।

☐ প্রিয়তমাকে উৎসর্গ করার ক্ষেত্রে বিশেষ কোন তাৎপর্য আছে কি ?

☐ 'এ দেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি' আমাকে প্রেমের কবি নামে পরিচিত করেছে আমার পাঠক পাঠিকাদের কাছে। আমি সে জন্য নিজেকেও একজন 'প্রিয়তম' মনে করে আমার 'প্রিয়তমাকে' বইটি উৎসর্গ করেছি। তাছাড়া এ গ্রন্থ যে কোন পাঠক তার 'প্রিয়তমা' পাঠিকাকে উৎসর্গ করবে এটাতো ভালো। আর নিজের

কথা যদি বলি তাহলে আমার 'কুতুবপুরের হাসনাহেনা' উপন্যাসটির কথা বলতে হয়। উপন্যাসটির নায়ক একজন প্রাইভেট টিউটর। নিরীহ আর মুখচোরা লাজুক। যে তার ভালবাসার রমণীটিকে তার ভালবাসার কথা না জানিয়ে নির্দিষ্ট মাপের একটি বক্ষবন্ধনী প্রথম উপহার দিয়েছিল। যা ঘটেছিল আমার নিজেরই জীবনে। সেই উপন্যাসের রমণীকেই উৎসর্গ করেছিলাম আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এই নারীরা বাস্তব জীবনে সংসারে প্রাপ্তীতে আসেনা হয়তো কখনো।

☐ 'হাসিনা' কবিতাতে—

"হাসিনা তুমি ও আমি কিছুদিন এই পৃথিবীতে
বেঁচে রবো। উজ্জ্বল বসন্তে আর অনুজ্জ্বল শীতে।"

—এখানে জীবনানন্দ দাস আপনার কাব্য প্রতিভায় অংশগ্রহণ করেছে। 'হাসিনা' নামের আড়ালে কি জাতীয় কণ্টকে লালন করেন আপনি?

☐ 'নাজমা' নামের একটি মেয়ে রাজশাহী থেকে এক যুবককে, যে যুবক তখনও প্রবেশিকা পাশ করেনি এবং যার কেবলমাত্র গোঁফ উঠেছে, নীলকাগজে সুগন্ধি পাউডার মাখা চিঠি পাঠাতো। সে মেয়েটি পরে এম, এ, পাশ করে অন্য এক ব্যক্তিকে বিয়ে করলো। ডক্টরেটও করেছিল। ব্যক্তিটি ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আর মেয়েটি ছিলেন ডঃ জেসমিন চৌধুরী নাজমা। শুনেছি ভদ্র মহিলা পরলোকগতা। হয়তো ঐ চিঠিই আমার কবি চোখে বিঁধেছিল; তার সুগন্ধিও পেয়েছিলাম আর সেই চিঠিটিই আমাকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল কবিতাটি লিখতে। যাই হোক যুবকটি আই, এ ফেল করলো কয়েক-বার। অর্থ সংকটই এর কারণ। আর মেয়েটি সব পরীক্ষা পাশ করে ওপরে উঠতে থাকে। যুবককে আর চিঠি লেখেনা। সেই যুবকের অশ্রুসিক্ত বেদনার ক্ষোভ শেষ পর্যন্ত আমাকে 'একদিন একটি লোক' কবিতা লিখতে প্রেরণা যুগিয়েছিল।

☐ 'একদিন একটি লোক' সম্পর্কে আরেকটু খোলসা করে বলুন।

☐ কিশোর বয়সে অর্থাৎ গোঁফ ওঠার সাথে সাথেই তরুণ পুরুষ নারীর সাথে ঘনিষ্ঠ হবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে। এটা তো মানুষের

প্রথম জীবনের অনিরুদ্ধ আবেগ প্রবন সময়। আমিও হয়তো এমনি এক ঘটনার হঠাৎ সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। তারপর ব্যর্থ অতৃপ্ত মানসিকতাই তো আমাকে 'একদিন একটি লোক' কবিতা লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আমার মডেল ছিলেন মার্কিন কবি স্টিফেন ক্রেন ও খলিল জিবরান।

টি এই কবিতা প্রসঙ্গে আপনার আরেকটি কবিতার কথা চলে আসে, সেটি হচ্ছে—'একটি লোক ছিলো বসে একা'—এই কবিতাটির উৎসপট সম্পর্কে বলুন। এ প্রসঙ্গে মনে আসা স্বাভাবিক আবুল হাসানের 'গভীর শোকের কোন উচ্চারণ নেই।'—

টি মার্কিন কবি স্টিফেন ক্রেনের কবিতা মনোযোগ সহকারে পড়েছিলাম আমি যখন কেবলমাত্র আই, এ, শ্রেণীর ছাত্র। ইউসিস লাইব্রেরী তখন তোপখানা রোডে প্রেস ক্লাবের সামনে। সেখানে দিনরাত বসে মার্কিন কবিতা পড়তাম। আমার সমসাময়িক কবিরা তখন কল্লোল যুগের কবিদের অনুকরণ করতে ব্যস্ত। আমি তখন নতুন পথের সন্ধান করছি। রবীন্দ্র, নজরুল, বুদ্ধদেব, জীবনানন্দ আমাকে খুশী করতে পারছে না। তখনই পেয়ে গেলাম আমার মডেল কবি স্টিফেন ক্রেনকে। যিনি মরুভূমিতে গিয়ে নিজের হৃৎপিণ্ড নিজেই খাচ্ছেন.........।—মনে হয় ; একটি লোক ছিলো বসে একা' কবিতাও একারণেই লিখেছিলাম। যা অবশ্যই স্টিফেন ক্রেন অনুপ্রাণিত।

টি 'এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি'—কাব্যে এ জাতীয় কোন প্রভাব আছে কি ?

টি এই গ্রন্থে সংলাপধর্মী কবিতাগুলোতে নতুনত্ব ধরা পড়েছে অনেকের চোখে। বিশেষ করে 'একদিন একটি লোক' কবিতাটির মতো অমন তীব্র তীক্ষ্ণ অনুভূতি মনে হয় বাংলা সাহিত্যের আর কোনো কবিতায় নেই। আবদুর রশীদ খান ও মোহাম্মদ মামুন সম্পাদিত 'পূর্ব বাংলার প্রেমের কবিতা' সংকলনে এটাই ছিলো সর্ব কনিষ্ঠ কবির কবিতা। 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় বলা হয়েছিল যে, এ সংকলনে এটাই একমাত্র প্রেমের কবিতা। অবশ্যই 'এ দেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি' কাব্যের কিছু কিছু কবিতা বাইরের কবিদের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও নীরিক্ষাধর্মী, যা ভয়ানকভাবে সফল

হয়েছে বলে আমি মনে করি। পরবর্তীতে অনুজ কবি আবুল হাসান হয়তো আমার 'একটি লোক ছিলো বসে একা'—কবিতাটি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে 'গভীর শোকের কোন উচ্চারণ নেই' লিখে থাকবেন।

❑ 'মিমোসা'—শব্দটির উৎস সম্পর্কে বলুন।

❑ আমি নতুনত্বের অভিযাত্রী ছিলাম। ইংরেজী ও মার্কিন-ইংরেজী সাহিত্য আমি পড়ে ফেলেছিলাম আই, এ, ক্লাশে পড়ার সময়ই। ফলে ইংরেজী শব্দ বাংলা কবিতায় প্রচলন করে নতুনত্ব আনার লোভ সংবরণ করতে পারিনি আমি। যেটা ঘটেছিল ইংরেজ কবিদের গ্রীক, লাতিন ও ফরাসী কবিতা পড়ার পর। **Mimosa** শব্দটি তো লজ্জাবতী লতা। আমি আমার গ্রামের মাঠে খুব ছোট বেলায় ঘুড়ি ওড়াতে যেয়ে লজ্জাবতী গাছ ছুঁয়ে দেখতাম। ছুঁলেই পাতাগুলো জড়ো হয়ে আসতো, যেন সত্যিকারের লজ্জায়। আমি যুবতী নারীকেও তো সেইভাবে দেখে দেখে আমার কবিতার নাম দিয়েছি 'মিমোসা'। কি বলেন, ভালো করিনি ?

❑ আমি মনে করি আপনার শ্রেষ্ঠ সনেটগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে 'নীলগ্রাম'।—এই কবিতাটি লিখার আগমুহূর্তে আপনার ভেতর কি জাতীয় মানসিক অবস্থা কাজ করেছিল ?

❑ ঢাকা শহরে এসেছিলাম তের বছর বয়সে। বাবার গরু বেচা টাকা সম্বল করে পাবনার নিজ গ্রাম থেকে চুপিসারে একা। একইভাবে বাংলা কবিতার গতানুগতিক পথ ছেড়ে একা একা নোতুন পথের অনুসন্ধান করছিলাম। বলা যায় চুপিসারে নিত্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা। মাঝে মাঝে বহু দূরে ফেলে আসা আমার গ্রাম, খেয়াঘাট, কিশোরী মেয়েদের সাথে ছোট বেলার কানামাছি খেলায় মনে মনে ফিরে যেতাম। বিশেষ কোন কবিতাকে ভিত্তি করে ঠিক কবিতাটি লিখিনি। বুড়ীগংগা নদীতীরে ওপারে দূরের গ্রামগুলোকে নীল দেখা যেতো গাছ পালার কুজ্ঝটিকায়। আমার বন্ধু লুৎফর রহমান চৌধুরী যিনি অধুনালুপ্ত কোহিনুর লাইব্রেরী থেকে আমার 'এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি' প্রথম প্রকাশ করেন, তিনিই আমাকে এ কবিতাটি লেখার পরিকল্পনা দেন। কারণ তার কথামত অনেকগুলো কবিতা আমি ঐ বই ছাপার সময় প্রতিদিন লিখে প্রেসে দিতাম। দ্বিতীয়বার পড়ে দেখার বা সংশোধন করার মত অবকাশ ছিল না,

অনেকটা একটা ঘোরের মত। যেমন তার কথা মতই বইটির আমি এত দীর্ঘ একখানা নাম রেখেছিলাম, কোনকিছু না ভেবেই বা বিবেচনা না করেই। অবশ্য এই দীর্ঘ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নামই শেষ পর্যন্ত আমার সাফল্য এনে দেয়। এই নামে কবিতাটি সম্ভবত ১৯৫৬ সালে প্রথম দৈনিক ইত্তেফাক-এর সাহিত্য সাময়িকীতে ছাপা হয়েছিল।

☐ আর 'পাথর' কবিতার আইডিয়া?

☐ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন পরবর্তী কালে আমার স্বদেশের বৃহত্তর পটভূমিতে (শুধু শহর কেন্দ্রিক নয়) বহু শোকাতুরা নারী ভীড় করেছে আমার কবিতায়। মনে হয় 'পাথর' কবিতাটির বেদনা পরবর্তীকালে আরও প্রকট হয়েছে। আসলে আমি অভিজ্ঞতা ছাড়া কবিতা লিখিনি এবং এখনও লিখিনা। কোন যুবতী বিধবাকে কাঁদতে দেখে নির্মম পাথরতুল্য পুরুষও যতদূর সম্ভব আমার 'পাথর' কবিতার আইডিয়া যুগিয়েছেন।

☐ 'বাঞ্ছিতা' কবিতাটির শেষ লাইন—
'কেউ কেউ এরকম ভালো মেয়েলোক কাছে পায়।'—
এরকম ভালো মেয়েলোক আপনার জীবনে কিভাবে এসেছে?

☐ আমার স্ত্রী সহিদাকেই তো আমি এরকম ভালো মেয়েলোক মনে করেছি, ১৯৬১ সালের ২১শে জুলাই আমাদের বিয়ে হবার পর থেকেই। আসলে সেই-তো আমার সংসার গুছিয়ে রেখেছে এবং আমার সব রকম যত্ন নিয়েছেন। তাঁর সাথে আমার কোন বিরোধ কোন সময়ই বাঁধেনি। প্রকৃতপক্ষে তাঁর মতো মেয়ে আমার কল্পনায় কাজ করেছে. যদিও তাঁকে বিয়ে করার আগেই আমার প্রথম গ্রন্থের রমণীরা তৈরী হয়ে গিয়েছিল এবং সেকারণেই প্রথম বইটি উৎসর্গ করা হয়েছিল আমার কবিতা রমণী 'প্রিয়তমাকে'। তবে এ কথা ঠিক দু' একজন কিশোরী আমাকে ভালবাসার ভান করেছিল, কিন্তু আসলে ছলনা করেছিল। তারা কোনদিনই আমার সাথে ঘনিষ্ট হয়নি।

☐ আপনার বিখ্যাত 'নীল গ্রাম' সনেটটির মতই আরেকটি উল্লেখযোগ্য সনেট 'গ্রামে'—এখানের জীবনানন্দের মধ্য দিয়ে আপনাকে সনাক্ত করা সম্ভব। মন্তব্য করুন।

☐ মরহুম আবদুল হাই ঢাকা বেতারে আমার ' এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি' কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা প্রচার করেন। তাতে তিনি আমার মধ্যে জীবনানন্দের ছাপ লক্ষ্য করলেও আমার মধ্যে নতুন সম্ভাবনা ও স্বাতন্ত্রের কথাও উল্লেখ করেছিলেন। পরে আমি আটষট্টি হাজার গ্রামকে, তাদের নর-নারী ও শিশুদের প্রকৃত নাম ও বাস্তব জীবনের কথা অত্যন্ত দরদ ও আন্তরিকতা সহকারে তুলে ধরেছি আমার কবিতায়। প্রকৃত গ্রাম, গাছপালা, নদী ও আরও কত কিছু এসে ভীড় করেছে আমার অকৃত্রিম অভিজ্ঞতার মধ্যে। সেজন্যেই তো আমি জীবনানন্দ থেকে আলাদা হয়ে গেছি এবং আমার কবিতায় আমিই রয়েছি। আমাকে আমার কবিতা দিয়েই তো চেনা যায়। বনলতা এবং সুবিনয় ছাড়াও তো শত শত নরনারীর নাম আমার কবিতায় এসেছে। নীলগ্রাম বহুদূর দিগন্তে কালো রেখার মত। সেখানেও মানুষ আছে, নীল-চোখ মেয়ে আছে। এসবতো আমরা শহরে থেকে মনেও করিনা। সেজন্যেই তো আমি আমার প্রিয় দেশ ও দশের গ্রামকেও তাদের নরনারীকে তাদের নিজ নিজ নামে কল্পিত নামে নয়, তাদের নিজ নিজ অবস্থানে উপস্থিত করেছি আমার কবিতায়। ওরা রোকেয়া, সালেহা, মজিদ, রহিম, গণেশ, কমলা নীলগ্রামের পরবর্তী মূল গ্রামে খৈকড়ায়, বেতাগীতে, জল ঢাকায়, গোল বুনিয়ায়, কোমরপুরে, সদিরাজপুরে, নিয়ামতপুরে—বাংলাদেশের ৬৮ হাজার গ্রামে দিগন্তে কাল রেখার মত নীলগ্রামে। যা আমরা শহরে থেকে ভুলে যাই.........আমার নীলগ্রামই তো আজ শত শত হাজার হাজার গ্রাম। আমি আমাকেই অনুসরণ করেছি এবং এখন অনেকেই আমাকে অনুসরণ করছে। আমি নিজ গ্রামের মধ্যে থেকে গ্রামকে অকৃত্রিমভাবে দেখেছি এবং আমার অনুসারীদেরও দেখতে উদ্বুদ্ধ করেছি।

☐ আপনার 'বাংলা একাডেমী পুরস্কার' প্রাপ্তী প্রসঙ্গে আপনার মূল্যায়ন কেমন?

☐ একটা ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে তাহলো 'এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি' কাব্যগ্রন্থের জন্য আমি সে বছরই অর্থাৎ প্রকাশের বছরই পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার পেতাম, কিন্তু পাইনি। অথচ তখন আলাউদ্দিন আল আজাদ-এর 'মানচিত্র' কাব্যগ্রন্থ ছাড়া আর কারো গ্রন্থই প্রকাশিত হয়নি। শামসুর রহমান-এর কোনো

কাব্যগ্রন্থ তো তখনও প্রকাশ হয়নি। 'মানচিত্র' কম্যুনিজমের ভাবধারায় পুষ্ট হওয়ায় ডক্টর শহীদুল্লাহ সে বইটিকে পুরস্কার দেননি বলে শুনেছিলাম। সেক্ষেত্রে আমার বই পুরস্কার পেতো এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিংবা পুরস্কারযোগ্য আর কোন বই সে বছর প্রকাশ পায়নি। আগেই বলেছি কাব্যগ্রন্থের অভাবে সে বছর শুধু উপন্যাসের ক্ষেত্রেই পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। অথচ আমি বই জমা দিতে ব্যর্থ হলাম শুধুমাত্র একটি লোকের কারণে। যাই হোক 'বাংলা একাডেমী পুরস্কার' পাওয়ার পর অনেকেই আমার প্রতি নজর দেন। কারণ আমিতো এক রকম অবহেলিতই ছিলাম। আমাকে শহীদ বুলবুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। পাবনা শহরের প্রেসক্লাবে ও পাবলিক লাইব্রেরীতে আমাকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। আমি অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পরি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অশ্রু সংবরণ করতে পারিনি। পুরস্কার পাওয়ার সংবাদ পেয়েছিলাম আমার সহকর্মী বন্ধু অধ্যাপক আবদুল ওয়াদুদ ইকবাল সাহেবের মাধ্যমে। আমি কয়েক সেকেণ্ড কথাই বলতে পারিনি। তখন বেতার ধর্মঘট চলছিল। কাজেই বেতারে সংবাদটি প্রচার হয়নি। অধ্যাপক ওয়াদুদ দৈনিক সংবাদে দেখেছিলেন। পরে মনে হলো হয়তো আমিও অন্যান্য পত্রিকায় দেখেছিলাম। কিন্তু নিজের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটবে কখনো না ভাবার ফলে সংবাদটির অর্থ উদ্ধার করতে পারিনি। সংবাদটি শোনার পর মনে হল আমি এত দীর্ঘদিন পর যোগ্য স্বীকৃতি পেলাম, যেটা আমার অনেক আগেই পাওয়া উচিত ছিলো। কারণ আমার চেয়ে অনেক কম লিখেও কম খ্যাতি থাকা সত্ত্বেও তারাই আমার আগে পুরস্কার পেয়েছেন। অবশ্য এটা আমার কোন অভিযোগ নয় কিম্বা কোনদিন কাউকে বলতে যাইনি বরং মফঃস্বলে থেকেই লেখা অব্যাহত রেখে আমি আমার পুরস্কার পাওয়ার যোগ্যতা প্রমাণ করেছি। হয়তো একারণেই অধুনালুপ্ত 'কালস্রোত' পত্রিকায় কবি ওমর আলী-র 'স্বদেশে ফিরছি'—কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে বলা হয়েছিল "স্বদেশে থেকেও যিনি প্রবাসী".........

পরিশিষ্ট

☐ কবি ওমর আলীর পূর্বপুরুষ 'কাঁনাই প্রামানিক' বিহার থেকে কুষ্টিয়ার হরিপুরে এসে বিয়ে করে আরতদারীর ব্যবসা শুরু করেন। পরবর্তীতে কাঁনাই প্রামানিকের পুত্র 'ওলি প্রামাণিক' পাবনার

...বাড়িয়া এসে বসতি স্থাপন করেন। তার পেশা ছিল কৃষি কাজের ...পাশি নৌকা বাওয়া। ওলি প্রামাণিকের তিন পুত্র। একজন ... প্রামাণিক। যার একশত বিঘারও বেশী জমিজমা ছিল। ১৯৪৯ ... ইনি মৃত্যুবরণ করেন। অপর দুই পুত্র 'পোড়াই প্রামাণিক' ও ...ই প্রামাণিক'। ইনাদের পেশা ছিল প্রধানত কৃষিকাজ ও ... বাণিজ্য। তবে মাছ ধরা ও নৌকা পরিচালনার ঐতিহ্য তখন ... তাদের পরিবারে ছিল। মালু প্রামাণিক-এর পুত্র উজির আলীর ... স্ত্রী। প্রথম স্ত্রীর গর্ভে কবি ওমর আলী জন্মগ্রহণ করেন। উজির ... পাবনার ঘোষপুরে এসে বসতি স্থাপন করেন। ইনার পরিবারে ... পদ্মার ইলিশের জৌলস আর মোষের গাড়ি ভর্তি জমির ফসল। ...র আলী আরবী পাঠ ছাড়া আর কোন লেখাপড়া জানতেন না। ... বছর বয়সে মা মারা যাবার পর ওমর আলী একান্নবর্তী ...রিবারে দাদীর কাছে মানুষ হন। দাদীকেই তিনি মা বলে ডাকতেন। ...নের ঘর আর ফসলের প্রাচুর্যে তখন এক বছরের ফসল অন্য বছরে ... হত এই পরিবারে। পদ্মার বিবর্তনের সাথে সাথে একান্নবর্তী ...রিবার প্রথা ক্রমাগত ভেঙে যেতে থাকে। প্রত্যেক পুরুষই বাপ-...র ভিটে পরিবর্তন করে নতুন ভিটেয় উঠে ঘর বাঁধে। ক্রমশ ... থাকে প্রাণ-প্রাচুর্যের জৌলস।

... ওমর আলীর প্রথম শিক্ষা বর্তমান কুষ্টিয়ার (তদানিন্তন পাবনা) ...চাঁদপুর প্রাইমারী স্কুলে ১৯৪৫ সালে। পদ্মা ভেঙে যাবার পর ...বনার ঘোষপুর স্কুল এবং ৫ম শ্রেণীতে ভর্তি হন ১৯৪৯ সালে ... সি. আই স্কুলে। উজির আলী ১৯৫০ সালে হেমায়েতপুরে ... স্থাপন করেন। ওমর আলী এই সময় শ্রীশ্রী অনুকুল ঠাকুরের ...মে ক্ষিতীষ সান্যালের কাছে যাতায়াত করতেন জ্ঞান আহরণের ...শ্য। ওমর আলীর দুই চাচা, একজন আরিফ প্রামাণিক পড়া-... না জানলেও অপর চাচা ইজ্বির রহমান ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখা-... জানতেন, সেই সাথে জানতেন সংস্কৃত ভাষা। এই চাচার ...টা হলেও অবদান রয়েছে ওমর আলীর কবি হিসাবে তৈরী হয়ে ...র পিছনে। অবশ্য তিন ফুপুর সাথেও ওমর আলীর যোগাযোগ ছিল। ১৯৭০ সালে ওমর আলীর পিতা তদানিন্তন পাবনা; বর্তমান কুষ্টিয়ার চর সাদীপুরে বসতি স্থাপন করেন। পিতার মৃত্যু হয় ১৯৮৬ ...রে এবং মাতা টাইফয়েডে মৃত্যুবরণ করেন ১৯৪১ সালে। কবি

নিজে বসতি স্থাপন করেন ১৯৬৮ সালে উত্তর কোমরপুরে। পরবর্তীতে পিতার মৃত্যুর পর ১৯৮৬ সালে দ্বীপচর-এ স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন।

১৯৫৬
কবি আহসান হাবিব-এর আজাদ পত্রিকা থেকে চাকরী চলে যাওয়ায় ওমর আলী আহসান হাবিবের বাড়ী থেকে চলে আসেন। র‍্যাংকীণ স্ট্রীট-এ বন্ধু হামিদুর রহমান-এর কাছে ওমর আলী আশ্রয় নেন। হামিদুর রহমান তখন নিজেই জায়গীর থাকতেন। তিনি তার ভাতের অর্ধেক ওমর আলীকে দিতেন এবং যথারীতি বিছানাও ভাগ করতেন। হামিদুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে **Geology**-তে **M S.C**করার পর বর্তমানে আমেরিকাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। এই সময় ওমর আলী ক্রমেই পাশের গণি মিয়ার হোটেলে ঋণগ্রস্থ হয়ে যান। এক পর্যায়ে হোটেল মালিক দ্বারা অপদস্ত হন। হামিদুর রহমান তাঁকে উদ্ধার করেন।

১৯৫৮
সহপাঠী শাহজাহান সদর ঘাটের দক্ষিণে কালীগঞ্জ গ্রামের ছাত্র লাট-মিয়ার বাড়িতে জায়গীর থাকার ব্যবস্থা করে দেন ওমর আলীর। ইতিমধ্যে ১৯৫৭ সালে জগন্নাথ কলেজ থেকে আই, এ পরীক্ষা দিতে পারলেন না ওমর আলী। এরপর ১৯৫৯, ১৯৬০ এবং ১৯৬১ সালে পর পর তিনবার পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে তিন বারই অকৃতকার্য হন তিনি। ইতিমধ্যে জায়গীর বাড়ি পরিবর্তন হয়েছে। ১৯৫৯ সালে চকবাজারে তবলিগে দীন লাইব্রেরী-র মালিক আলী আহমদ-এর পুত্র দীন মোহাম্মদের কাছে তিনি জায়গীর থাকা শুরু করেছেন। দীন মোহাম্মদ তখন ওমর আলীর ছাত্র। বাড়ি নং ১২০, বংশাল রোড।

১৯৬০
দৈনিক ইত্তেহাদ-এ বেলাল চৌধুরী ও **News Editor** গোলাম মওলা-র কাছে ওমর আলী কাজ শেখা শুরু করেন। এই সময়ে **Sub-Editor** হিসাবে দৈনিক সংবাদে ওমর আলী চাকরী পান। পাশাপাশি শহীদুল্লাহ কায়সার, সানাউল্লাহ নুরী, হাসান হাফিজুর রহমান, সৈয়দ নুরউদ্দীনের সাথে তিনি ঘনিষ্ট হন। এই সময় সহকর্মী হিসেবে ছিলেন ফজল করিম, মেজবাহ-উজ-জামান, গোলাম

রহমান চৌধুরী, আফজাল প্রামাণিক, রণেশ দাশ গুপ্ত, তোরাব খান, হুরুন হক, সাইফুল ইসলাম, জামালুদ্দিন মোল্লা প্রমুখ।

১৯৬১

১২শে জুলাই পাবনার চরসাদীপুরের কেরামত আলীর কন্যা সহিদা খাতুনকে বিয়ে করার পর ঘটক P. W. D-এর পিওন আবদুল জলিল সহ ওমর আলী ঢাকা গমন করেন। এরপর ছয় মাস বেকার থাকার পর মিউনিসিপ্যালিটিতে কর্মচারী হিসাবে যোগদান করেন।

১৯৬৩

কিশোরগঞ্জ জেলার কামার খন্দের জামতৈলের সার্কেল অফিসে কেরাণী হিসাবে যোগদান। রেডক্রসের টিকিট বিক্রির টাকা সময়মত জমা দিতে না পারায় বরখাস্ত। এ সময় আটঘরিয়া জুনিয়র হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠা হলে সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগদান। একই সাথে সার্কেল অফিসে পুনর্বহাল। এই সময় প্রিন্সিপাল গণি ও অন্যান্যদের সাথে ওমর আলী পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে নাইট সেশনে বি, এ, ক্লাশে ভর্তি হন এবং ১৯৬৫ সালে কম্পার্টমেন্টালসহ বি, এ, পাশ করেন। পাশ করার পর চাকরী ছেড়ে দিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে ভর্তি হন। এই সময় ১৯৬৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক আবু হেনা মোস্তফা কামাল-এর সহযোগিতায় রাজশাহী রেডিওতে স্ক্রিপ্ট রাইটার হিসাবে ৩০০ টাকার বেতনে চাকরী করতে থাকেন। সহকর্মী ছিলেন কবি বন্দে আলী মিয়া। Previous পরীক্ষা দিবার পর সেলিনা হোসেন, খালেদা এদিব চৌধুরী প্রমুখের ১৭টি কবিতা নিয়ে প্রকাশ করেন কবিতা সংকলন 'তরুণ নতুন কবিতা'।

মোস্তাক আহমাদ দীন-এর কবিতা

গূঢ়তত্ত্ব

বাসনাসকল টানে......গূঢ় ভাবনার কাল
এ আমার ছল প্রাত্যহিকী—
এই মর্মে ঘরে ঘরে সত্য প্রচারিত

কখনো উক্তি যদি......তীক্ষ্ণ অজাচার
বলি, নহলি যৈবন তাই
মনে মনে বাসি

আমার গূঢ়তত্ত্বে কার ধর্ম পুড়ে গেল শুনি

দৃশ্য

যে ছুঁয়েছিল ব্রতচারিণীর মুখ, তার আয়ু ফুরোলো
এসে
সন্ধিস্থাপনের দিনে...
এখন অশ্রুপাত করে সায়ং বেলায়
তার চোখ স্পর্শ করে ব্রতচারিণীর হাত

পুরাণ

তৃণভাবে গীত তবু বড় হতে থাকে গান
বোধি ভালো বোঝে নেয় রীতি, তাই—
ঘন হতে থাকে যোগ...

আর রূপবোধে কৌটো খুলে দিই
আরো পূর্ণ হতে থাকে গান, গানের পুরাণ

বোধ

উতলা স্পর্শ যদি তুলো উড়ে যায়......মেঘে
কে তবে শয্যা পেতেছিলে জানি

পারভেজ চৌধুরী-র কবিতা

পাহাড়, ঘুম ও মেঘের গল্প

১.
পাহাড়ের গায়ে কোথাও কোন পাপের চিহ্ন নেই ।
হে পুণ্যাত্মা পাহাড়
এসো গান গাই কোন শুদ্ধতম সকালের জন্যে।
নৈঃশব্দের মর্মর ধ্বনীর জন্যে এসো উৎসব করি
দ্রুতধাবী সময়কে বরণ করি ভালোবেসে।

২.
মায়াবী তাসের তুরুপ তোমার হাতে
তুমিতো নিঝুম বিনিদ্র রাতের ঘুম।

৩.
ভালোবাসার কন্যা তোমার, মেঘ প্রিয়ভাজনেষু
অহংকারে যাকে জড়িয়ে ধরো
তবুও সে গলে গলে তোমাকেই ভেজায়।

শীতল আগুন বিষয়ক

শীতল আগুন আমি ছুঁয়েছি বারবার।
আগুন ও আগুন জ্বেলে দাও
          আমার বুকের হাহাকার
আমিতো পরবাসী এক মৃত নগরীর সন্তান।

নিষাদ রাকীব-এর কবিতা

সমাধি এবং একটি গল্পের রূপরেখা

কোন রূপসীর শরীরে এ ক্ষত চিহ্ন
মিলনের পথে মিলাবার
এমন তীব্রতা আগে কখনো পায়নি
আজ মধ্য পথে তাকে নিয়ে
অভিমান চুন-সুরকী খসে পড়ে

আত্মজ কণ্ঠে বলে উঠে—
আমাকে পরিত্রাণ দাও মানব সকল
এ বদ্ধ গৃহের যন্ত্রণা   বন্দনায় মুখর হবে
অতীত স্মৃতিরা সব
কারণ স্মৃতিরা সব মুছে যায়নি
এই বেলায় আলোক বিচ্ছুরণ থমকে যায়
চোখের ক্রিয়ায়

সমস্ত দেহের অঙ্গ-প্রতঙ্গ তাকে দিয়েছিল
পরিত্রাণ এক সময়
অতীত কোন গল্পে আর এ গল্প
গল্পে থাকে না কোন অতীত বর্তমান কিংবা
ভবিষ্যতের রাজকন্যা তার শিয়রে সোনার
কাঠি নিয়ে

রূপসার ক্ষত চিহ্নে অতীত স্মৃতিরা অহংকারী
দৃষ্টি নিয়ে মর্মর মূতির মত
দাঁড়িয়ে থাকে
একদিন সমস্ত দিন শেষে
পাহাড়ী পাটাতনে এ মর্মর পাথর খসে
পড়ে লাগামহীন বিদ্রোহী ঘোড়ার
পরাজিত কেশরে

সেখানে একটি গল্প তৈরী হয়
এমন সমাধীর উপর অল্প বাঁকা
চিত্র এঁকে দেয় রূপসীর কোমল শরীরে।

শিকারি পিতার গতিবিদ্যা পাঠ

১,

তীরের অগ্রতায় বিষ মাখাচ্ছে শিকারী আজ
তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছানোর
দেরি নেই হয়তো বা
আর এই সময়

এইখানে অনেকগুলো জলজ উদ্ভিদের জন্ম হলো
মেছো কীট কাঁকড়ার হৃদপিণ্ড খুলে খুলে
বাস করে শিশু আত্মারা
নিস্প্রভ প্রাণ
অলৌকিক স্বপ্নের দেশে বিচরণ
ক্রমান্বয়ে গতি সঞ্চারিত শরীর
আগাছা অবধি বেড়ে উঠা

সংখ্যা দিয়ে শুরু অথবা শূন্য থেকে
একটি মাত্র শব্দ "কুন"
শব্দ প্রতিশব্দে ভাসমান জলজ প্রাণ
স্রোতাশ্রয়ে আশ্রয়—

কতদূর বয়ে গেছে মানব ইতিহাসের পথ
প্র-অভিজ্ঞতায় নিমজ্জিত এই পড়ন্ত বেলায়
অসীম সূর্যালোকের পাশ কেটে
অন্ধকারে একাকিত্ব অহংকারী শিকারী আজ
একাই পাড়ি জমাবে এতটা পথ
আর নিয়ে আসবে
সমুদ্রের অতল দেশ থেকে ঘুমন্ত জল কন্যার
উত্থিত শরীর

২.

পবিত্র দ্রাক্ষারসে আদিমতম নেশায়
একদল রমণীর নৃত্য
ওদের পাহাড়ী গুহায় নগ্ন ভেনাস
কথা বলে পূর্ণবার
পূর্ণবার বিশ্বাস নির্মাণ হয়
প্রত্নতত্ত্ববিদ, হাজার বছরের জীবাণুর ফসিল
চোখ তুলে তাকায় দূরে কোথাও
অবিশ্রাম আদিম পুরুষের ভারী
অস্ত্রে সজ্জিত বলিষ্ঠ দেহ
শিকারী ম্যামথের ঝলসানো মাংসের গন্ধ
ভেসে আসে রমণীর দেহ হতে

পৌরাণিক জনপথ চক্রাকারে ঘূর্ণিয়মান
ঘূর্ণন শেষে আটকা পড়ে সবাই
অদৃশ্য অমোঘ জালের শৃঙ্খলে।

৩,
দুঃসহ যন্ত্রণার ভিতর তোমাকে ঢেকে ফেলল
একদল বিবর্ণ প্রজাপতির ছায়া

অন্ধকার বৃক্ষ লতায় জড়ানো তোমার
ঘৃণা আর নিষ্ঠুর সামাজিকতা ম্রিয়মান
যেন অহংকার হাস্য লীলা

উত্তেজিত ভারি বাতাস আর মেঘেদের ত্বকদেশে
ভাসমান জলকণা
মাধ্যাকর্ষনহীন শূন্যে অবস্থান
মৃত্তিকা-জল-প্রাণী
ভালবাসতে জানে না, না টেনে নিচে নামাতে
ওদের চোখ নেই কিংবা চোখের পাঁপড়ীতে লজ্জা, ভয়, সম্মান

নির্মিত মৌন মন্ত্রে সাজানো খাটিয়ায়
মিছিল হবে আজ তোমাকে নিয়ে
একদল মৌমাছির পাখায় প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর

আত্মজ নিরামক ঔষধী বৃক্ষের
শাখা প্রশাখায় পরিত্রাণ
এদের সান্নিধ্য সুন্দরতায়
বেড়ে উঠে কাল ক্রমে
বিভীষিকাময় রাত্রীর মতই
আরেকবার
মানবের ভবিষ্যৎ

অজানা পথ পার্শ্বে অলৌকিক কুৎসিত
জীবনাত্মার সৃষ্টি

আমাদের শিশুরা গল্প শুনে
শেওড়া গাছে অন্ধকার
ঝুলে থাকে ভূত-পেত্নীর আত্মারা॥

কারুজ/৫১০

সাদা মুক্তোর উপর মৃত মৌমাছির স্তূপ

কচুরিপানা ফুলের শাড়িতে
দিঘীটা তার যৌবন ঢেকে রেখেছে।
এ যৌবনের তলদেশে আছে কালো কালো ঝিনুকের স্তূপ
সূর্যের প্রখর রোদে কালো ঝিনুকেরা চৌচির হবে
ওখানে গলে গলে পড়বে
সাদা সাদা মুক্তার ফেনা।
মুক্তার মিষ্টি গন্ধে
মৌমাছিদের ঘুম ভেঙ্গে যায়
ওরা উড়ে উড়ে ছুটে আসে
ঝিনুকের স্তূপে আছড়ে পড়ে
মুক্তার গন্ধ ঠোঁটে মেখে নেয়
শুরু হয় উল্লাস
নৃত্যের তালে তালে ধারালো দাঁতে শরীর ছুঁয়ে যায়
ডানাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে বাতাসে উড়ে যায়
ডানা ছেঁড়া কীটেরা মুখ থুবড়ে মধু খেয়ে নেয়
চোখের আকাশে উড়ে আসে শান্তির ঘুম
ক্লান্তিতে দেহ ভাসায় ঘুমের সাগরে।
ঐ বেগুনি ফুলে ঢাকা যৌবনের তলদেশে
মৃত মৌমাছির পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে
সাদা সাদা মুক্তার উপর
মৃত মৌমাছির পাহাড়।

নীল রাজকুমারের গল্প

এলোকেশী রাতের তারাপথে তারাদের মেলা
তিথিক্ষয় তিথি
তারাদেবীর বিয়ে
তারাদেবী! তারাদেবী বসে আছে ফুল সিংহাসনে
দু' চোখে রাজকুমারের মুকুটের পালক

ঐ চোখ, ঐ চোখের কৃষ্ণচূড়ায় ঝুলে থাকে অগ্নিপালক
রিনঝিন ঘণ্টা বাজে
লাল নীল মেঘেরা ছুঁয়ে দেয় শরীর
বুকে বুক ঘষে যায়।
পাখিরা আকাশের লালাভ মেখে নেয় পালক ছোঁয়ায়
উল্কা পথে ফিরে যায়, ফিরে আসে পাখি,
বাতাসের ঢেউয়ে ঢেউয়ে কেঁপে উঠে নীল বিশ্বাস
ঐ চোখ, ঐ আকাশ, ঐ ফুল
ঐ নীল আগুন
পাখির শরীরে নীল মেখে দিয়ে
চলে যায় কোথায়!
নিচে নীল সমুদ্র একা
শুয়ে থাকে নীল নীল
নীল রাজকুমারের গল্প নিয়ে বুকে।

মোহাম্মদ আমজাদ আলী-র কবিতা

হত্যা হো অথবা ওড়ে যা অনর্থক আহলাদ যত্তোসব জাত-বেজাত রঙ্গোগাথা

রুপারাঙা ঢেউস্রোতে হিলার বাসনা ছিলো তীব্রতর আমার আদিকাল থেকে অথচ দিক-দিগন্তে বিদিকিচ্ছিরি গালমন্দে শুকনো শস্য শাসিয়ে ওড়ে যায় কাক সৃষ্টিকুলের ভাগ্যের পিঠে আর আমার প্রাচীনতম জীবনে তন্দ্রা এসে ছুঁড়ে গেলে ছাইরঙা লালা তবে নিজের গভীর থেকে আরেকটা আমাকে দাঁড়িয়ে দিলাম

অচল চাকা

দশ কাহন রক্তে রাঙা
সার সার মশা তার উড়াল ডানা
মনে হয় ভাটি ছেড়ে উজানের দেশ
ধন্য হবে পদধূলে

তখনো তীব্র সুখের আবেগগুলো ছিলো ধ্বনিময় চোখ যখন
মহা টান টান

এই রঙে যায় আসে যতো ঠ্যাং কান ধাঁ ধাঁ শব্দের গরীমায়
অথচ কে কোথায় যায় আসে সাধু লম্পট অথবা লুটেরাবেশে
এদেশের পিশাচ মুখোশ
লোকচোখে ঢেলে যতো পাতালের কালো

সদ্যনির্মিত বুদ্ধির ঘনোঘটায় মহামায়া বাহুগুলো ঋদ্ধ হ'তে হ'তে
এই স্রোতে
মজ্জাগত যন্ত্রেমন্ত্রে মহীমান্বিত আলখাল্লায় মঞ্চে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব
বরেণ মূলতঃ
ঘুরিয়া ঘুরিয়া
মহা মহা ঐশ্বর্য হাতড়ান ক্রমশঃ আর সমুদ্র জনতা তন্দ্রাহারা
রসিয়া রসিয়া
পুরাণ-রামায়নের প্রাচীনতম প্রতিবেশে মাথায় সূর্য ঢেলে লাগাতার
জীবন-জন্মের দলিল-দস্তাবেজে সর্বস্বত্বহারা ;
উদ্বাস্তু যাযাবর—
যাবতীয় ডাউয়ার দল

ঈশ্বর আমার ললাটজুড়ে অমাবশ্যা ঢেলে পাঠাবেন জানলে
ঘুনাক্ষরে তবে
আমি কী আকণ্ঠ বিরাণ গিল্‌তে আসি এইখানে

আপন কণ্ঠের ক্রোধে দগ্ধ কোকিল
ফুল-পাতারা বৃক্ষহীন হতাশায় ঘোর
মধ্যরাতে আর্তদীর্ণ প্রশ্নগুলো মৃত্যুর আদলে শাসায়

আর আসতেই যদি হতো তবে সৎ, শান্ত, নম্র, ভদ্র মানুষের মতো নয়
কবি, সাহিত্যিক, গল্পকার, নাট্যকার, শিল্পি, উপন্যাসিক, ঐতিহাসিক
ভাবে নয়

বাঁচার প্রশ্নে
মান-সম্মান-মর্যাদার প্রশ্নে
ঐশ্বর্যের প্রশ্নে

ভুঁইফোঁড় রাজনীতিকভাবে
টাউট, বাটপার, লম্পট, লুটেরা, পিশাচ প্রবৃত্তির দূর্নীতিকভাবে
মহা মহা আমলা, জাতীয় পশু পুলিশ, পদলেহী, তেলী,
তোষামোদকারী ভাবে

অথবা রাষ্ট্রীয় দেবতারা তুষ্ট থাকেন এমন তরো ঘাতক-সন্ত্রাসী
হয়ে আসতাম

বেঁচে থাকতে অনন্তকাল

পালক তুই উড়ে আয় ওড়নার মতো যতো অপচ্ছায়ায় ওড়ছো দূরের কালোয়..

ভুঁইফোঁড় গাঁজারও

পদার্থহীন প্রকৃতি ভিন্ন আঙিকে প্রতিশ্রুত এক প্রগাঢ় অন্ধকার আর তার উত্তেজক লাভা যার বিষাক্তকীর্তি স্বাচ্ছন্দ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার স্বাদ দ্যায়

প্রতিচিহ্ন

এবং ক্রোধ যখন তেজোময়
কিংবা মাতাল ঘোড়া
তখন বিধ্বস্ত বস্তির
বেরং আত্মাসমূহ

দিগন্ত প্রসারিত ভ্রাম্যমান সেতুর ওপারে
এপারে আর দৃষ্টি ফেরানো যায় না যদিও

অথবা আয়ুর দরজার কড়া নাড়লো
অতঃপর দুর্ভেদ্য তালা ঝুলিয়ে তার ওপর সীলগালা করলো অথচ
জিরালোনা একদণ্ড লোকদৃষ্টিতে দেয়াল গেথে

তবে ও ক্যামন প্রতিবিপ্লবী ওরকম ল্যাজ গুটিয়ে
বিজয় আবেশে পালিয়ে গেলো অন্তর্ঘাতকের মতো

এবং ঘর-বসতশূন্য মওসুম কিংবা
হাহাকার বিষয়ক অনুর্বর চাষাবাদ সংক্রান্ত যাবতীয়
নীল সবুজ গোলাপী ফর্সা কৃষ্টি শিল্প রাজনীতি সংস্কৃতি নদী পাখি
অথবা অভিজাত রঙের সৃষ্টি সভ্যতা ও আমন্দভাসী গানের অপ্সরীকুল

সম্ভবত আমরা একজন অনেকজন
অথবা সমস্তজন সমস্ত পুষ্প মঞ্জুরি

কারুজ/৫১৪

সমতল

উঁচুতল

নীচুতল

এই গঞ্জের

দ্রাবিড় প্রেক্ষাগৃহের

বহু বিচিত্র বর্ণের

প্র

তি

চি

ত্র

লুৎফর-এর ছোটগল্প

কলেরা

হৈচৈ-গান-শিষ ইত্যাদির মৈদ্য দিয়ে আমরা গেরামের চৌহদ্দিতে পরতেই যে ঝোপ্‌টা আমাগো নজর কাড়ে তার ভিত্তে এক জোড়া উজ্জ্বল চৌখ সবাইকে ভেংচি কাটল। আবৃছা আন্ধ্যাইরে দেখলাম তার সামনে পরে আছে ছিন্ন-ভিন্ন একটা মুরগি। আর একটু সামনে যেতেই একজন মহিলাকে দেখলাম কুপি হাতে ডাকছে, 'আ-তিঁ... তিঁ...তিঁ।' "কৈ গ্যাল মরির মুরগি, ছিনালরে মনেকয় হিয়ালে খাইছে।" তার প্যানানি আর রাগি গলার রাও শুনতে শুনতে আমরা এসে গেলাম আর একটা বাড়ির বোগ্‌লে। বাধি আর পুকুর আল্‌গা করে চলে গেছে গ্রাম্য সড়ক। পুকুর ঘাটে কয়জন মহিলাকে আঘুন মাইশ্যা কামের পরে গোসল করতে দেখলাম। এক জন বয়েসী গলায় বখে যাওয়া নিজের ছেলেকে বকছে, "পুংটায় ছিনামা দেখে, ঘরঅ ভাত নাই ইন্দুর মরে উগাড় পইড়্যা।" অইন্য একজন যুবতী বউ তার স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ করছে, "কৈয়না বুবু তোমার দেওড়া মানুষ না আস্তা ডাকাইত; সারা রাইত্‌ ঘুমাইতে দেয়না শরীলডা

কচলায়া ফালায়।" সাথে সাথে ভেসে আসে পাড় ভাঙ্গা হাসির তুফান।

এই কথা শুনার পরে আমাগো সফিকে ধরে রাখা দায়, সে রিকসার পৈঠায় গুড়ি মেরে আওলা গলায় গান ধরে। অবশ্য পরে তাঁকে এই গোয়ারীর জন্যে আক্ষেপ করতে হয়েছে। রিকসা থেকে নেমে হাঁটতে যেয়ে দেখে এক পাওয়ের জুতা নিচা; হারিকেনের আলোতে দেখা গেল জুতার গোড়ালী উধাও। প্রচণ্ড গুড়ির ধাবাড়ে হিল্ আ:গ্লা হয়ে পড়ে।

চল্তি রিকসা মাঠ পেড়িয়ে গেরামের মৈদ্যে ঢুকে গেলো। ছোট-বড় হরেক আকারের ঘর-বাড়ি, খাল-পুকুর, খেড়ের পুঞ্জি তার সাথে হারিকেন-কুপির ম্যার-ম্যারা আলো, লোকজনের ঘরালী কথা-বার্তা ভেসে এসে কানের মৈদ্যে কাতু-কুতু দেয়। কে একজন মমিন মিঞা তার বউকে, 'কমিন, চুত্মারানী' ইত্যাদি বিশেষণ সহযোগে ধুপ-ধাপ মারছে। এক জন বুড়ি ত র কাঁপা গলায়, 'অ-মমিন করছ কি... করছ কি...বাজান রোগা বউডা রে আর মারিছ না।" বউটার, "আল্লারে...তোমরা আইলানারে...আমারে মাইরাল্লগ...অ-আল্লাগো ...পুংটার ঘরের পুংটায় আমারে খুন কল্লগো।" এই সবের সাথে একটা বাচ্চা অবোধ্য ভাষায় কান্দনের ভিতর কাকে যেন ডেকে ডেকে হয়রান। বৈউয্যা ফেসাদে আটকা পড়া বেটীর চিৎকার কুকুরের ঘেউ ঘেউ রাও-শব্দ নিয়ে আমরা ফের ফসলি জমিনের মৈদ্য দিয়ে অইন্য একটা গেরামের নিকে অগ্রসর হই। সইদ্যপ ধান কেটে নেওয়া জমিনে কয়জন মহিলাকে কুপি বাতি দূরা রেখে একত্রে নৈশ-কালিন প্রাকৃতিক কাম করতে দেখলাম। যদিও তাগ তেল্তেলা কি খস্-খসা শরীল আইন্ধ্যারের জন্য নজরে পড়েনি কিন্তক ক্যামুন যেন একটা বিজাতি ফুর্তি আর বন্যতা আমাগো কুড়ি বছরের রক্তকে উস্কে দিল।

পথে আরেক দল লোকের সাথে দেখা হল। তাগ হাতে বড় বড় বাঁশ আর হারিকেন; প্রত্যেকের ঠুঁটে বিড়ির আগুন শিয়ালের চৌখ্যের মতন জ্বলছে। তাগ ঘামে ভিজা শরীল আর নৈরাশ্য জনক কথা-বার্তা হুজুগে ভাটা ধরায়। এক জন বুড়া মানু কাঁদ-কাঁদ গলায় কৈছে, "কও দ্যাহি অহন আমার কি অইব, কি দ্যায়া আলু খেত্ চাষ

দ্যায়াম।" অইন্য এক জন বলছে, "বলদটা কাইত অইয়া পস্র, আর দুইড্যা গইড় দ্যায়া মইর‍্যা গ্যাল, একটু সুদিন সময় লইত।"

বিজ্ঞানের ছাত্র বাদল 'এন্থ্রাকস' বলে মন্তব্য করে। রায় দেয় রোগটা ভয়াবহ। গরুর জন্য সাক্ষাৎ যমদূত। আমরা সবাই চুপ্‌চাপ বসে থাকি; রিকসা আপন বেগে বাতাস আর ধুলা কেটে পথ চলে। কিছু দূর যেতেই দেখি বিরাট এক বলদ সড়কের পাশে খাল পাড়ে পরে আছে। শিয়াল চারদিক ঘিরে রেখেছে। বাদল লাফ দিয়ে রিক্‌সা থেকে নেমে তুমুল বেগে ঢিল মারতে মারতে খিস্তি দেয়, "খাড়া হালার পুতাইন হিয়ালের বাচ্চা হিয়াল মচ্ছবটা ষুঁইত মতন করাইবাম্।" রিক্‌সা থেমে যায়; উদ্‌লা মাঠে প্রত্যেকেই নেমে পড়ি। ফসলি জমিন মায়ের মতন ভরা বুকে শীতের ঝির ঝিরা বাতাসে ধান নিয়ে দোল খাচ্ছে। চার দিক কি শান্ত আর মিঠা গন্ধ কেমুন সাই-সুন্দর ঘুরে বেড়ায়। বাদল একটা সিগারেট ধরিয়ে খাল পাড় হতে উঠে আসে। শিয়ালের পাল দূরে দাঁড়িয়ে কাঁই-কুই করে। তাগ চৌখ্যে ক্ষিধা আর লোভ বার বার ঝিক্‌-মিক্‌ করে উঠে। আমরা সাবাই বেজাড় মনে গিরস্থ্যের ভাইগ্যের কথা ভাবি। বাদল লাম্বা শ্বাস ছেড়ে ফের বলে, "শালার দেশ, এই দেশের গিরস্থ্য আর গরুর দুক্কুর শেষ নাই, অথচ এরাই বেশী খাটে আর দ্যাহ কি মজা এগ নসীবে না আছে অষুধ, দানা-পানি, না কাছে আরাম আল্লাদ। আমরা বেবাক্‌তেই হেগরে ঠকাই। কোনো তৈত্ত্ব-তামাশ নাই মাছির মতন মরে। দেশটার গরু-ছাগল দিন দিন উজাড় হয়া গেলরে ...কি লইয়া এই-গৈ-গেরামের দিন-দুক্কি মানুষ গুলান খাড়া থাকব।" বাদলের তত্ত্ব কথা আর দেশ প্রেমের বাণী আমাগো মনের মৈদ্যে একটা হতাশার ঢেউ তুলে। সফি হাসতে হাসতে কয়, হালার পুটকিত্ জলন্ত সিগারেট দ্যায় গোঁজ দ্যা; তার দেশ প্রেম টাইম-বেটাইম মান্‌তাছে না আমাগো আমোদের বারটা বাজাইব।"

রিড়্‌সার চাকা ঘুরতে থাকে, আমরা একান্ত মনে সিগারেট টানি। কাজল তার মিঠা গলায় চটুল গান ধরে, কিন্তক সফির বকা খেয়ে মোহাম্মদ রফির, "পাখিটার বুকে যেন তীর মেরোনা ওকে গাইতে দাও"...শুরু করল। আমাদের অন্তরে ভাসে সেই দুখী কৃষক, এই সব গেরামের কৃষক' সারা বাংলায় রোগা কৃষক আর শুক্‌না বলদ,

কাঁচা-পাকা দাড়ি, বসন্ত বাতাস, ফুল পাখি নদীর ঘন কাল পানি, সুন্দর যুবতীদের হাসি...কত...কি...না বলা কথা, জিজ্ঞাসা, পাওয়া... না পাওয়া...দেশ প্রেম ও একান্ত ব্যক্তিগত সুখ সমস্যা কাজলের গানের মৈদ্য দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে জমিন থেকে জমিনে, মাঠ থেকে মাঠে।

হরেক ভাবনা আর গানের কথায় আমরা ডুবে ছিলাম। কখন গান শেষ হয়ে গেছে এবং মাঠ পেরিয়ে টিন-মাটির চৌচালা ঘরের বোগল্ দিয়ে যাচ্ছি তার কোনো হুঁশ ছিল না। আছকা কানে ঢুকে অনেক গুলান্ ছেলে-মেয়ের পড়ার শব্দ। সবাই জান-দিয়ে চিৎকার করে পড়া তৈরী করছে। সবার উপরে এক জনের, "মনে করি ABC একটি ত্রিভুজ" শোনা যায়। আমি এই বাক্যটা তাকে ত্রিশ বার পড়তে শুনেছি। সে হয়ত আরো বেশী পড়ে থাকবে কিন্তুক আমি শুনি নাই। এই বাড়ির পচ্চিমের মাথায় একটা রেডিও তার সমুদয় শক্তি দিয়ে গাইছে, "বন্ধু তিন দিন তর বাড়িত্ গেলাম দেখা পাইলামনা।"

আরো খানিকটা যেতেই দেখলাম, একটা খোলার মৈদ্যে ধান মাড়াই চলছে। মলন গরুর পিছে পিছে একটা ৮/১০ বছরের বালক হাঁটছে। তার হয়ত খুব কষ্ট হয়ে থাকবে, তাই সে তার বাপকে বলছে, "বাজান আমি আর অহন পারতাম না।" এই কথার উত্তরে এক জন দাড়িওয়ালা মুরব্বী বাঁশের ধাইরা হাতে খেড় উল্টাতে উল্টাতে কৈছে, "হে-বাজান আর পাঁচ খান পাক দ্যাও তেই শেষ।"

মলনের একটু দূরে জলচকিত কুপি রেখে একজন সুর করে গাজী কালুর পুঁথি পড়ছে আর তার বোগলে বসে থাকা কয়জন বুড়া কিছি-মের মানুষ ডাবায় কুড়...কুড়...কুড়...করে টানের ফাঁকে, অহ্...উহ্ ...আহ্...হা...হা...এই রকম সুখ-দুঃখের সায় দিচ্ছে। গাজী-কালুর তেলেছমাতি আর চম্পাবতীর বেহেশতী রূপের এবং পুঁথি পাঠকের সুরের তারিফ করতে করতে আমরা সফির বাড়িতে এসে পড়ি।

সফির বাড়িত খাওনের পরে তাশের আসর। আমরা সবাই থোরা থোরা খেয়েছিলাম, বাকীটা খাজেরের রসে পোষায়া লওয়ার ইচ্ছায়। রাইত্ বারটার পর খোলা আসমানের নিচে বেড়িয়ে এলাম। মাঠের

আইল পথে সবাই সার বন্দি হঁটছি। কিছুক্ষণ পরে আমরা একটা পতিত ভিটায় এসে হাজির হই। সফির কাজের ছেলেটা গাছে চড়ে রস পাড়ে; আমরা গামছায় ছেকে ঢগ্ ঢগ্ করে উদল-বদল করে খাই। কড়া শীতের মৈদ্যে রসের স্বাদ-গন্ধ আরো বেড়ে যায়। অনেকক্ষণ ধরে আজাইর‍্যা গল্প আর কলস কলস রস খেয়ে আমাদের পেট তখন ঢোলের মতন ঝুলছে। তার লগে নয়া অসুবিধা, ক্ষণেক পর পর পেটের চাপ কমানোর জন্যে পেশাব করা। শীত তখন আমাগো হাড্ডি-মাংস খাম্চে ধরেছে।

কাজল মাঠের শুক্না খেড়-ন্যারা জোগাড় করে আগুন দেয়। চারদিক হতে ভেসে আসে হৈ চৈ আর বহু মাইনষ্যের মিলিত ডাক। একটু পরে পরে এই রকম হাঁক...ডাকের কারণ সফি বলল, "গেরামে কলেরা আইছে, হেলিগ্যা মাইনষ্যে পর-পাহারা দেয়।" বাদল বলল, "হিয়ালের মতন দল বাইন্ধ্যা কুঁই পাল্লে কলেরার কি অইবা" সফি জানাল যে, কলেরা বলতে বাপ্-দাদার আমলের সেই দশা আর নাই কিন্তুক তেও গৈ-গেরামের মানুষ বিশ্বাস করে এটা একটা আসমানি গজব। যুদিন আল্লা-রসুলের নাম ধরে রাইতভর জিকির করা যায়, আলোর পসরে চলাচল করা যায়, মসজিদ-জুম্মায় শিন্নী-সালাদ করা যায়; তবে আল্লার রহমে এই গজ:বর দেওয়ের হাত থেকে কিছুকটা আছান মিলে।

এক জন বুড়া বহুত দিন ঘরে পড়ে আছে, আছকা বার কয় দাস্ত-বমির পরে গেল। আশ-পাশে আরো দুই-দশ জন ভুগছে তাতেই এই রকম আতংক। যদিও বেচারা কলেরা আধুনিক অষুধ আর ঘন ঘন সেলাইনের সুচের ধাক্কায়, লবণ-গুড়-টিউবওয়েলের পানির তলাৎ চাপা পড়ে মরমর করছে; তেও মানুষের পুড়ানা ডর। কলেরার নাম শুনলেই চৌখ্যে ভাসে সাদা কাফন আর কব্বর।

খেড়ের আগুন ধপ্ করে জ্বলেই ফের দমে যায়, কাজেই আগুন ধরেও তেমুম একটা যুঁইত করা গেল না। কিন্তুক অহন দেখছি লোকজনের হৈ চৈ আরো জোড়ালো হল। তারা বলছে, "বলঅ...বলঅ আল্লা বলঅ...আরও জোড়ে...রসুল বলঅ...মা ফাতেমা...আরো জোড়ে... আলী...আলী...আরও জোড়ে।"

সফি আগুন নিভায়া ফেলতে কৈল। মাঠের মৈদ্যে আগুন দেখলে

মাইনষ্যে আরও বেশী ডরায়। তাগ বিশ্বাস নিশি রাইতে কলেরা এক গেরাম থেকে অইন্য গেরামে যায় মাঠ বরাবর। যুদিন তা না হবে তবে কি করে গেরামের পর গেরাম কলেরার কবলে পড়ে। কলেরা হল অতি বদ্‌সুরৎ এক বুড়ি যে হাইঞ্চা কালে গিরস্থ্য ঘরের আনাচে কানাচে ঘাপ্‌টি মাইর্‌্যা বয়া থাকে, আর সুবিধা মতন এক জনের শরীলে, ভর করে আস্তা বাড়িত ছড়ায়া পড়ে। কেউ তাকে নিশি রাইতে ছিড়া কাপড় পরে কানতে কানতে এক গেরাম থেকে অন্য গেরামে যাইতে দেখছে। আর পরের দিন দেখা গেল হৈ গেরামের ৫/৬ জন শেষ। কাজল কৈল এগুলান কবের কথা। সফি হাসার মৈদ্যে কয়, "আমার দাদার যৌবন কালের কথা, তখন ইংরেজরা রেলপথ বানায় ঢাকা টু মইমনসিং" কাজল বলে, "বাছা গেলরে সফি, তাইলে অহন নিশ্চই আর সেই বুড়ি বাইচ্যা নাই।" আমরা সবাই একটা ছোট্ট হাসির মাচ্ছব দিলাম।

হঠাৎ সুজিত ডরে আমার কলার খামচে ধরল, ঘটনা কি জানতে চাইলে এক হাত কাধে তুলে অইন্য হাতে ইশারায় দেখাল। যা দেখলাম তাতে আমার বুকের ভিত্তে রেল গাড়ির মতন কলজের গড় গড় শুরু হয়েছে। দানবের মতন এক জন মানু তার বুকের মৈদ্যে বিরাট আকার এক জিনিস ঝলমল করছে।

সফি কাঁপা গলায় কয়, "শালা রাক্ষস না দেওরে-এমুন কইর‍্যা চাইয়া রইছে কিতা।" আমাগো গোটা দলটা এই নিয়ে খুব চিন্তায়। সফি ফের তার দাদার কথা কয়, "দাদায় কৈছে এরা অনেক সময় যুবতী বউ অয়, খুউব সুরৎ বউ; অনেক সময় মস্ত বড় মর্দ মানুষের চেহারা লয় যখন যেমুন চাই। অরাত দেও জাত ইচ্ছামতন রূপ বাৎলায়। তয় কি শালা এই ড্যাও হৈতা...অহন আমাগো সিগারেটের আগুন ধূয়ার দাপটে বোগলে ভিরবার পারতাছেনা। কাজল কয়, "তরা যা, আমি এর শেষ না দেইখ্যা যাইতাম না; বহুত দিনে সামুরে পাইছি। সারা জীবন হুনলাম এমন" তেলেছমাতি কামের কথা আর আউজক্যা তারে না বুইঝ্যাই বাগাল দিতাম; হালার জীবন থাকে কি যায়।"

অহন আমরাও দিকে চেয়ে চেয়ে সিগারেট, টানছি; কেউ চৌখ্যের

পাতি মারে না, যুদিন সেই ফাঁকে হালায় যাইত্যা ধরে। এক সময় সবাই মনে মনে ত্যাক্ত হয়ে যাই। কি ব্যাপার শালায় একটুও নড়ে না। বাতাস যখন জোড়ে বয় তখন তার বুকের চক মকিটা বেড়ে যায়। সবার সিগারেট শেষ হয়ে যায় ; অহন কি নিয়ে বসে থাকব। তাই সত্যি ঘটনার সুরাহা করতে সবাই সাবস্থ্য করি, আলু খেতের বেড়ার মৈদ্য থেকে একটা করে যুঁইত মতন বাঁশ হাতে তুলে, বুকের ছাত্তিতে থুথু দিয়ে বাঁও হাতে ঘসে, তুড়ি মেরে এক সাথে হামলা করব।

হাতের বাঁশ মাথার উপ্‌ড়ে তুলা ছিল শরীলের তাবৎ শক্তি নিয়ে কিন্তুক বোগলে গিয়ে তা হামলার আকারে নয় স্বস্তির নিশ্বাসে নিচে নেমে আসে। ওটা কলেরার কায়া নয় খেড়ের একটা মূর্তি ছিঁড়া পাঞ্জাবি পড়ে খাড়া আছে আলু ক্ষেতের আপদ খ্যাদানুর জন্য। মাথা আর বুকের সবটা জাগা জুড়ে মাকড়ের একটা বিরাট জাল ধূলা আর কুয়াশা পড়ে তার সাথে তারার আলো পেয়ে এমন জঘৈন্য চেহারা ধরেছিল। নিজেদের আহাম্মকিতে নিজারাই ঠকেছি এই কথা ভেবে সবাই এক চোট হাসলাম। রসের ঠাণ্ডা কেটে গিয়ে দস্তুর মতন ঘাম ধরেছে। বেহুদা ডর ভয়ে গজব গেল সিগারেটের উপর। অহন নতুন করে সিগারেটের যোগান দেওয়া না গেলে রাইতটাই মাটি হবে। আরেক ফেসাদ ; পাড়ায় পাড়ায় দোকানীদের ডাকা ডাকি করা।

আমরা মাঠ পেরিয়ে এক বাড়ি থেকে অইন্য বাড়ি যাই। নতুন নতুন কুকুর ঘেউ ঘেউ করে তাগ লাল চৌখ দেখায়। পাওয়ের আওয়াজ শুনে জাগ্‌না মানুষ আরো বেশী নিরব হয়ে যায়, ডাকা ডাকি কল্লেও সাড়া দেয় না। কোনো কোনো বাড়িত দেখা যায় উঠানের আগুন ঘিরে পাঁচ-দশ জন জুড়ে জুড়ে কথা কৈছে। আমাগো পাওয়ের শব্দে তাগ কালা মুখ লালচে হয়ে উঠে ; ডরোক গলায় কয়েকজন এক লগে ডাকে, ''ক্যাডা...ক্যাডা।'' আমাগো নামধাম, সাকিন গেরাম আর আসার উছিলা জানতে পেরে সাহসের তারিফ করে। তাগ বুকে যেন বারতি সাহসের যোগান মিলে, চৌখ থেকে সরে যায় কাফন জড়িত মউত্তের ডর। সবাই মিলে খুউব...খুউব জুড়ে হাঁক দেয়, "আলী, আলী...হৈয়অ।"

আমরা চাদড়ে গতর মুড়ে হাঁটি। পাওয়ের জুতা শিশিরে ভিজে

জবজবা হয়ে যায়। গর্ধানের ঘাম দুই পিঠের ঢাল বেয়ে কোমড় গড়ায়; সফিকের গলা তাড়ি খাওয়া মাতালের মতন হেড়ে সুর ধরে· তেও দোকানীরা সজাগ হয় না। মনে হয় মানুষজন কোনো এক অজানতি খোন্দলের ভিত্তে থেকে ডাকা ডাকি করে একে অইন্যের মন দিলে সাহস দেয়।

বহুত বাড়ি-ঘর, খাল-পুকুর, সামন-পিছন, দেউড়ি-উঠান, গু-মুতের গন্ধ সইয্য-অসইয্য আমরা তখন সত্যিই লাচার। হতাশায় খুব কাহিল কিন্তক জিদ্দে বলবান মরদের মতন হাঁটছি; যে করেই হউক সিগারেট আমাগো চাই-ই। সফি বলল এই দোকানটাই শেষ যুদিন না মিলে তবে তার দাদার ডাবা-কলকি আর তামুকের জোগাড় করে দিবে। আমরা সবাই চিৎকার দিলাম, ''মাশাল্লা।''

দূরা থেকেই দেখা যায় দোকানীর ঘরের বাতির রোশনাই। সফি গাইল দিল, "হালার পুতে লুচ্ছা, মনে কয় কাম বানাইয়া আইছে।" আমরা বল্লাম, ''এই বেটায় কলেরারে ডরায় না।' সফি কৈল, ''কলেরার মৈদ্যেইত মজা বেশী, হাইঞ্চার পরে গেরাম, থাকে নিরালা নিঝুম, মানুষ ডরে ঘরের খোন্দলে পলায় হেলিগ্যাইত আকামে আরাম।'' আমরা দোকানের গোড়াত আয়া খাড়াই। আমাগো পাও তখন বিড়ালের মতন নরম আর চোরের মতন সতর্ক।

প্রথমে সফি ডাকল, ''কালাভাই· অকালাভাই ঝাপ্টা একটুন খোল।'' পাটকাঠির বেড়ার ফাঁক দিয়ে আমরা লোকটাকে দেখছিলাম, বসে বসে বিড়ি টানছে আর বালিশের ধুলা ঝাড়ছে। সফির ডাকের সাথে সাথে বিড়ি ফেলে দিয়ে এক ঝটকায় বিছানায় পড়ে একটা খেতার নিচে সুরুৎ করে ঢুকে যায়। হারিকেনটা চড় চড় করে জ্বলছে। সফি ফের ডাকে, ''কালা ভাই, অকালা ভাই একটু উঠ, আমি সফি বিড়ি কিনতাম আইছি।'' এবার সফির লগে আমারও ডাকি, ''কালা ভাই, অকালা ভাই তুমি ডরাইয়না আমরা ৫ জন মে-মান সফির বাড়িত বেড়াইতাম আইছি· আমগরে সিগারেট দেও।'' বাদলের ছিল সিগারেটের জন্য সবচে বেশী নিশা, সে কান্দা-কান্দা গলায় কৈল, ''আপনারে আল্লার কসম, আমরা কলেরা না মানু, অকালা ভাই মনু বিড়ি কিনতাম আইছি।' তেও কালা ভাই উঠে না· রাওশব্দ করেনা· খেতার তলাৎ থেকে ভেসে আসে নাক ডাকার ঘড়াৎ ঘড়াৎ

আওয়াজ। বুঝা যায় ডরে লোকটার কাপড় নষ্ট হবার দশা।

সফির যেমুন সাহস তেমনি জিদ আর শক্তি, তার নাক আর বুক ফুলতে থাকে, শ্বাস খুব জোড়ে পড়ে। হঠাৎ সে দুই হাত মুঠ করে চীনের ব্রুজলীর মতন কুংফু কায়দায় দুই পাও ফাঁক করে খাড়ায়। তলোয়ারের মতন উঁচানু হাতের শিরা ফুলে দাঁড়াশ সাপ। খিল ধরা দাঁতের ফাঁকে ফেস ফেস করে বলে, "যুদিন না উঠছ কালা ভাই তয় আইজ কিন্তুক তোমার দোকান গুড়া, হালার কলেরার মায়রে চুদি।" চৌখ্যের পলকে সফির একটা হাত সাঁ করে দোকানের পাটখড়ির বেড়া ভেঙ্গে ভিত্তে ঢুকে যায়। এই ঘুষির সামনে লহিন্দরের মন্দির লুটায়, কালা ভাই কি ধলা ভাইয়ের পাটকাঠি আর মাটি-গোবরে লেপা বেড়াত পান্তাভাত। বেড়ার গোবর-মাটি উড়ে এসে আমাগো উপ্‌ড়ে পড়ে, আর আস্তা বেড়া ছাতু। শুয়ে থাকা কালা ভাই নামক মানুষ খেতা সহ লাফ দিয়ে বিছানায় খাড়ায় চিককাইর দেয়, "অরে বাবারে আমারে কলেরায় নিলরে, কলেরা...ক...ক...ক।" অহন আর কোন শব্দ আসেনা শুধু ক...ক...করছে লোকটা। ডরে ফিট হয়ে যাবার অবস্থা। সারা বাড়ির মানু ঘুমে আরো নিবির হয়, কেউ জেগে উঠেনা. জীবনের সাড়া মিলেনা শুধু কালা ভাইয়ের ক... ক...। এই রকম একটা তাণ্ডবে কোনো মানু ঘুমাতে পারে বিশ্বাস হয় না। কলেরার ডরে সবাই যেন কোন পাতাল পুরির খোন্দলে। সফি খুব জুড়ে একটা ধমক দেয়, 'চুপ এক্কেবারে চুপ, আমি সফি কলেরা না, চৌখ খুইল্যা দেখ।" সত্যি কথা আমরাও দেখলাম লোকটা চৌখ বন্ধ রেখেই হাত-পাও ছোঁড়ছে আর চিককাইর পাড়ছে। ফের সফির লগে আমরাও ডাকলাম, 'কালা ভাই।' সে কান্না বন্ধ করে চৌখ খোলে, সেই চৌখ্যে তখনো ডর আর অবিশ্বাস ধিক ধিক করছে। সফি তার কাছে সিগারেট চায়। কিন্তুক সফির কথা চাপা পড়ে পাশের বাড়ির মাইনষ্যের ডাকে—"আলীর হাতের জুলফিকার মা ফাতেমার তীর, যেই দিগেতে আইছরে বালা সেই দিগেতে ফির।"

লক্ষ লক্ষ টাকার যোগান দিয়ে এল আর বি, মাইলস, রেনাসা অথবা মাইকেল জ্যাকসনের ব্যাণ্ড সঙ্গীত-এর আয়োজন করতে হয় কিন্তু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত-এর ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ মুদ্রার বিনিময়ে লক্ষ লক্ষ শ্রোতা পাওয়া সম্ভব নয়—অথচ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত অবশ্যই উচ্চাঙ্গ একটি বিষয়, যা সব শ্রেণীর জনা নয়, যা লক্ষ লক্ষ টাকার পণ্যেরূপান্তরযোগ্য নয়।—লক্ষ লক্ষ কপি ছাপা হবার পর লক্ষ লক্ষ পাঠকের হাতে পেঁছে যায় দৈনিক কাগজগুলি, যা ব্যাণ্ড সঙ্গীতের মতই সব শ্রেণীর জন্য প্রযোজ্য কিন্তু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীততুল্য বিষয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে শুধুমাত্র উচ্চাঙ্গ পর্যায়ের সমঝদার প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির জন্য দরকার হয় একটি ভিন্ন কাগজের। অবশ্যই এ জন্য অসংখ্য কাগজ থাকবার পরও নিজেদের দর্শন ও রুচী উপস্থাপন করার অনিবার্য তাগিদ থেকে ছোট কাগজ সমূহ প্রকাশ পাচ্ছে। যে প্রতিষ্ঠান খোলা বাজার অর্থনীতিতে যত বেশী দ্রুত, যত বেশী চাকচিক্যে ক্রেতার হাতে প্রশংসাসহ অখাদ্য পেঁছে দিতে সক্ষম সেই প্রতিষ্ঠানটি তত বেশী সফল ও জনপ্রিয়। জনপ্রিয় চলচিত্র, জনপ্রিয় সঙ্গীত, নাটক, নভেল, জনপ্রিয় প্রেমের ছড়া। সুতরাং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত জনপ্রিয়তাকে অর্থাৎ অন্ধের গণতন্ত্রকে ভয় পায়। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় জনপ্রিয়তার বাণিজ্যিক অর্থ-নীতির সাথে সমন্বয় ঘটাতে অক্ষম এ পর্যায়ের উচ্চাঙ্গ শিল্পের প্রকাশ দায়িত্ব কে নেবেন? গোষ্ঠী ভিত্তিক অথবা একই জাতীয় রুচীর উদ্যোগে পকেটের পয়সা উৎসর্গ করে যদিও বা প্রকাশ পেলো কিন্তু বিপণনের দায়িত্ব কে নেবেন? অথবা কোন্ প্রক্রিয়ায় শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিষয়টি উপযুক্ত সমঝদারের হাতে পেঁছুবে। একজন লেখক অবশ্যই উচ্চাভিলাষী হবেন এবং তিনি আশা করবেন তার শিল্প কর্মটি উপযুক্ত স্থানে অবশ্যই পেঁছিবে, তা যে কোন ভাষাভাষী অথবা যে কোন জাতির নিকটই হোকনা কেন। পূর্বক্ত অর্থে অর্থাৎ বাজারী জনপ্রিয়তাকে ছোট

সম্পাদকের বক্তব্য

কাগজের লেখকগণ ঘৃণা করেন। কিন্তু সমঝদার পাওয়া গেলে আন্তর্জাতিকতায় নিশ্চয় তাদের আপত্তি নেই। সেক্ষেত্রে অপ্রতিষ্ঠানিকভাবে সেই উৎকৃষ্ট লেখাটি কোন পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উপস্থাপিত হতে পারে?

নির্দিষ্ট গোষ্ঠীভুক্ত লেখকসূচী তথা নাক উঁচু স্বভাবজাত উগ্রপন্থী কাগজ সমূহ নিজেদেরকে একমাত্র ছোট কাগজের উদাহরণ হিসাবে দাবী করতে পারেন। কিন্তু এতে করে অন্ধ অহংকার, পরস্পর ঘৃণা, অবিশ্বাস ও উপযুক্ত লেখাটির প্রতি অনীহা প্রকাশই প্রতিনিয়ত চর্চা হচ্ছে। যেহেতু ঐ লেখাটি তাদের গোষ্ঠীভুক্ত বা সূচীবদ্ধ নয় সেহেতু উহা মূর্খের লেখা এবং অপাঠ্য। আমাদের প্রশ্ন ছোট কাগজগুলিকে বিচারকের দায়িত্ব কে দিয়েছে। এতটা বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ—বিশুদ্ধ শিল্পের বাহক, নান্দনিক রুচীর বাহক যাদের জন্য নিজেদের একটি কাগজ থাকা আবশ্যক তারা কি করে এতটা অন্ধ হতে পারেন? সমসাময়িকগণ কখনোই বিচারক হতে পারেন না। এ অধিকার তাদের দেওয়া হয়নি। শিল্পের ক্ষেত্রে সময়ই সবচেয়ে বড় বিচারক। জীবনানন্দ দাশ কবিতা ও সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন. কবিতার সমালোচনা কেবলই ভুল ও খারাপ হলে দেশে সেই সমালোচনা সাধারণ পাঠকের ব্যবহারের জন্যে আলোচনাবেদ সৃষ্টি করতে থাকে; তাতে বড় কবিদের কবিতাও নষ্ট হয়ে যেতে পারে কিংবা এমন দিকে মুখ ফেরাতে পারে যাতে কবিতার সুধী ও বিবেকী পাঠককেও ফাঁপরে পড়তে হয়।—বর্তমানে শুধু কবিতার ক্ষেত্রে নয়. লেখালেখির সকল ক্ষেত্রেই একদিকে দৈনিকের বাজারীপনা অপরদিকে ছোট কাগজের নাক উঁচু দুর্বোধ্যতার যাতাকলে সুধী ও বিবেকী পাঠক ফাঁপরে পড়েছেন। কাহাকে ছোট কাগজ বলে কাহাকে বলে না। কোন কোন গোষ্ঠী নিজ কাগজের সম্পাদকীয়তে স্পষ্ট প্রেসক্রিপসন ও নীতিমালা দিচ্ছেন। যা রাজনৈতিক বিবৃতির মতই উস্কানীমূলক। ফলে ক্রমাগত তরুণদের পরিবেশ নোংড়া হয়ে উঠতে শুরু করেছে। যার সূত্রপাত আশির দশক হতে শুরু করে বর্তমানে একটা হ-য-ব-র-ল অবস্থায় এসে ঠেকেছে। দৈনিকে লিখবেন না অথচ দৈনিকে চাকরী। NGO-র প্রতি সন্দেহ ও নাক ছিটকানো অথচ NGO-তে চাকরী। প্রশ্ন হচ্ছে তরুণ লিখিয়েরা কতদিন পেশা বিমুখ থাকবেন। অবশ্যই তাদেরকে এক পর্যায়ে কোন না কোন পেশা বেছে নিতে হবে। আর

পেশাটি লেখালেখির সাথে সম্পৃক্ত হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। এখনকার তরুণেরা জানেন লেখালেখির বিষয়টি সৌখিনতার বিষয় নয়। ফলে তাদের একটি অংশ সিরিয়াসলি গবেষণার সাথে সংযুক্ত হচ্ছেন। কেউ কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেছেন কেউবা করবেন। অথচ প্রতিষ্ঠান বিরোধী সম্পর্কিত গালভরা কথা বলছেন কোন কোন ছোট কাগজ। প্রশ্ন হচ্ছে একাডেমীক কাজ অথবা গবেষণার কি প্রয়োজন নেই? সস্তা আবেগ নির্ভর সিদ্ধান্ত দিবার আগে আর্থ-রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিজেদের চোখ মুখ একটু প্রসারিত করার প্রয়োজন আছে, সেই সাথে প্রয়োজন আছে নিজের চেহারাটা নিজের আয়না ও অবশ্যই অপরের আয়না দিয়ে একবার দেখে নেওয়া।

মফস্বলের বিবিধ সাহিত্য সংগঠন, কবিতা ক্লাব, সংবর্ধনা, কবিরত্ন উপাধি তথা চাঁদা তুলে স্মরণিকা, সংকলন কিংবা গদ্য-পদ্য-ছড়া, মফস্বলের দৈনিক নির্ভর স্বঘোষিত বিজ্ঞ-প্রাজ্ঞ-পণ্ডিত নামে খ্যাত ব্যক্তিদের হাস্যকর ক্রিয়াকলাপ তথা সাধারণ জনগণের কাছে উনারা যে সমস্ত কাগজ তুলে ধরছেন এবং সম্ভাবনাময়ী তরুণদের শিল্প সাহিত্য বিষয়ে বিভ্রান্তকর ধারণা দিচ্ছেন তা অবশ্যই ছোট কাগজ আন্দোলনকে পিছিয়ে দিচ্ছে। ফলে ছোট কাগজ বলতে স্কুল কলেজ ও মফস্বলের বৃদ্ধদের হাতে তৈরী হাস্যকর প্রিন্টেড কাগজ পত্রকে বুঝে থাকেন অনেকেই। যা অবশ্যই শিল্প সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে হাস্যকর। আর এ সমস্ত লেখকগোষ্ঠী দৈনিকে লেখা ছাপাতে পারাকেই একমাত্র সার্টিফিকেট বলে মনে করে থাকেন। অথচ উনাদের ক্ষমতা নেই ছোট কাগজ আর দৈনিকের ব্যবহারিক তাৎপর্যকে উদ্ধার করা। বাজারে সুস্বাদু অখাদ্যই বিকোবে সর্বাপেক্ষা বেশী। যা পুঁজিবাদী অর্থনীতির ফলাফল। বিষয়টির মর্মার্থ কি উনারা আত্মস্থ করার ক্ষমতা রাখেন? ফলে শুধু নান্দনিক উদারতাই একমাত্র শর্ত নয় বরং এই বিভ্রান্তিকর কালচারের ক্ষতিকর দিকটির স্বরূপ উন্মোচন করার দায়িত্ব প্রতিটি কমিটেড ও সিরিয়াস লেখকের। রুচীহীন অকবি অলেখকদের কাতারে ভীড়ে যাবার লোভ সংবরণ করে সুস্থ শিল্প-চর্চার পরিবেশ ও পাঠক সৃষ্টি করা এবং অবশ্যই তা গোষ্ঠীবদ্ধ সংকীর্ণতা থেকে নয় বরং নিজেদের নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে আরো উদার ও ফলপ্রসূ তথা প্রায়োগিক করে তোলা। সেই সাথে নিজে-দেরকে বিচারক ভাববার লোভ সংবরণ করা।—তথা নান্দনিক ও

মূল্যায়নযোগ্য, গ্রহণযোগ্য শিল্পের প্রতি সৎ সমর্থন। অগ্রজদের প্রতি যথাযথ দৃষ্টিপাত। সমসাময়িকগণ লিখবেন, গ্রহণযোগ্যতা আদায় করবেন, অতপর তাকে নিয়ে কাজ করা যাবে। অথচ পাতানো খেলার মত এক তরুণ আরেক তরুণের সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন। প্রত্যেকে নিজেকে মনে করছেন তারা সাক্ষাৎকার প্রদান করার পর্যায়ে চলে এসেছেন। অথচ বলা হচ্ছে তারা আত্মপ্রচার বিমুখ।

শিল্পের বর্তমান অবস্থান ও স্বরূপ উন্মোচনে সমালোচনা,—বিচারকের ভূমিকায় সমালোচনা নয়। স্বীকৃতিযোগ্য শিল্প অংশটুকুকে কেন স্বীকৃতিযোগ্য, নান্দনিক বিশেষত্ব কতটুকু, তার অকৃত্রিম যথাযথ বিশ্লেষণ—এক্ষেত্রে লেখক বড় নন তাঁর লেখাটিই গুরুত্বপূর্ণ—সেই সাথে কেন শিল্প নয়, কিভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে কতটুকু দুর্বল, —শিল্প হয়ে উঠতে পারার অবকাশ কোথায়, তা সনাক্ত করতে পারার সৎ মেধা সৃষ্টিতে সমালোচনা কাগজ আবশ্যক। কারুজ-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশ পেয়েছিল ১৯৮৯ সালে। আর ১৯৯৯ সালে এসে দশ বৎসর পূর্তিতে কারুজ সমালোচনা কাগজ হিসাবে প্রকাশ পেলো। অবশ্য প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল কারুজ চতুর্থ খণ্ড হতেই। এক্ষেত্রে একজন প্রকৃত লেখকই তাঁর লেখার যথাযথ সমালোচক। যদি তিনি অন্ধ অহংকারী না হয়ে থাকেন। আমরা প্রকৃত লেখকদের নিজ নিজ লেখার সমালোচনা লিখতে আহ্বান করছি।

ছোট কাগজের বৈশিষ্ট্য কেমন হওয়া উচিত। বিষয়টি এখনও স্পষ্ট হতে পারে না। কেননা এখনও অনেকে এ বিষয়ে স্ববিরোধী উগ্র মানসিকতা জ্ঞাপন করে থাকেন। তবে সমালোচনার ক্ষেত্রে কোন্ গোষ্ঠী থেকে শিল্প সৃষ্টি হলো সেটি বড় বিষয় নয় বরং প্রকৃত বিষয় হচ্ছে কি সৃষ্টি করা হলো। তবে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে একজন লেখকের রাজনৈতিক পরিচয় থাকবে, থাকবে তার রুচী ও আদর্শের সাথে সংগতিপূর্ণ প্লাটফর্ম তথা কাগজ—এর অর্থ এই নয় যে একমাত্র তার নিজের রুচির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কাগজগুলিই শুধুমাত্র বিশুদ্ধ শিল্প চর্চা করে থাকে—আর কেউ করে না—তার অর্থ এই নয় যে, গোষ্ঠী ভিত্তিক দলাদলিতে একজন লেখক আত্মতুষ্টি অর্জন করবেন। বস্তুতঃ একজন সাধক-লেখকের এ জাতীয় তুচ্ছতা নিয়ে বগল দাবানোর মত সময় বা রুচী বা উষ্কানীমূলক চেতনা থাকবার কথা নয়। আসলে

একজন শিল্পী তথা স্রষ্টা যেভাবে সমাজকে তাঁর শিল্প মাধ্যমে বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করে থাকেন তাতে তাঁর পক্ষে এরকম প্রতিক্রিয়াশীল বা উগ্র অন্ধ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যে কোন উগ্রতার শেকড়ই মৌল অন্ধ চেতনাজাত। আমরা বিশ্বাস করি সত্যিকার সৎ লেখক, যিনি শিল্প বোঝেন তিনি প্রতিক্রিয়াশীল নন—কিম্বা আবেগ তাড়িত কোন ভুল করে বসেন না—কিম্বা উগ্র অন্ধ চেতনা বা মৌলবাদী চেতনা দ্বারা নির্দিষ্ট সীমানায় আঁটকে থাকেন না। একজন প্রকৃত লেখকের চেতনাজগত সর্বকালের তথা বৈশ্বিক ও নান্দনিক, মানব মেধা ও সভ্যতার স্বপক্ষে ক্রিয়াশীল। তিনি অবশ্যই সীমাবদ্ধ সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করে থাকেন। শিল্প এবং শিল্পী কোন বিশেষ গোষ্ঠীর বা কোন প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। ইনারা মানব প্রজাতির সভ্যতার ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত।

পাঠ করুন শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ক কাগজ

অনিন্দ্য	☐	প্রসূন	☐	প্রান্ত	☐	গাণ্ডীব
প্রতিভূ	☐	দ্রষ্টব্য	☐	কারুজ	☐	লিরিক
গ্রন্থী	☐	চালচিত্র	☐	গদ্য	☐	পথিক
সৃষ্টি	☐	জীবনানন্দ	☐	আড্ডারু	☐	পেঁচা
একবিংশ	☐	বর্তমান	☐	কবিতা নয়		কালপ্রপাত

পরবর্তী সংখ্যায় আলোচনার জন্য সম্ভাব্য গ্রন্থ সমূহ ঃ

সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ-এর কাব্যগ্রন্থ—তনুমধ্যা

সৈয়দ তারিক-এরকাব্যগ্রন্থ—ছুরি হাতে অশ্ব ছুটে যায়

সৈয়দ নাজমুল করিম-এর কাব্যগ্রন্থ—ভাঙনের সুখে, সম্মোহে

জাফর আহমদ রাশেদ-এর কাব্যগ্রন্থ—কাচের চুড়ি, বালির পাহাড়

অলকা নন্দিতা-র কাব্যগ্রন্থ—পিননের ভাঁজে মহাকাশ হাঁটে

রাজীব নুর-এর গল্পগ্রন্থ—দ্রৌপদী ও তার প্রেমিকেরা

শামীম সিদ্দিকী-র কাব্যগ্রন্থ—ভূগোলের সবুজ বাকল

শিমুল মাহমুদ-এর গল্পগ্রন্থ—ইলিশ খাড়ি

মাসুদ খান-এর কাব্যগ্রন্থ—পাখিতীর্থদিনে

হাফিজ রশিদ খান-এর কাব্যগ্রন্থ—লোহিত ম্যাণ্ডোলিন

সুনীল সাইফুল্লাহ্-র কাব্যগ্রন্থ—দুঃখ ধরার স্রোতে

মির্জা তাহের জামিল-এর গল্পগ্রন্থ—চতুর্থ সত্তা যোগ চতুর্থ মাত্রা

☐ উল্লেখিত গ্রন্থ ব্যতীত আগ্রহী লেখকদের তিন কপি পুস্তক সহ সমালোচনা এবং লেখকের নিজ গ্রন্থ সম্পর্কে নিজের লেখা সমালোচনা পাঠাতে অনুরোধ রাখছি। আমরা আপনাদের আলোচনার পাশাপাশি আমাদের বিশ্লেষণ উপস্থাপনে আগ্রহী।

☐ শিল্প সাহিত্য ও নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক পত্রিকা, যার প্রকাশকাল পাঁচ বৎসর পূর্ণ হয়েছে এবং কমপক্ষে পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশ পেয়েছে— এ জাতীয় পত্রিকার সম্পাদক-প্রকাশকদের তাঁদের পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যা নিজেদের সমালোচনাসহ পাঠাতে অনুরোধ করছি। আমরা আপনাদের মতামতের পাশাপাশি আমাদের অভিমত প্রকাশে বিশ্বাসী।

☐ ১৯৯৯-এর একুশে মেলায় প্রকাশিত তরুণ লেখদের বই ও পত্র পত্রিকার উপর আলোচনার কাজ এগিয়ে নিবার জন্য আপনাদের সহযোগিতা কাম্য।

কারুজ
এর
জন্য
আমাদের অভিনন্দন

মাইক্রোটেক কম্পিউটার
এল এম বি মার্কেট,
(দোতালা)
পাবনা।

কম্পিউটার প্র্যাকটিসের জন্য নান্দনিক পরিবেশ

KARUZ - A LITERARY YEARLY - VOL. 5 - 1

Edited by Shimul Mahmud Lecturer in bangla-Govt. Edward Un
College, Pabna. Phone-Office-Intercom-6044/123. Res-4206.
Price. Tk. 25. Rs. 20. US $ 2.